আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলার চিত্রকলায় দেশজ ও বহির্দেশীয় উপাদান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে
পিএইচডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

মাহ্‌মুদা খানম

রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৯৭ (নতুন ভাবে)

সেশন: ২০১৬-১৭

তত্ত্বাবধায়ক

ড. নাজমা বেগম

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা, অক্টোবর, ২০১৮

অঙ্গীকার পত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, 'আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলার চিত্রকলায় দেশজ ও বহির্দেশীয় উপাদান' শীর্ষক এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পুর্ণরূপে আমার নিজের রচনা। অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে পিএইচ ডি গবেষণার উদ্দেশে রচিত হয়েছে। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে এই শিরোনামে অন্য কেউ গবেষণা করেননি। বর্তমান গবেষণা অভিসন্দর্ভটি অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যলয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য জমা দেয়া হয়নি এবং এটি কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিতও হয়নি।

(মাহ্মুদা খানম)
পিএইচডি গবেষক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৯৭
সেশন: ২০১৬-১৭ (নতুনভাবে)

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের পিএইচ ডি গবেষক মাহ্মুদা খানম (যাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৯৭, সেশন ২০১৬-২০১৭) আমার তত্ত্বাবধানে পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য 'আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলার চিত্রকলায় দেশজ ও বহির্দেশীয় উপাদান' শীর্ষক এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। তাঁর গবেষণাটি মৌলিক তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে উপযুক্ত যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিন্যস্ত করা হয়েছে। আমি অভিসন্দর্ভের পা-লিপিটি পাঠ করেছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য দাখিল করার জন্য সুপারিশ করছি।

(ড. নাজমা বেগম)
অধ্যাপক ও তত্ত্বাবধায়ক, পিএইচ ডি
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

অঙ্গীকার পত্র	ii
প্রত্যয়ন পত্র	iii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	v
সূত্র-সংক্ষেপ	viii
চিত্রসূচি	ix
ভূমিকা	০১
প্রথম অধ্যায়: পটভূমি	১৫
দ্বিতীয় অধ্যায় : দরবারি চিত্রকলা : মুর্শিদাবাদ রীতি	৬০
তৃতীয় অধ্যায় : অভিজাত চিত্রকলা : কোম্পানি শৈলী	৯৫
চতুর্থ অধ্যায়: গণ-মানুষের চিত্রকলা	১৩৭
ষষ্ঠ অধ্যায় : চিত্ররীতি ও কৌশলের বিবর্তন	১৮১
উপসংহার	২১৬
পরিশিষ্ট: পরিভাষা	২২৩
নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি	২২৭

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বর্তমান গবেষণা কর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে আমার দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফসল। এই বিভাগ থেকে বিএ (অনার্স), এমএ এবং এম ফিল ডিগ্রি অর্জনের পর ২০০৬ সালে আমি প্রথম পিএইচডি ডিগ্রির জন্য গবেষণা শুরু করি। সেই সময় আমি ঢাকার ইউনিভার্সিটি উইমেন্স ফেডারেশন কলেজে খ-কালীন প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলাম। কলেজের সম্মানিত অধ্যক্ষ অধ্যাপক রাশিদা সুলতানা আপার উৎসাহেই আমি গবেষণার কাজটি শুরু করেছিলাম। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি কোর্সে ভর্তির আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর পরই সরকারি চাকরিতে যোগদানের পর নানা কারণে আমার গবেষণার কাজটি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হয়েছিল। ২০১২ সালে সরকারি চাকরি ছেড়ে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে যোগ দেয়ার পর বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান (বর্তমানে কলা অনুষদের সম্মানিত ডিন) প্রফেসর ড. মো. আতিয়ার রহমানের উৎসাহে পুনরায় নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করতে সক্ষম হই। তারই ধারাবাহিকতায় পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিনের রহমতে আজ আমি কাজটি শেষ করতে সক্ষম হয়েছি।

দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় অনেকেই আমার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সবার আগে নাম করতে হয় আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. নাজমা বেগমের। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ থেকে শুরু করে তার বিশ্লেষণ পর্যন্ত গবেষণার প্রতিটি স্তরেই তিনি আমাকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। এই অভিসন্দর্ভের প্রতিটি পৃষ্ঠা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন করেছেন এমনকি প্রয়োজনীয় বই-পত্র কোথায় পেতে পারি তাও জানিয়ে দিয়েছেন।

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. আতাউর রহমান মিয়াজী এবং সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ মাহফুজুল ইসলামের সহযোগিতার কথাও আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। এছাড়াও বিভাগের সকল শিক্ষক বিশেষ করে প্রফেসর ড. মো. মোশাররফ হোসাইন ভূইয়া, প্রফেসর ড. আব্দুল বাছির, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান

এবং স্নেহভাজন সুরাইয়া আক্তার ও রোকসানা ফিরদাউস নিগার নানা পরামর্শ ও সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, বিশেষ করে জনাব কবির আহমেদ, জনাব ছরোয়ার হোসেন এবং মো. আমিনুল ইসলাম আমিনও নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণা কর্মটি সম্পদন করার জন্য যে সকল গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র, ঢাকার গ্রন্থাগার এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর গ্রন্থাগার। জাদুঘরের কিপার ড. নীরু শামসুন্নাহার আপার সহযোগিতায় আমি জাদুঘরের সংগ্রহে রক্ষিত চিত্রকর্মসমূহ দেখার সুযোগ পেয়েছি, নিজের বিভাগ না হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাকে এই সুযোগটুকু করে দেয়ার জন্য অন্যদের কাছে সুপারিশ করেছেন, সে জন্য তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তবে এ গবেষণার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মৃতি পাঠাগার ও এম আর তরফদার স্মৃতি জাদুঘরের সংগ্রহশালা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার। উক্ত গ্রন্থাগারের কর্মচারীরা আমাকে নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমী গ্রন্থাগার, সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার, রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর এবং বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস থেকেও সহায়তা নিয়েছি।

চিত্রকলা নিয়ে গবেষণায় মৌলিক উপাত্ত ব্যবহার এক কঠিন কাজ। এ কাজের জন্য আমাকে বাংলাদেশের বাইরেও অনেক সংগ্রহশালার সহযোগিতা নিতে হয়েছে। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালা ও ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামসহ ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাকে নানাভাবে সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সুতপাদি (ড. সুতপা সিনহা) ও ড. স্বাতী বিশ্বাস এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক স্নেহভাজন দেবরাজ চক্রবর্তী। নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামের সংগ্রহশালা দেখার সুযোগ করে দেয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞ কলেজ আর্ট অ্যাসোসিয়েশন (সিএএ), বিশেষ করে সিএএর ডিরেক্টর (ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম) ড. জ্যানেট ল্যানডে'র কাছে। যুক্তরাজ্যের সংগ্রহশালাগুলো আমি নিজে দেখতে পারিনি, কিন্তু বিশেষ করে ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ম এবং ব্রিটিশ লাইব্রেরির ওয়েবসাইট থেকে অকুণ্ঠ সহযোগিতা পেয়েছি। যুক্তরাজ্যের

অন্য যে সব সংগ্রহশালার ওয়েবসাইট অতোটা সমৃদ্ধ নয় অথচ আমার কোনো তথ্য প্রয়োজন হয়েছে, সেগুলো থেকে আমাকে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে দিয়েছে লন্ডন প্রবাসী আমার ছোট বোন মাকছুদা বেগম এবং তাঁর বান্ধবী মনিরা ইসলাম। তাঁদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

ব্যাক্তিগত ভাবে যাদের সহযোগিতা আমার গবেষণার পথকে সুগম করেছে তাদের মধ্যে শ্রদ্ধাভাজন জনাব মুহাম্মদ মাসুম আলী খান মজলিসের নাম আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি। গবেষণার নানা পর্যায়ে তিনি আমাকে অনেক উৎসাহ দিয়েছেন। গবেষণার কাজটি করার সময় পাশে থেকে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে আমার বন্ধুরাও; বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ১৯৯৫ সালের মাস্টার্স ব্যাচের বন্ধু ড. নাজলী চৌধুরী ও ড. মাসুদ রানা খানের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। বড়ভাই জাকারিয়া মুক্তা এবং বন্ধু তারেক মাহমুদ-শর্মিল পারভীন লাইজুর কাছেও আমি নানাভাবে ঋণী।

দীর্ঘ সময় ধরে গবেষণার কাজটি করতে গিয়ে আমার দুই কন্যা সারা আনজুমান হক ও সানা শরীফা হককে মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছি। সেটা পুষিয়ে দিয়েই শুধু নয়, সঙ্গে আমার পুরো অভিসন্দর্ভটি আদ্যন্ত পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ পরামর্শ দিয়ে পাশে থেকেছে তাদের বাবা ড. এ কে এম খাদেমুল হক। তাঁকে অবশ্য কৃতজ্ঞতা জানানো চলে না। বাচ্চাদের দেখে রাখার কাজে অসাধারণ সহযোগিতা দিয়েছে আমার আরেক বোন মিমনও।

পরিশেষে, আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা আবদুল মান্নান এবং মাতা আনজুমান আরা বেগমের নাম। বেঁচে থাকলে আজ এই অভিসন্দর্ভ জমা দানের খবরে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হতেন তাঁরাই। আল্লাহ রাব্বুল আল-আমিন যেন তাঁদের মাগফিরাত দেন, সেই প্রার্থনা করছি।

মাহ্‌মুদা খানম

ঢাকা, ১৫ অক্টোবর, ২০১৮

সূত্র সংক্ষেপ

Ain-i-Akbari	Abul Fazl, *The Ain-i-Akbari*, Eng. Trans. H. Blochmann
Akbarnama	Abul Fazl, *Akbarnama*, Eng. Trans. by H. Beveridge
BS	Bangla Son (Bengali Era)
IHQ	*The Indian Historical Quarterly*
JASB	*Journal of the Asiatic Society of Bengal*
JASBD	*Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*
JASP	*Journal of the Asiatic Society of Pakistan*
JVRM	*Journal of the Varendra Research Museum*
JPASB	*The Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*
JRAS	*The Journal of the Royal Asiatic Society (of Ireland & Great Britain)*
ইতিহাস	*বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*

চিত্রসূচি

চিত্র ২.১ নবাব মুর্শিদ কুলি খানের দরবার (শিল্পী: অজ্ঞাত) ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, লন্ডন (সংগ্রহ নং আইএস ১৩৩৬/এ-১৯৬৪)

চিত্র ২.২ নবাব আলিবর্দী খানের প্রতিকৃতি, শিল্পী: অজ্ঞাত, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, সংগ্রহ নং ডি ১১৯৯-১৯০৩

চিত্র ২.৩ নবাব আলিবর্দী খানের হরিণ শিকার, শিল্পী: অজ্ঞাত, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, সংগ্রহ নং ডি১২০১-১৯০৩

চিত্র ২.৪ যুদ্ধের দৃশ্য : নল ওয়া দামান পাণ্ডুলিপি (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল সংগ্রহশালা, কলকাতা, বাঁয়ে) এবং আকবরনামা পাণ্ডুলিপি (ভিক্টেরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ২:১০৮-১৮৯৬, ডানে)

চিত্র ২.৫ জঙ্গলে ঋষির আশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তি, ইমপে *রজমনামা*, ব্রিটিশ লাইব্রেরি এমএস ৫৬৪০, ফোলিও ৩৮৪ ভি ।

চিত্র ২.৬ শূর্পনখার নাসিকা কর্তন, ইমপে রামায়ণ, ১৭৭০-৮০, ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ

চিত্র ২.৭ গুজ্জরি রাগিনী (ইমপে রাগমালা), ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ৭১-১৯৫৪

চিত্র ২.৮ রামকারী রাগিনী (রাগমালা সিরিজ), ব্যক্তিগত সংগ্রহ, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

চিত্র ২.৯ মীর জাফর ও মিরনের সৈন্য সমাবেশ পরিদর্শন, শিল্পী: পুরাণনাথ ওরফে হুনহার, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএম ১৩-১৯১১

চিত্র ২.১০ নবাব মীর কাশিমের প্রতিকৃতি, শিল্পী: দীপ চাঁদ, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং ১১৭৮-১৯০৩

চিত্র ২.১১ মীর কাশিমের সেনাপতি গুরগিন খান, শিল্পী: দীপ চাঁদ, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং ১১৮০-১৯০৩

চিত্র ২.১২ রামের দরবার, *বিচ্ছিন্ন মিনিয়েচার*, শিল্পী: অজ্ঞাত, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং ডি-৩৫৭-১৯০৮

চিত্র ২.১৩ নৃত্য উপভোগ করছেন জনৈক অভিজাত, *বিচ্ছিন্ন মিনিয়েচার*, শিল্পী: অজ্ঞাত, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, সংগ্রহ নং আইএম ২৪৬-১৯২১

চিত্র ২.১৪ আশ্রমে যোগী-যোগিনীর সান্নিধ্যে নারী, শিল্পী: অজ্ঞাত, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, সংগ্রহ নং আইএস ১৪-১৯৫৫

চিত্র ২.১৫ মুর্শিদাবাদের জনৈক অভিজাত, শিল্পী: অজ্ঞাত, মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্ট, নিউ ইয়র্ক

চিত্র ২.১৬ চুল শুকানো, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং : ডি ১১৮৪-১৯০৩

চিত্র ২.১৭ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাপতির প্রতিকৃতি, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং : আইএস ১৬-১৯৫৫

চিত্র ২.১৮ ঢাকার নবাবদের ঈদ উৎসব, শিল্পী: আলম মুসাব্বির, সময়কাল: উনিশ শতক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ,

চিত্র ২.১৯ ঢাকায় মহররমের তাজিয়া মিছিল, শিল্পী: আলম মুসাব্বির, সময়কাল: উনিশ শতক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ

চিত্র: ৩.১ উইলিয়ম ফুলারটনের প্রতিকৃতি; শিল্পী: দীপ চাঁদ, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএম ৩৩-১৯১২

চিত্র ৩.২ ফুলারটনের নেটিভ কর্মচারী, শিল্পী: দীপ চাঁদ, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং ১১৮২-১৯০৩

চিত্র ৩.৩ আশরাফ আলী খানের স্ত্রী মুতুবির প্রতিকৃতি, শিল্পী: দীপ চাঁদ, (ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ নং ৭৩৫)

চিত্র ৩.৪ আশরাফ আলী খানের প্রতিকৃতি, শিল্পী: দীপ চাঁদ, (ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ নং ৭৬৩)

চিত্র ৩.৫ নবাব সুজাউদ্দৌলার পোর্ট্রেট, শিল্পী: টিলি কেটল, ক্যানভাসে তেল রঙ (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কলকাতা)

চিত্র ৩.৬ নবাব সুজাউদ্দৌলার প্রতিকৃতি (টিলি কেটলের ছবি অবলম্বনে, ইয়েল সেন্টার ফর ব্রিটিশ আর্ট, কানেকটিকাট)

চিত্র ৩.৭ নবাব সুজাউদ্দৌলার প্রতিকৃতি, টিলি কেটলের আঁকা ছবি অবলম্বনে, শিল্পী অজ্ঞাত, কাগজে ঘন জলরঙ, (ফাইন আর্টস মিউজিয়াম স্যানফ্রান্সিসকো, সংগ্রহ নং: ১৯৮২.২.৭০.১)

চিত্র ৩.৮ মেজর পালমারের পরিবার, শিল্পী : জন জোফানি, (ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ নং এফ ৫৯৭)

চিত্র ৩.৯ মির্জা হায়দার বেগের দৌত্য, শিল্পী : জন জোফানি, (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল সংগ্রহ, কলকাতা)

চিত্র ৩.১০ কর্নেল পলিয়ের ও বন্ধুগণ, শিল্পী : জন জোফানি, (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল সংগ্রহ, কলকাতা)

চিত্র ৩.১১ লালবাগের দক্ষিণ তোরণ, শিল্পী রবার্ট হোম, (ডেইলসফোর্ড হাউজ সংগ্রহশালা, গ্লস্টারশায়ার, যুক্তরাষ্ট্র)

চিত্র ৩.১২ কর্নেল ম্যাকেঞ্জি, শিল্পী: টমাস হিকি (ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ)

চিত্র ৩.১৩ তাকিয়ায় বসা মুসলিম মহিলা, শিল্পী ফ্রান্সিসকো রেনাল্ডি (ইয়েল সেন্টার ফর ব্রিটিশ আর্ট, যুক্তরাষ্ট্র)

চিত্র ৩.১৪ ইমপে পরিবার, শিল্পী: জোহান জোফানি, [মিউজিও ন্যাসিওনাল, মাদ্রিদ; সংগ্রহ নং ৪৪৫ (১৯৮৬.১১)]

চিত্র ৩.১৫.ক হাড়গিলা শিল্পী : শেখ জৈনুদ্দিন; (অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম সংগ্রহ, অক্সফোর্ড)

চিত্র ৩.১৫.খ শিংওয়াল, শিল্পী : শেখ জৈনুদ্দিন; (অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম সংগ্রহ, অক্সফোর্ড)

চিত্র ৩.১৬.ক ঘুঘুপাখি, শিল্পী : শেখ জৈনুদ্দিন; (ডেভিডস কালেকশন, ডেনমার্ক)

চিত্র ৩.১৬.খ আমগাছের শাখা, শিল্পী : ভবানী দাস (ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, লন্ডন)

চিত্র ৩.১৬.গ বাদুড়, শিল্পী : ভবানী দাস (মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম, নিউইয়র্ক)

চিত্র ৩.১৭ পাগলা পুল, মূল ড্রইং: চার্লস ড'য়লি, লিথোগ্রাফ এনগ্রেভিং: জন ল্যান্ডসিয়ার, (*অ্যান্টিকুইটিজ অফ ঢাকা* গ্রন্থ থেকে)

চিত্র ৩.১৮ দাখিল দরওয়াজা, মূল ড্রইং: হেনরি ক্রেইটন, একুয়াটিন্ট এনগ্রেভিং: জেমস মোফাট (ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ নং ৩৪৮৮২)

চিত্র ৩.১৯ পালকি তৈরি; শিল্পী: ফ্রাঁসোয়া বালথাজার্ড সলভিনস; জলরঙে আঁকা ছবির একুয়াটিন্ট প্রিন্ট, (ম্যানার্স, কাস্টমস অ্যান্ড ড্রেসেজ অফ ইন্ডিয়া, ১৭৯৯ গ্রন্থে মুদ্রিত)

চিত্র ৩.২০ কাপড় ইস্ত্রি করছে ধোপা, শিল্পী: শেখ মোহাম্মদ আমির, (ন্যাশনাল গ্যালারি অফ অস্ট্রেলিয়া সংগ্রহ)

চিত্র ৩.২১ দুটি কুকুর, শিল্পী: শেখ মোহাম্মদ আমির, ঘন জলরঙ, (ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ৬-১৯৫৭)

চিত্র ৩.২২ কদম রসুল, শিল্পী: সীতা রাম, ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ নং ৪৮৮৬

চিত্র ৪.১ একটি গ্রাম্য কুঁড়ের অভ্যন্তর দৃশ্য, শিল্পী: মিসেস এস সি বেলনোস, ১৮৩২

চিত্র ৪.২ কালী, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ (ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়া মিউজিয়াম সংগ্রহ নম্বর: ২৯-২২৫-৩)

চিত্র ৪.৩ হনুমান, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ (ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়া মিউজিয়াম সংগ্রহ নম্বর: ২৯-২২৫-১০)

চিত্র ৪.৪ বিবির আঁচলে বাঁধা বাবু (ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নম্বর: আইএস ২৩৯-১৯৫৩)

চিত্র ৪.৫ বিবির পায়ের নিচে বাবু, শিল্পী : কালিচরন ঘোষ, ১৯০০ (ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নম্বর: আইএম ৩৯-১৯৫২)

চিত্র ৪.৬ যশোদার কোলে শিশু কৃষ্ণ (বাঁয়ে), এবং সেতার বাদনরতা রমণী (শিল্পী: নিবারণচন্দ্র ঘোষ), ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ৪০-১৯৫২ ও আইএস ৩০-১৯৫২ (বিস্তারিত তুলনা)

চিত্র ৪.৭ মাছ কিনছেন বাবু (বাঁয়ে), এবং ভীমের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে দুর্যোধন (ডানে), ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ২১৫-১৯৫০ ও আইএস ৫৮৫-১৯৫০ (বিস্তারিত তুলনা)

চিত্র ৪.৮ এলোকেশী আখ্যান: এলোকেশীকে মোহান্তের প্রলোভন, এলোকেশীর হত্যা, বিচার সভা এবং কারাগারে মোহান্তের ঘানি টানা (ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএম ১৩৭-১৯১৪, ১৪০-১৯১৪, আইএস ৩৮-১৯৭৬ ও আইএম ১৩৮-১৯১৪)

চিত্র ৪.৯ বাবু-বিবির রোমান্স (বাঁয়ে) ও বিবির সৌন্দর্যচর্চা (ডানে), ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ৫০-১৯৬১ ও আইএস ৪৮-১৯৬১

চিত্র ৪.১০ কার্তিকের মাথায় সাহেবী টুপি (বাঁয়ে, ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ৪১-১৯৫২) এবং বাসুদেবের পরনে সাহেবী পোশাক (চেস্টার হারউইটজ সংগ্রহ, যুক্তরাষ্ট্র)

চিত্র ৪.১১ কার্তিক, বটতলায় মুদ্রিত ১২৪৯ সনের পঞ্জিকা থেকে (খোদাইকার কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার)

চিত্র ৪.১২ বটতলার প্রিন্টে কালীঘাটের ছবি : বাঁয়ে কালীঘাটের পট (ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ৫-১৯৪৯), ডানে বটতলার প্রিন্ট (মার্ক ব্যারন ও এলিজে বোসাঁ সংগ্রহশালা, যুক্তরাষ্ট্র)

ভূমিকা

বাংলার ইতিহাসে খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দী এক উত্তাল সময়। আঠারো শতকের গোড়ার দিক থেকেই শুরু হয়েছে বাংলার ইতিহাসের এক পালাবদলের কাল, উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সক্রিয় ছিল সেই পরিবর্তনের ঢেউ। এই পালাবদলের সবচেয়ে জোরালোভাবে দৃশ্যমান অংশটির সঙ্গে সম্পৃক্তি রাজনীতির। আঠারো শতক শুরুর ঠিক আগের একশত বছর বাংলা ছিল প্রবল পরাক্রম মুঘল সাম্রাজ্যের ছোট্ট এক সীমান্তবর্তী প্রদেশ; ফলে ও ফসলে, অর্থনৈতিক সম্ভাবনায় আকর্ষণীয় মনে হলেও নদীমাতৃক এই বদ্বীপের আবহাওয়া মোটেই পছন্দের ছিল না মুঘল বাদশাহ ও অভিজাতদের কাছে। এখানে স্থায়ি আবাস গড়তে চাননি তাঁরা কেউই, এই সুবাহ'র দায়িত্ব পাওয়াকে মনে করেছেন শাস্তি। এখানে দায়িত্ব পালন করে জমানো টাকা নিয়ে ফিরে গেছেন উত্তর ভারতে, সেখানেই গড়েছেন নিজেদের প্রমোদ-প্রাসাদ। কিন্তু আঠারো শতকের গোড়ার দিক থেকেই শিথিল হতে শুরু করে মুঘল সাম্রাজ্যের বাঁধুনি, অন্য অনেক প্রদেশের মতো স্বায়ত্ত্বশাসনের অধিকার পেয়ে যায় বাংলাও। ১৭০৪ সালেই ঢাকা থেকে মুঘল বাংলার রাজধানী সরে যায় মুর্শিদাবাদে, সেখানে গড়ে ওঠে নতুন এক অভিজাততন্ত্র। কিন্তু এই নব্য অভিজাততন্ত্র নিজেদের টিকিয়ে রাখতে পারেনি খুব বেশি দিন। অর্ধশতাব্দী যেতে না যেতেই নতুন এক ঢেউয়ের আঘাতে আমূল বদলে যায় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রান্তরে সংঘটিত এক প্রহসনের যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলাহকে হারিয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। শুরু হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন।

এই পালাবদলটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ছিল না। তেরো শতকের গোড়ার দিক থেকে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূত্র ধরে যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিকশিত হচ্ছিল, এই সময়ে হঠাৎ করেই বদলে যেতে শুরু করেছিল সেটা। মুর্শিদাবাদের পরিবর্তে নতুন রাজধানী স্থাপিত হয় কলকাতায়, ফারসির স্থানে প্রশাসনের ভাষা হয়ে ওঠে ইংরেজি, আরব-পারস্য থেকে আসা মুসলিম অভিজাতবর্গের আদব-কেতা, পোশাক-আশাকের জায়গা নিতে শুরু করে ইউরোপিয় রীতি। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সূত্র ধরে কোম্পানির হাত থেকে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়া এই সাংস্কৃতিক পালাবদলকে আরো বেশি করে প্রভাবিত করেছে। এর পেছনের কারণ, ব্রিটিশদের নীতি। ভারতবর্ষে 'ব্রিটিশ রাজ' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে তারা, আর সেই লক্ষ্যে সচেতনভাবে বদলে ফেলেছে বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক বলয়, এমনকি শিক্ষা-ব্যবস্থাকে পর্যন্ত ঢেলে সাজানো হয়েছে।

এই পরিবর্তনের ছোঁয়া সবচেয়ে বেশি করে লেগেছে যে সব ক্ষেত্রে, তার মধ্যে শিল্পকলা চর্চা, বিশেষ করে চিত্রকলা অন্যতম। চিত্রকলা চর্চায় বাঙালিদের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। পশ্চিমবঙ্গের অজয় নদের তীরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে হরপ্পা-যুগের সমসাময়িক সভ্যতার যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কালো মৃৎপাত্রের গায়ে সাদা রঙে আঁকা রেখাচিত্রকে বলা যায় বাঙালি শিল্পীদের চিত্রকলাচর্চার প্রাচীনতম উদাহরণ। সেই থেকে শুরু করে বাঙালির ঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকেই দিক বদলেছে বাংলার চিত্রকলা চর্চাও। প্রাক-মুসলিম যুগে এই চিত্রকলার সবচেয়ে জোরালো মাধ্যম ছিল তালপাতার পুঁথি; মুসলিম আমলে তার জায়গাটা নিয়েছিল আরবি-ফারসি পাণ্ডুলিপি আর দরবারি শিল্পীর আঁকা মুরাক্কা বা অ্যালবাম। তবে চিত্রকলা চর্চার মূল রীতিটা ছিল অভিন্ন, রাজা-বাদশাহ কিংবা তাঁদের দরবারি অভিজাতবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে চলতো সুকুমার

শিল্পের ধারা । এর বিপরীতে সাধারণ্যের পৃষ্ঠপোষকতায় এক ধরনের বাজারি ছবির প্রচলনও হয়তো ছিল, কিন্তু সঙ্গত কারণেই সে ছবির উপকরণ-মাণ এবং সংরক্ষণ প্রক্রিয়া ছিল উপেক্ষণীয়; তাই প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে সে ছবির চরিত্র বিশ্লেষণের সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে ।

ঊনবিংশ শতকে 'ব্রিটিশ রাজ' প্রতিষ্ঠার প্রকল্প এই রীতিটাকেই বদলে দিয়েছিল । ব্রিটিশরা চেয়েছিল ভারতের 'নেটিভ'দের ব্রিটিশ রাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে, আফ্রিকাসহ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে উপনিবেশগুলোর মতোই ভারতবর্ষের অধিবাসীদেরও তারা মনে করতো শিক্ষা-সংস্কৃতিতে অনগ্রসর, পশ্চাদপদ আর এদেরকে 'সভ্য' করে তোলার মহান দায়িত্ব তাদের কাঁধে ছিল বলেই তারা প্রচার করতো ।[১] এই প্রকল্পেরই অংশ হিসেবে উনিশ শতকে ব্রিটিশ আদলে ঢেলে সাজানো হয়েছিল ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাকে, সেই সূত্র ধরে বদলে গিয়েছিল শিল্পকলা চর্চার ধারাটিও । কোম্পানির কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আর্ট স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এর আগেই, সেই স্কুলের সরকারিকরণ ও কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছিল 'রাজ' প্রতিষ্ঠার সেই ব্রতকে সামনে রেখেই । উনিশ শতকেরই একেবারে শেষ দিকে আবার এই পাশ্চাত্যধারার একাডেমিক রীতির বিপরীতে শুরু হয়েছিল শিল্পকলা চর্চার এক জাতীয়তাবাদী ধারা । সব মিলিয়ে তাই এই সময়টা বাংলার চিত্রকলা চর্চার ইতিহাসে বাঁক বদলের স্বাক্ষী । বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য এই বাঁক বদলের চিত্রটাকে তুলে ধরা ।

প্রচলিত ঐতিহাসিক কাল বিভাজনের পর্ব হিসেব করলে এই দুই শতাব্দীকে ঠিক আলাদা কোনো কালপর্বে ফেলা সম্ভব নয় । ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস স্টুয়ার্ট মিল ভারতীয় ইতিহাসের যে কালবিভাজন করেছিলেন, তাতে হিন্দু,

---

[১] T.R. Metcalf, *Ideologies of the Raj*, The New Cambridge History of India, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, pp 66-112.

মুসলিম ও ব্রিটিশ যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যথাক্রমে খ্রিস্টিয় ত্রয়োদশ শতকের পূর্ববর্তী যুগ, ত্রয়োদশ শতক থেকে শুরু করে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত আর তার পরবর্তী সময়কে।[২] এই যুগ বিভাজনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়েছে নানাভাবে, বিশেষ করে এর ধর্মভিত্তিক বিভাজন প্রক্রিয়াটি অবশ্যই প্রশ্নসাপেক্ষ[৩]; কিন্তু যুগের নামকরণ নিয়ে বিতর্ক চলমান থাকলেও ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সময়ের বিচারে ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিক থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়কালকে প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মধ্যকার বিভাজক সময় হিসেবেই সাধারণত দেখা হয়ে থাকে। সেই বিচারে আঠারো ও উনিশ শতক দুটি ভিন্ন কালপর্বের প্রতিনিধিত্ব করে– মধ্যযুগের শেষ আর আধুনিক যুগের শুরু। কিন্তু বাংলার চিত্রকলায় দেশজ ও ইউরোপীয় ভাবধারার সংমিশ্রনের ইতিহাসটি পর্যালোচনা করতে হলে দুটি ভিন্ন কালপর্বের এই সময়টুকুই বিবেচনায় নেয়া জরুরি। আঠারো শতকে মুঘল রীতির বিকাশ ও বিচ্ছুরণ থেকে শুরু করে উনিশ শতকে পাশ্চাত্য একাডেমিক ধারার যাত্রা শুরুর কালপর্বে চলেছে এই সংশ্লেষণের প্রক্রিয়াটি। ঠিক এই সময়েই আবার নতুন করে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে গণমানুষের ছবিও, কালিঘাটের মন্দিরকে ঘিরে পটুয়াদের কাজ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে ঘরে। পাশাপাশি বিকাশমান এই দুটি ধারাই বাংলার চিত্রকলাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে আধুনিকতায় উত্তরণের পথে। উনিশ শতকের একেবারে শেষ পাদে শেষ হয়েছে সেই যাত্রা, বিশ শতকে

---

[২] J. Mill, *The History of British India*, London: Baldwin, Cradock, 1817, vol. i, preface.

[৩] দ্রষ্টব্য, মোহাম্মদ মুসা আনসারী, *ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১, পৃ. ৪৭-৫৪; এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করেছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের মিলেনিয়াম সেশনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে। দ্রষ্টব্য, 'History and the Enterprise of Knowledge', https://newhumanist.org. uk/articles/458/history-and-the-enterprise-of-knowledge, Retrieved on 21-02-2016.

নব্য বঙ্গীয় ধারার জাতীয়তাবাদী ধারণার বিকাশের মধ্য দিয়ে যা পরিপুর্ণতা লাভ করেছে।

গবেষণার সময়কাল হিসেবে আঠারো ও উনিশ শতককে বেছে নেয়ার পেছনের কারণ এই সময়কালে চিত্রকলায় বাঁক বদল। এ প্রসঙ্গে চিত্রকলার সংজ্ঞায়নটিও জরুরি। সাধারণত চিত্রকলাকে মনে করা হয় শিল্পকলার সবচেয়ে জোরালো মাধ্যমগুলোর অন্যতম হিসেবে। শিল্পের সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। তবে যেকোনো মহৎ শিল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে মানুষ অথবা মানবিক বিষয়বস্তু। মানুষকে স্থান-কাল ও আবহমানকালের পরিপ্রেক্ষিতে উপলব্ধি করা সম্ভব হলেই কোনো বস্তু শিল্প হয়ে ওঠে। তবে এর জন্য প্রয়োজন প্রায়োগিক দৃষ্টিভঙ্গি। প্রতিবেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অগণন উপাদান, বিস্তৃত উপকরণ এবং অপার সম্ভাবনা থেকেই উঠে আসে শিল্পিত বস্তু। শিল্পীকে তার সৃষ্টিকে তুলে ধরতে হয় দৃশ্যত অবয়বে। এ কৌশল যার যত বেশি আয়ত্তাধীন, সে তত বড় মাপের শিল্পী হয়ে ওঠেন তার নিজস্ব সমাজবলয়ে অথবা বৈশ্বিক পটভূমিতে। এ ক্ষেত্রে একজন শিল্পীর সবচেয়ে বড় অবলম্বন তাঁর জীবনাভিজ্ঞতা। এ কথা অস্বীকার করার জো নেই, বাস্তবতার নিরীখে একজন শিল্পী তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ অবয়বকে মূর্ত করে তোলেন; দৃষ্টিগোচর করে তোলেন বায়বীয় অস্তিত্বকে। শিল্পের সঙ্গে তাই মানবিক চৈতন্যের গভীর সম্পৃক্ততা রয়েছে। তবে এ কথাও অসত্য নয় যে, পারিপার্শ্বিক কোনো কোনো ঘটনা শিল্প-সাধনাকে হঠাৎই বেগবান করে তোলে। শিল্পীর দায়বদ্ধতাকে উসকে দেয় শৈল্পিক সৃষ্টির উন্মাদনায়। আঠারো ও উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক পরিবর্তনগুলো তেমনই যুগান্তকারী ঘটনা, শিল্পের প্রায়োগিক দিকগুলো আমূল পাল্টে গিয়েছিল যার প্রভাবে।

চিত্রকলা এই শিল্পকলারই অন্যতম মাধ্যম। আপাত দৃষ্টিতে চিত্রকলা মূক হলেও তার সবচেয়ে বড় শক্তি তার প্রায়োগিক ভাষা। এর কোনো স্থানিক ভাষিক-ভঙ্গি নেই। যার ফলে একজন বাঙালি চিত্রশিল্পীর চিত্রকর্মও উপলব্ধি করতে পারেন বাংলা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে না-থাকা যেকোনো মানুষ। অথবা একজন ইউরোপিয়ান শিল্পীর চিত্রকর্ম দেখে অনায়াসেই বোধগম্য করতে পারেন বাঙালি চিত্রদর্শকরা। আর এর সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো, এ শিল্পের কোনো সীমান্তরেখা নেই। কিন্তু তাই বলে কি একে দেশকালের সীমানায় বাঁধার কোনোই সুযোগ নেই? তা নয়। মানবিকতার প্রয়োগ আছে বলেই শিল্পকলা তথা চিত্রকলার একটি স্থানিক চরিত্র থাকাটা অবশ্যসম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,

> চিত্রশিল্প দুই প্রকারের আছে। এক- অনুভাবপূর্ণ মুখশ্রী ও প্রকৃতির অনুকৃতি, দ্বিতীয়- যথাযথ রেখা-বিন্যাসের দ্বারা একটা নেত্ররঞ্জক আকৃতি নির্মাণ করা। কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, প্রথমটি উচ্চতম শ্রেণীর চিত্রবিদ্যা। আমাদের দেশে শালের উপরে, নানাবিধ কাপড়ের পাড়ে, রেখাবিন্যাস ও বর্ণবিন্যাস দ্বারা বিবিধ নয়নরঞ্জক আকৃতিসকল চিত্রিত হয়, কিন্তু শুদ্ধ তাহাতেই আমরা ইটালীয়দের ন্যায় চিত্র-শিল্পী বলিয়া বিখ্যাত হইব না।[৪]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই মন্তব্যেও কিন্তু সুস্পষ্ট একটি ইঙ্গিত আছে, চিত্রকলায় বাঙালির আবহমান ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথের কাল, তথা উনিশ ও বিশ শতকে ঠিক কী চোখে দেখা হতো। ব্রিটিশদের ঔপনিবেশিক শিক্ষা বাংলা তথা ভারতবর্ষের ঐতিহ্যকে অবমূল্যায়ন, বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে অস্বীকার করারই প্রবণতা তৈরি করেছিল। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আঠারো আর উনিশ শতকে পৃষ্ঠপোষকের চরিত্র বদলের মধ্য দিয়ে এই প্রবণতাকে বুড়ো আঙুল

[৪] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা', *সংগীত চিন্তা*, রবীন্দ্র রচনাবলী, শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৯৭, সপ্তদশ খ-, পৃ. ১৮।

দেখিয়েই বাংলার চিত্রকলায় যুগপৎ সক্রিয় ছিল দেশজ ও বহির্দেশীয়, বিশেষত ইউরোপীয় ধারা ।

বাংলায় চিত্রকলার প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস প্রাচীন হলেও সেই ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা অবশ্য খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না । প্রাচীনকাল থেকে বাংলার চিত্রকলার ইতিহাস তাই ঐতিহাসিক বিবরণের অভাবে রহস্যাবৃত । আঠারো-উনিশ শতকে, ব্রিটিশদেরই আগ্রহ ও তত্ত্বাবধানে ভারততত্ত্ব চর্চার সূত্র ধরে আবিস্কৃত কিছু তালপাতার পুঁথিতে খুঁজে পাওয়া ছবি প্রাচীন বাংলার চিত্রকলা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা দেয় । এ বিষয়ে সরস্বীকুমার সরস্বতীর লেখা *পালযুগের চিত্রকলা* বাংলায় চিত্রকলার ইতিহাস রচনায় পথিকৃৎ । অতি সামান্য আঁকরকে দুর্দান্ত বিশ্লেষণ দিয়ে দারুণ মহিমায় ফুটিয়ে তুলেছেন তিনি । তাঁর ওই রচনার কৌশল অনুসরণীয়, কিন্তু বিষয়বস্তু বর্তমান গবেষণার সীমানায় নয় ।

প্রাচীন বাংলার চিত্রকলাকে সরস্বতী যে দক্ষতায় বিশ্লেষণ করেছেন, মধ্য কিংবা আধুনিক যুগের ছবিকে ঘিরে ঠিক সে রকম পা-ত্যপুর্ণ বিশ্লেষণ আর পাওয়া যায় না । এ সব বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কিছু কাজ অবশ্য হয়েছে । সুলতানি আমলে বাংলায় চিত্রায়িত একমাত্র যে পাণ্ডুলিপিটি আবিস্কৃত হয়েছে, সেই *ইস্কান্দার নামা* বা *শরফনামা* চিত্রাবলী নিয়ে লিখেছেন রবার্ট স্কেলটন[৫] ও মমতাজুর রহমান তরফদার[৬] । মুর্শিদাবাদের চিত্রকলা চর্চা নিয়ে স্কেলটনের

[৫] R. Skelton, 'The Iskandar Nama of Nusrat Shah: A Royal Sultanate Manuscript Dated 938 A.H. 1531-32 AD', in *Indian Painting Mughal and Rajput and a Sultanate Manuscript*, London: P & D Colnaghi & Co. Ltd, 1978, pp. 133-52.

[৬] M.R. Tarafdar, 'Some Illustrations of the Period of Nusrat Shah', in *Journal of Bengal Art,* vo. 1, Dhaka: International Centre for Study of Bengal Art, 1996 pp 73-100.

অন্য একটি লেখাও[৭] যথেষ্ট আলোচিত হয়েছে। মুর্শিদাবাদ চিত্রকলা নিয়ে লিখেছেন নাজমা খান মজলিশ[৮], জেপি লস্টি[৯] প্রমুখও। লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস সংগ্রহশালায় রক্ষিত কোম্পানি আমলের চিত্রকলার দুর্দান্ত একটি ক্যাটালগ সম্পাদনা করেছেন টোবি ফক ও রবিন মিলড্রেড আর্চার।[১০] আর্চারেরই সম্পাদনায় বেরিয়েছে লন্ডনের অন্য একটি সংগ্রহশালা ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত কোম্পানি আমলের চিত্রকলার আরেকটি ক্যাটালগ।[১১] ব্রিটিশ এই কিউরেটর লিখেছেন কোম্পানি আমলের ড্রয়িং[১২] এবং কালিঘাটের পট নিয়েও[১৩]।

কালিঘাটের পট নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে অনেক গবেষণা হয়েছে, প্রকাশনাও হয়েছে বেশ কিছু। শুরুটা করেছিলেন উইলিয়াম আর্চার[১৪]; তাঁকে অনুসরণ করে

---

[৭] R. Skelton, 'Murshidabad Painting', in *Marg*, vol. X, Bombay: Marg Publications, 1956, pp. 10-22.

[৮] Najma Khan Majlish, 'Murshidabad Painting' in *Banglapedia*, ed. Sirajul Islam, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2001.

[৯] J.P. Losty, 'Painting at Murshidabad 1750-1820' in Neeta Das and Rosie Llewellyn-Jones (ed.), *Murshidabad: Forgotten Capital of Bengal*, Mumbai: Marg Foundation, pp. 82-105.

[১০] T. Falk and M. Archer, *Indian Miniatures in the India Office Library*, London: Sotheby Canada, 1981.

[১১] M. Archer and G. Parlett, *Company Paintings: Indian Paintings of the British Period* (Indian Art Series), London: Mapin Intl, 1993.

[১২] M. Archer, *Company Drawings in the India Office Library*, London: HM Stationary Office, 1972; See also: M. Archer, *Natural History Drawings in the India Office Library*, London: HM Stationary Office, 1962.

[১৩] M. Archer and W.G. Archer, *Indian Paintings for the British 1770-1880*, Oxford: University Press, 1955.

[১৪] W. G. Archer, *Bazaar Paintings of Calcutta, the Style of Kalighat*, London: HM Stationary Office, 1953; W. G. Archer, *Kalighat Paintings: A Catalogue and Introd. by W. G. Archer*, London: HM Stationary Office, 1971.

গুরুসদয় দত্ত, অজিত ঘোষ[১৫], জ্যোতিরিন্দ্র জৈন[১৬], মুকুল দে[১৭], প্রদ্যোত ঘোষ প্রমুখ চর্চা করেছেন এই নিয়ে। বিভিন্ন সংগ্রহশালার ক্যাটালগ সম্পাদনা করেছেন এএন সরকার[১৮], পিকা ঘোষ[১৯], এস চক্রবর্তী[২০]। লিখেছেন শোভন সোম, পার্থ স্যান্যাল, একেএম খাদেমুল হকসহ অনেকেই।

তবে আঠারো ও উনিশ শতকে বাংলার চিত্রকলায় পরিবর্তনের ধারা সম্পর্কে আলাদা করে আলোকপাত করা হয়নি এ সব রচনার কোনোটিতেই। বাংলার চিত্রকলার সামগ্রিক ইতিহাস নিয়ে লেখা অশোক ভট্টাচার্যের *বাংলার চিত্রকলা* (কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯২, পুনর্মুদ্রণ ২০০২) গ্রন্থে এর খানিকটা আভাস আছে, কিন্তু বইটির বিষয়বস্তুর পরিসর এত বিশাল, যে তার মধ্য থেকে এই দুই শতকের ইতিহাস সমূদ্রের বুকে নুড়ি-পাথর খোঁজার মতোই দুরূহ ব্যাপার।

বাংলার চিত্রকলায় আধুনিকতার বিকাশ নিয়ে অবশ্য বেশ কিছু ভালো গবেষণাধর্মী কাজ হয়েছে। তার মধ্যে রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়ের *From the Karkhana to the Studio: A Study in the Changing Social*

---

[১৫] A. Ghose, 'Old Bengal Paintings', in *Rupam*, Calcutta 1926.

[১৬] J. Jain, *Kalighat Painting: Images from a Changing World*, Ahmedabad: Mapin Publishing Pvt. Ltd., 1999.

[১৭] M. Dey, 'Drawings and Paintings of Kalighat', in *Advance*, Calcutta, 1932; Mukul Dey, 'The Painters of Kalighat: 19th Century Relics of a Once Flourishing Indian Folk Art Industry Killed by Western Mass Production Methods', in *The Statesman*, Calcutta, Sunday, October 22, 1933.

[১৮] A.N. Sarkar & C. Mackay, *Kalighat Paintings*, National Museums and Galleries of Wales, Roli books Pvt. Ltd and Lusture Press Pvt. Ltd., New Delhi 2000.

[১৯] P. Ghosh, "Kalighat Paintings from Nineteenth Century Calcutta in Maxwell Sommerville's 'Ethnological East Indian Collection'" *Expedition Magazine*, 42.3 (November 2000).

[২০] S. Chakravarti (ed.), *Kalighat Paintings in Gurusaday Museum*, Gurusaday Dutt Folk art Society, Kolkata 2001.

Roles of Patron and Artist in Bengal সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এ গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক নিজেই জানিয়েছেন, তিনি চেষ্টা করেছেন ঔপনিবেশিক যুগের সূচনায় বাংলায় চিত্রকর ও চিত্রকলার দর্শক ও পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যকার সম্পর্কটি কীভাবে বদলে যাচ্ছিল তার একটি উপাখ্যান লিখতে,

> In this book I have attempted to chronologically chart the interactions between the artists and their audience, to clarify how the instituted artist of the court producing for an exclusive clientele was marginalised along with the popular artists facing the onslaught of colonialism. In the colonial phase the norms and practice of art changed with our absorption of English education, paradoxically giving use at the same time to the concept of Indianness of Indian art. This Indianness in its many variants became a marketable commodity which has continued to harness the Indian artists and their audience in their attempts to establish an identity.[21]

মুঘল চিত্রকলার একনিষ্ঠ গবেষক হিসেবে রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় তাঁর এ গ্রন্থে দেখিয়েছেন মুর্শিদাবাদের দরবারে কীভাবে মুঘল দরবারের অনুকৃতিতে গড়ে উঠেছিল চিত্রিত পাণ্ডুলিপি কিংবা মুরাক্কা তৈরির *কারখানা*; কী প্রক্রিয়ায় শিল্পীরা কাজ করতেন সেই চিত্রশালায়। তারপর ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাবে কীভাবে ধীরে ধীরে বদলে গেল এই চর্চারীতি, দরবারি *কারখানা*র স্থান কীভাবে দখল করে নিল ব্যক্তি শিল্পী কিংবা শিল্পগোষ্ঠীর নিজস্ব *স্টুডিও*; মুঘল ধারা মিনিয়েচার ছবির চরিত্র বদলে কী করে গুরুত্ব পেতে শুরু করলো একাডেমিক রিয়েলিজম আর নিসর্গচিত্র বা ল্যান্ডস্কেপের নিখুঁত রূপায়ণ। তাঁর এই বিশ্লেষণের সূত্র ধরেই উঠে এসেছে উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলা

---

[২১] R. Chatterjee, *From the Karkhana to the Studio: A Study in the Changing Social Roles of Patron and Artist in Bengal,* New Delhi: Books N Books, 1990, Preface, p. vi.

চিত্রকলায় জাতীয়তাবাদ বিকাশের বিষয়টিও। সেই অর্থে এই গবেষণাটিকে বলা চলে বর্তমান গবেষণার সত্যিকারের পূর্বসূরী। তবে রত্নাবলীর গবেষণার মূল বিষয়বস্তু ছিল চিত্রকর ও তার পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যকার সম্পর্কের বিশ্লেষণ, এবং সেটার বেশিরভাগ অংশ জুড়ে আঠারো-উনিশ শতকের বিষয়বস্তু স্থান পেলেও তিনি সেখানেই থেমে থাকেননি, তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র যথার্থ কারণেই বিস্তৃত হয়েছে বিশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত।

উনিশ এবং বিশ শতকে বাংলার 'রেনেসাঁ' এবং তাকে ঘিরে বাংলার শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাসে আধুনিকতার বিকাশ নিয়েও অনেক গবেষণা হয়েছে আর সে সব গবেষণার সূত্র ধরেও আলোচিত হয়েছে বর্তমান গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলী। এই সময়ের চালচিত্রের সবচেয়ে আলোচিত ও গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাকার পার্থ মিত্র। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *Much Maligned Monsters: History of European Reactions to Indian Art*[২২] তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, আঠারো শতকের পর থেকে ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে বাংলার আবহমাণ ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলার দ্বান্দ্বিক অবস্থানকে। এই দ্বন্দ্বের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে বিশ শতকের গোড়ার দিকে কীভাবে শিল্পকলার জাতীয়তাবাদী উত্তরণ ঘটেছিল, তার ব্যাখ্যা আছে তাঁর *Art and Nationalism in Colonial India 1850-1922: Occidental Orientations*[২৩] গ্রন্থে আর *The Triumph of Modernism: India's Artists and the Avant-Garde – 1922-1947*[২৪] গ্রন্থে বিশ শতকে

[২২] P. Mitter, *Much Maligned Monsters: History of European Reactions to Indian Art*, Oxford: Clarendon Press, 1977; Chicago: University Press Paperback, 1992; New Delhi: Oxford University Press, 2013.

[২৩] P. Mitter, *Art and Nationalism in Colonial India 1850-1922: Occidental Orientations*, Cambridge: University Press, 1994.

[২৪] P. Mitter, *The Triumph of Modernism: India's Artists and the Avant-Garde – 1922-1947*, London: Reaktion Books; New Delhi: Oxford University Press, 2007.

বাংলার শিল্পকলায় আধুনিকতার বিকাশ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পটভূমি হিসেবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন আগের দুই শতকের শিল্পকলার চরিত্র। বর্তমান গবেষণায় তাঁর তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, তবে মনে রাখা দরকার, তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র সামগ্রিকভাবে বাংলার শিল্পকলা, চিত্রকলা যার একটি অংশমাত্র।

এই একই সময়কালের শিল্পকলার নানা দিক নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী গবেষণা করেছেন তপতী গুহ-ঠাকুরতাও। তবে তাঁর *Monuments, Objects, Histories: Institutions of Art in Colonial and Post-Colonial India* গ্রন্থের[২৫] মূল উপজীব্য মেটকাফের 'ব্রিটিশ রাজ' তত্ত্বের আলোকে ঔপনিবেশিক যুগে ভারতবর্ষের স্থাপত্যকে বিশ্লেষণ করা। সেই সূত্রে অনিবার্যভাবেই এসেছে চিত্রকলার প্রসঙ্গও। তুলনায় তাঁর *The Making of a New 'Indian' Art: Artists, Aesthetics and Nationalism in Bengal, c. 1850-1920* গ্রন্থটির[২৬] বিষয়বস্তু এই গবেষণার সঙ্গে বেশি সম্পৃক্ত। তবে এটিরও বিশ্লেষণের বিষয় মূলত পার্থ মিত্রের গ্রন্থের মতোই শিল্পকলায় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। বর্তমান গবেষণায় সেই উন্মেষ প্রক্রিয়ার প্রস্তুতিপর্বটিই ব্যাখ্যা করা হয়েছে বেশি করে।

আলোচ্য সময়ে বাংলার চিত্রকলার বিবর্তন, বিশেষ করে তাতে স্থানীয় উপকরণ-উপাদানের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে হলে আঠারো শতকের আগে বাংলায় চিত্রকলার বিকাশ সম্পর্কে একটি ধারণা থাকা জরুরি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়ে মূলত এই পটভূমি আলোচিত হয়েছে। আঠারো

---

[২৫] T. Gugha-Thakurta, *Monuments, Objects, Histories: Institutions of Art in Colonial and Post-Colonial India,* New York: Columbia University Press, 2004.

[২৬] T. Gugha-Thakurta, *The Making of a New 'Indian' Art: Artists, Aesthetics and Nationalism in Bengal, c. 1850-1920,* Cambridge: University Press, 1992

ও উনিশ শতকে বাংলার চিত্রকলার বিকাশপর্বে কালানুক্রমে তিনটি পৃথক ধারা চিহ্নিত করা হয়েছে এই বিশ্লেষণে। যথা:

ক. দরবারি চিত্রকলা

খ. অভিজাত চিত্রকলা

এবং গ. গণমানুষের ছবি

এই তিনটি পর্বকে ধারাবাহিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে। এর মধ্যে দরবারি চিত্রকলার বিকাশ এবং পতনের পর্বটি আঠারো শতকের প্রথমার্ধ থেকে শুরু করে দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় দশকেই শেষ হয়েছে। এই পর্বের মূল কেন্দ্র ছিল তৎকালীন বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ আর তাই এই সময়ের চিত্রকলা সাধারণত মুর্শিদাবাদ চিত্রকলা হিসেবে পরিচিত।

সাধারণভাবে কোম্পানি চিত্রকলা হিসেবে পরিচিত দ্বিতীয় ধারাটির ব্যাপ্তি আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রায় একশত বছর। এ পর্বের সূচনা হয়েছিল মুর্শিদাবাদ নগরীকে ঘিরেই, তবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শক্তিকেন্দ্র কলকাতায় রাজধানী সরিয়ে নেয়ার পর এই ধারাটি মূলত বিকাশমান এই নগরীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। মুর্শিদাবাদের দরবারকে ঘিরে যে চিত্রভাষা গড়ে উঠেছিল, তার নেপথ্যে ছিল মুঘল ঐতিহ্যের দরবারি চিত্রশালা বা সুরতখানা, যেখানে পৃষ্ঠপোষকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে চলতো শিল্পীদের সব ধরনের কাজকর্ম। পৃষ্ঠপোষকদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতার এই ধারাটি কোম্পানি আমলে বদলাতে শুরু করে। কোম্পানির গভর্নর জেনারেল এবং তাঁদের সঙ্গীসাথী অভিজাতরাও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন; এমনকি এ সময় রাষ্ট্রীয় উদ্যোগেও চিত্রকলা চর্চা শিক্ষার কেন্দ্র পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সূত্রে বদলে গেছে শিল্পরীতি এবং কৌশলও। কিন্তু দরবারি চিত্রকররা যেমন

পৃষ্ঠপোষকদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন সেটার প্রয়োজনীয়তা আর ছিল না, খুব সন্তর্পনে এ সময় থেকেই প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে শিল্পীদের স্বাধীন সত্ত্বা । এই ধারাটিকে অভিজাত চিত্রকলা হিসেবে চিহ্নিত করে আলোচনা করা হয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে ।

উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে এর সঙ্গে যোগ হতে শুরু করে লোকায়ত চিত্রকলার একটি বেগবান ধারা । নগর কলকাতার বিকাশের সূত্র ধরে গড়ে উঠতে শুরু করে চিত্রকলার নতুন এক ভোক্তা শ্রেণিও । আর সেই শ্রেণির চাহিদা মেটাতে গিয়ে কোম্পানি চিত্রকলার সমান্তরালে বিকশিত হতে থাকে গণমানুষের জন্য ছবি আঁকার রীতি । এই ভোক্তা শ্রেণির ব্যপ্তি ছিল বিশাল, তাদের রুচির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়েই উনিশ শতকে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মুখোমুখি হয়েছে বাংলার চিত্রকলা । ঔপনিবেশিকতা আর জাতীয়তাবাদী ভাবনার দ্বন্দ্বও ছিল সেই ঘাত-প্রতিঘাতের অংশ । এই ধারাটিকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে ।

উপসংহারে যাওয়ার আগে পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে এই তিন পর্বে বাংলার চিত্ররীতি ও কৌশলে সূচিত হওয়া পরিবর্তনসমূহ ।

প্রথম অধ্যায়

পটভূমি

চিত্রকলা চর্চায় বাঙালিদের রয়েছে সুপ্রাচীন ঐতিহ্য। যখন থেকে বাংলা অঞ্চলে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, তখন থেকেই এ সুকুমার শিল্পের চর্চা করে আসছেন বাংলার শিল্পীরা, নানা সূত্রে এমন আভাস পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের অজয় নদের তীরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে হরপ্পা-যুগের সমসাময়িক সভ্যতার যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কালো মৃৎপাত্রের গায়ে সাদা রঙে আঁকা রেখাচিত্র বাঙালি শিল্পীদের চিত্রকলাচর্চার প্রাচীনতম উদাহরণ। বাংলার শিল্পীদের এ সৃজনশীলতার সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প-ঐতিহ্যের ধারনা যোগ করেই ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করেছে বাংলার চিত্রকলা। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে পাওয়া মৃৎপাত্রের অলঙ্করণগুলোকে অবশ্য ঠিক পূর্ণ বিকশিত চিত্রকলার নিদর্শন বলা যাবে না। তবে বাংলায় আঁকা পূর্ণাঙ্গ ছবির এ পর্যন্ত আবিস্কৃত প্রাচীনতম নিদর্শনও কম পুরনো নয়, পালরাজা প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বের অষ্টম বছরে (আনুমানিক ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ) নালন্দা মহাবিহারে লেখা *অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা* নামের একটি পুঁথির অলঙ্করণ হিসেবে আঁকা ১২টি ছবি।[২৭] বর্তমানে দুর্লভ এই পাণ্ডুলিপি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত আছে। এছাড়া প্রথম মহীপাল এর রাজত্বের আরও দুটি চিত্রায়িত পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছে, তবে এগুলি পরবর্তী সময়ের। এ সময় থেকে পরবর্তী দুইশত বছরে তালের পাতায় আঁকা এ রকম আরো অনেক পুঁথি-চিত্রনের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ সব পুঁথিতে আঁকা

[২৭] সরসীকুমার সরস্বতী, *পালযুগের চিত্রকলা*, কলকাতা: আনন্দ প্রকাশন, ১৯৭৮, পৃ. ১৩।

ছবিগুলোও মোটেই কাঁচা হাতের কাজ নয়, দেখে বোঝা যায় এগুলো দীর্ঘদিনের চিত্র ঐতিহ্যের ফসল।[২৮] যেহেতু পালবংশীয় রাজাদের রাজত্বকালে এ সমস্ত পাণ্ডুলিপি চিত্রালঙ্কৃত হয়েছে, তাই এগুলিকে 'পাল মিনিয়েচার' বলে অভিহিত করা হয়। এ চিত্রকলার অঙ্কন-নৈপুণ্য এতই উন্নত যে, এগুলিকে বঙ্গীয় চিত্রকলার প্রাথমিক নিদর্শন বলে মনে হয় না। চিত্রকর্মগুলির উন্নত শিল্পরীতি দেখে মনে হয় এর পিছনে অনেক দিনের অভিজ্ঞতা কাজ করেছে।

পাল-পূর্ব যুগের কোন চিত্রালঙ্কৃত পাণ্ডুলিপি পূর্ব ভারতে পাওয়া না গেলেও বাংলাসহ ভারতীয় উপমহাদেশে যে অতিপ্রাচীনকাল থেকেই চিত্রকলার চর্চা ছিল, তার আভাস পাওয়া যায় নানা সূত্র থেকে। এ অঞ্চলের আদিবাসী হিসেবে কোল, শবর, চ-াল প্রভৃতি অনার্য জনগোষ্ঠীর কথা বৈদিক সাহিত্য থেকে জানা যায়। সেই সঙ্গে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বদ্বীপ বাংলার উর্বর ভূমি, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া এবং দেশের সর্বত্র ধনরত্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার গল্পগাথা প্রাচীনকাল থেকে আগন্তুকদের এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে উৎসাহিত করে আসছে। ত্রয়োদশ শতকের ভেনিসিয় পর্যটক মার্কোপোলোর (১২৫৪-১৩২৪) লেখা থেকে বিশ্ব *বাংলা* নামটির সঙ্গে পরিচিত হয়,[২৯] তবে বর্তমান বাংলাদেশ আর ভারতের বাংলা রাজ্যের ভৌগলিক সীমানাজুড়ে বাংলা নামের যে অঞ্চলটি চিহ্নিত, সে অঞ্চলের ঐতিহাসিক পরিচয় আরো অনেক পুরনো। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকেই এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় প্রামাণিক লিখিত দলিলের মাধ্যমে। বর্তমান বাংলাদেশের

---

[২৮]. অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০২, পৃ. ১৩।

[২৯] Yule, Henry, *The Book of Ser Marco Polo, the Venetian Concerning the Kingdoms and Marvels of the East*, Volume 2, (3rd ed.), London: John Murray, 1903, পৃ. ৯৮-১০১।

অন্তর্ভুক্ত বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে আবিস্কৃত প্রত্নতাত্তিক নিদর্শনের আলোকে প্রমাণিত হয় যে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষে এ অঞ্চলে একটি জনবসতি তো ছিলই, এমনকি নগরায়ণও ঘটেছিল।[৩০] মহাস্থানগড়ে উৎখননে আবিস্কৃত 'পুন্ড্রবর্ধন' নগরী মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শুধু উত্তরবঙ্গেই নয়, প্রকৃতপক্ষে এ সময় পুরো বাংলা অঞ্চলেই জনবসতির চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। তবে এ সময় সমগ্র বাংলা জুড়ে কোনো শক্তিশালী রাজ্য গড়ে ওঠেনি; বরং এ জনবসতিগুলো গৌড়, রাঢ়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদে বিভক্ত ছিল। মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে উৎখননে খুঁজে পাওয়া উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার থেকে জানা যায় এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল সেই সময়।[৩১] খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মৌর্যদের পতনের পর হিন্দু ধর্মাবলম্বী শুঙ্গ বংশ এ অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। মহাস্থান ও চন্দ্রকেতুগড়ে খুঁজে পাওয়া শুঙ্গদের বিভিন্ন পোড়ামাটির ফলকে হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির মিলনের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে শুঙ্গদের পতনের পর থেকে খ্রিস্টিয় চতুর্থ শতকে গুপ্তদের (৩২০-৫৪০ খ্রি.) আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত বাংলার স্থানীয় সামন্তদের মধ্যে আধিপত্যের লড়াই চলেছে। আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে গুপ্তরা সমগ্র বাংলার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। শক্তিশালী সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের অধিপতি গুপ্তরা সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিল, তাদের আমলে সংস্কৃত সাহিত্য,

---

[৩০] মহাস্থানগড়ের ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য, Md. Mosharraf Hossain, *Mahasthan: Anecdote to History*, Dhaka : Dibyaprakash, 2006 এবং *Mahasthan – the earliest city-site of Bangladesh*, published by the Department of Archaeology, Ministry of Cultural Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, 2003.

[৩১] DR Bhandarkar, 'Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan', *Epigraphia Indica*, vol. XXI, 83-91; আরো দেখুন, DC Sircar, 'Mahasthan Fragmentary Stone Plaque Inscription', *Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilisation*, vol. I, Calcutta, 1965.

নাটক, সঙ্গীত ইত্যাদির সঙ্গে বাংলায় চারুকলারও বিকাশ ঘটেছিল বলে জানা যায়।[৩২] খ্রিস্টিয় ষষ্ঠ শতকে গুপ্তদের পতনের পর বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম অংশে বঙ্গ ও গৌড় নামে দুটি পৃথক রাজ্য গড়ে ওঠে। সপ্তম শতকে শশাংক নামে একজন শক্তিশালী রাজার অধীনে বাংলায় প্রথম সত্যিকারের স্বাধীন রাজ্যের উন্মেষ ঘটে। শশাংকের পতনের পর কিছু সময় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে কাটলেও অষ্টম শতকে পাল বংশের উত্থানে বদলে যায় বাংলার ইতিহাস। পরবর্তী প্রায় পাঁচশত বছর ধরে বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী পালদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি করেছিল বাংলা। চারশ বছরেরও অধিক সময় বাংলা শাসন করা এ রাজবংশ শুধু বাংলায়ই নয়, ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সমগ্র ভারতবর্ষে এমনকি ভারতের বাইরেও খ্যাতি অর্জন করেছিল। পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের পুত্র ধর্মপালের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সোমপুর মহাবিহারকে (পাহাড়পুর নামে পরিচিত) এই খ্যাতির প্রামাণিক উদাহরণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। পালদের অবক্ষয়ের সুযোগে একাদশ শতকের পর থেকে বিশেষ করে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলায় দেব, চন্দ্র ও বর্মণ প্রভৃতি কয়েকটি ছোট ছোট রাজবংশ গড়ে ওঠে। কুমিল্লার ময়নামতিতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল বিশাল বৌদ্ধ বিহার। গুপ্ত যুগের অন্তিম পর্বের শিল্পরীতি অনুসরণ করে এ অঞ্চলকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল শিল্পকলাচর্চার কেন্দ্র।

পাল রাজাদের অবক্ষয়ের পর পূর্ব বাংলায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী সেন রাজ বংশের (১০৯৭-১২৫৬) উদ্ভব ঘটে। সেনরাও ছিলেন বহিরাগত, এসেছিলেন

---

[৩২] বাংলায় গুপ্ত শাসনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের জন্য দ্রষ্টব্য: আকসাদুল আলম, 'গুপ্ত যুগ', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, তৃতীয় খ-, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১১, পৃ. ৬৫-৬৭; Sayantani Pal, 'Gupta Rule in Bengal', *Proceedings of Indian History Congress, 69th Session,* Kolkata: Indian History Congress, 2009, pp. 79-85

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কর্নাটক থেকে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরা বাংলায় সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। কবি জয়দেবের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *গীত গোবিন্দম* এই সময়ের রচনা, যা এ অঞ্চলের মানুষের সাংস্কৃতিক উন্নয়নে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৩৩] বঙ্গে যখন সেনদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ঠিক সেই সময়েই উত্তর ভারতে আগমন ঘটে তুর্কি বংশোদ্ভুত মুসলিমদের। ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে লক্ষণ সেনের 'রাজধানী' নদীয়া দখল করে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা ঘটান। তাঁর কর্তৃত্ব অবশ্য কেবলই উত্তর-পশ্চিম বাংলায় সীমিত ছিল, পূর্ব বাংলা আরো প্রায় অর্ধ শতাব্দী সেনদেরই দখলে ছিল। শুরুতে বাংলার মুসলিম শাসকরা দিল্লী সালতানাতের প্রতিনিধি হিসেবেই বাংলা শাসন করতেন, যদিও বাংলার সঙ্গে দিল্লীর সম্পর্কে সব সময়ই একটি টানাপোড়েন ছিল। অবশেষে চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝিতে দিল্লীর অধীনতামুক্ত হয়ে বাংলায় স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৩৩৮ সালে সোনারগাঁওয়ে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে শুরু করে ১৫৩৮ সালে হোসেনশাহী বংশের পতন পর্যন্ত বাংলা একাদিক্রমে স্বাধীন সালতানাত হিসেবে টিকে ছিল। এরপরও ১৫৭৬ সালে মুঘলদের বাংলা অভিযানের আগে পর্যন্ত বাংলা এক রকম স্বাধীনই ছিল। আর ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘলরা বাংলার পশ্চিমাংশ দখল করতে সমর্থ হলেও পূর্ব বাংলার স্থানীয় জমিদাররা তাদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে গেছেন সতেরো শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত।

তুর্কি মুসলিমদের আগমণ বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। বাংলার মুসলিম শাসক গোষ্ঠী এবং তাদের সঙ্গে

[৩৩] ফয়েজুল আজিম, *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ঔপনিবেশিক প্রভাব*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ৪।

আসা সামরিক-বেসামরিক অভিজাতদের দল বাংলাতেই বসতি স্থাপন করে বাংলাকে নিজেদের দেশ হিসেবে গ্রহণ করেছিল; তবে তাঁদের চেয়েও বড় ভূমিকা পালন করেছিলেন সম্ভবত ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে এ দেশে আগমনকারী মুসলিম সুফি-সাধকবৃন্দ। তাঁদের প্রচেষ্টায় সমগ্র বাংলা অঞ্চলেই ইসলাম ধর্মের বিকাশ ঘটে, আর এই ধর্মের প্রভাবে এ অঞ্চলে বিকশিত হয় ইসলামী স্থাপত্য রীতি। বিশ্বের অন্যান্য এলাকার তো বটেই, এমনকি ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম স্থাপত্যের চেয়েও কিন্তু বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের একটি পৃথক, স্বতন্ত্র সত্ত্বা গড়ে উঠেছিল। ইসলামী ভাবনার সঙ্গে স্থানীয় নির্মাণশৈলী, উপকরণ ও বিশেষ করে অলঙ্করণের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র এ স্থাপত্যরীতিকে বাংলা স্টাইল হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার আগে বাংলার রাজভাষা ছিল সংস্কৃত, লেখাপড়ার মাধ্যমও তা-ই। তবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর প্রশাসনিক ভাষা হিসেবে ফারসির প্রচলন ঘটে। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এই সময়েই ভাষা হিসেবে বাংলার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়েছিল, এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল মুসলিমদের পৃষ্ঠপোষকতায়ই। ইলিয়াস শাহী এবং বিশেষ করে হোসেনশাহী সুলতানরা সংস্কৃত এবং বাংলা ভাষারও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। হোসেনশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে শ্রী চৈতন্য দেব নামে একজন ধর্ম সংস্কারকের আবির্ভাবও বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ঠিক আগে বাংলা জুড়ে প্রচলিত কৌলিন্য প্রথা ও জাত-পাতের ধারণার বিপরীতে শ্রীচৈতন্যের প্রেম ও সাম্যের বাণী অনেকটাই মুসলিম সুফি-সাধকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল বলে ধারণা করা হয়।

বাংলার সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের যে ধারার সূত্রপাত ঘটেছিল, মুঘল আমলেও সেটা অব্যাহত ছিল। বারো ভুঁইয়াদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

হয়েছিল বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে, ১৬১০-১২ সালের মধ্যে। তার আগেই জাহাঙ্গীরের পিতা, বাদশাহ আকবরের সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন মুঘলদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি বিকশিত হয়েছিল। তবে মুঘলরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে শিল্প ও সংস্কৃতি চর্চা, বিশেষ করে স্থাপত্য নির্মাণে যেমন তৎপরতা দেখিয়েছে, নানা কারণে বাংলায় সেই ধারাটি খানিকটা অনুজ্জ্বল ছিল। আর সে কারণেই সুলতানী আমলের তুলনায় মুঘল আমলে বাংলায় বিশেষ করে স্থাপত্যচর্চার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ধারণার বিকাশ খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না। মুঘল বাদশাহ হুমায়ুন বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের প্রেমে পড়েছিলেন বলে কথিত আছে; কিন্তু বাংলার আবহাওয়া মুঘল রাজ-পরিবারের সদস্যদের আর কাউকেই কখনো সেভাবে আকর্ষণ করেনি। শুধু স্থাপত্য নয়, চিত্রকলাসহ শিল্পকলার সকল ক্ষেত্রেই মুঘলদের পৃষ্ঠপোষকতার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া, কিন্তু মুঘল অভিজাতরা বাংলাকে সেভাবে আপন করে নেননি বলে এ অঞ্চলে সেই খ্যাতির সঙ্গে মানানসই উদাহরণ খুব একটা তৈরি হয়নি।

আঠারো শতকের গোড়ার দিকে মুর্শিদ কুলি খানের নেতৃত্বে বাংলায় নবাবী শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আবার পরিস্থিতি বদলে যায়। মুর্শিদাবাদের নবাবরা তাদের রাজধানীকে মুঘল রাজধানীরই প্রতিচ্ছবি হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। ঠিক এই সময়ে নানা কারণে দিল্লির মুঘল দরবারের শিল্পীরা পৃষ্ঠপোষকতা হারাতে শুরু করেছিলেন। এদের অনেকেই বাংলায় এসে মুর্শিদাবাদের নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং তাদেরই হাত ধরে শুরু হয় বাংলার চিত্রকলার এক নতুন যুগ। পরের দুই শতাব্দী ধরে রাজনৈতিক পালাবদলের সূত্র ধরে বদলে যাওয়া পৃষ্ঠপোষকদের অভিরুচি বাংলার চিত্রকলায় যে উত্থান-পতনের ধারা সূচনা করেছিল, 'আধুনিক' বাংলা চিত্রকলার বিকাশ ঘটেছে তারই হাত ধরে।

পাল-পূর্ব যুগের চিত্রকলা

বাংলায় মানব সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া, পুরুলিয়া আর মেদিনীপুর জেলার কোন কোন স্থানে। এ অঞ্চলে প্রত্নপ্রস্তর (Paleolithic) যুগেই মানুষের বসতি ছিল বলে অনুমাণ করা হয়। ভারতের অন্যান্য অনেক অঞ্চলে এ ধরনের বসতির সঙ্গেই খুঁজে পাওয়া গেছে গুহাচিত্রের নিদর্শন; কিন্তু বাংলায় এখন পর্যন্ত সে রকম কোনো উল্লেখযোগ্য গুহাচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ রকম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শন ১৯৮২ সালে মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রামে 'লালজল' নামক স্থানে আবিস্কৃত নব্য-প্রস্তর যুগের ক্ষুদ্র একটি গুহার দেয়ালে আঁকা ছবি।[৩৪] এ গুহার পেছনের দেয়ালে কিছু অস্পষ্ট চিত্রকলার নিদর্শন আছে, নব্যপ্রস্তর (Neolithic) যুগের অন্যান্য গুহাচিত্রের মতোই এ ছবিগুলোর বিষয়বস্তু মূলত শিকার ও শিকারীদের জীবন– হাল্কা লালাভ রঙে আঁকা ষাড়ের ছবি *ভীমবেটকা* বা *আলতামিরা*র ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু আবহাওয়া ও অন্যান্য প্রাকৃতিক কারণে এ চিত্রগুলি অত্যন্ত ঝাপসা হয়ে গেছে। এই নিদর্শন থেকে আভাষ পাওয়া যায় বাংলায় প্রস্তর যুগেও শিল্পকলার চর্চা হতো, কিন্তু আবহাওয়াগত কারণেই সে সব নিদর্শন আজ আর খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। বাংলার বৃষ্টিপ্রবণ স্যাঁত-স্যাতে আবহাওয়ার পাশাপাশি আরেকটি বড় কারণ পাথরের দুষ্প্রাপ্যতা, যে কারণে এ অঞ্চলে স্থাপত্য নির্মাণ করা হতো ইটের

[৩৪] Manomay Ghosh, 'A note on the Animal remains from Neolithic Laljal cave, Debpahar, Binpur, Midnapore, West Bengal', in *Zoological Survey of India*, Volume 86, Part 3-4, December 1990, pp. 519-21.

সাহায্যে, তাতে অলঙ্করণ হিসেবে থাকতো পোড়ামাটির ফলকে আঁকা ছবি। দেয়াল চিত্রের বিকাশ সেভাবে ঘটেনি।

বাংলার মানুষের চিত্রাংকণ শৈলীর সর্বপ্রাচীন নিদর্শনগুলিও পোড়ামাটির ওপরেই করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গেরই বর্ধমান জেলার পাণ্ডুরাজার ঢিবি-তে এ অঞ্চলে মানব-সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন আবিস্কৃত হয়েছে।[৩৫] এখান থেকে আবিস্কৃত তৈজসপত্রসমূহ তাম্রপ্রস্তর (Chalcolithic) যুগে, হরপ্পা সভ্যতার সমগোত্রীয় মানব গোষ্ঠীর ব্যবহৃত বলে মনে করা হয়। এই ঢিবিতে অসংখ্য অলঙ্কৃত মৃৎপাত্রের টুকরা আবিস্কৃত হয়েছে। এ সব মৃৎপাত্রের গায়ে অংকিত নানা রকমের নকশাই বাংলার চিত্রশৈলীর প্রাচীনতম নিদর্শন। বিশেষ করে কালো রঙের কয়েকটি মৃৎপাত্রের গায়ে সাদা রঙে আঁকা রেখাচিত্রগুলি লক্ষ্যণীয়। এ রকম একটি মৃৎপাত্রের টুকরায় মাছ ধরার জালজাতীয় নকশার কিনারে একসারি মাছের রেখাচিত্র আঁকা হয়েছে, অন্য একটিতে দেখা যাচ্ছে একটি ময়ুরী সাপজাতীয় কোন একটি প্রাণীকে ঠোঁটে নিয়ে খাওয়ার চেষ্টা করছে। এছাড়াও এ সব মৃৎপাত্রে রয়েছে বিমূর্ত ও অর্ধবিমূর্ত নানা রকম নকশা।

বাংলার শিল্পকলার আদি নিদর্শন বলতে এই মৃৎপাত্র অলঙ্করণকেই বোঝানো হয়। মৃৎপাত্র অলংকরণের এই ধারাটি দারুণ বেগবান হয়ে উঠেছিল তাম্র-প্রস্তর যুগের শেষ দিকে। এ সময় মৃৎপাত্রে জ্যামিতিক নকশার প্রাধান্য দেখা যায়। নকশাগুলি মধ্যে ছিল নানা বৈশিষ্ট্যের সরল ও বক্ররেখা, জাল নকশা, ত্রিভুজ, স্বস্তিকা চিহ্ন এবং সূর্য কিংবা পাতার নকশা ইত্যাদি। এ সব চিত্রের অংকণ-শৈলীতে চিত্রকরের স্বতঃস্ফুর্ততা লক্ষ্য করা গেলেও, তুলনামূলক

---

[৩৫] P.C. Dasgupta, *Excavation at Pandu Rajar Dhibi,* Calcutta: Directorate of Archaeology, Bulletin No 2, 1964; S.C. Mukherjee, 'Trial Excavation at Pandu Rajar Dhibi 1985', *Pratnasamiksha, 1,* 1992, pp.11-15.

মানের বিচারে সমালোচকরা এগুলোকে সম-সাময়িককালের সিন্ধু অববাহিকার মৃৎপাত্র অলংকরণের সমতুল্য বিবেচনা করেন না।[৩৬] সিন্ধুর মৃৎপাত্রগুলির অলংকরণ অনেক বেশি সুশৃঙ্খল ও সুবিন্যস্ত। এ ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়- বাংলায় এ সময়ের মৃৎপাত্র অলঙ্করণের বিষয়বস্তু হিসেবে মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ সমসাময়িককালে অথবা তার আগে থেকেই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে, বিশেষ করে পশ্চিম ভারতে অলংকরণে মানুষের প্রতিকৃতি চিত্রায়নের প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রে প্রাপ্ত এ সব নিদর্শন থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রাগৈতিহাসিক যুগেই বাংলায় শিল্পকলাচর্চার বিকাশ ঘটেছিল এবং বাংলার শিল্পীরা চিত্রকলার চর্চাও করতেন। ঐতিহাসিক যুগে এ সম্পর্কে আরো জোরাল প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত বাৎসায়নের *কামসূত্র* গ্রন্থে যে ৬৪ প্রকার কলার উল্লেখ রয়েছে, তাঁর মধ্যে চিত্রকলাও অন্যতম।[৩৭] তারও আগে, বৈদিক যুগে রচিত রচিত সংস্কৃত সাহিত্য *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম*, *মালবিকাগ্নিমিত্রম*, *মুদ্রারাক্ষস* প্রভৃতি গ্রন্থেও চিত্রকলা সম্পর্কে ধারনা পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলায় ঐতিহ্য অনুসারে চিত্রকরদের পটিকার, পটিদার, পটুয়া বা পেটো ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।[৩৮] শকুন্তলার কাহিনীতে এই পটুয়াদের কথা উল্লেখ রয়েছে।[৩৯] অন্য দিকে বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ *দিব্যাবদান*-এর 'বীতাশোকাবদান' অংশে এক কাহিনী থেকে জানা যায়, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়

---

[৩৬] ফয়েজুল আজিম, 'চিত্রকলা', লালারুখ সেলিম (সম্পাদক), *চারু ও কারুকলা*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা সিরিজ ৮*, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৩।

[৩৭] Wendy Doniger, *Kamasutra* – Oxford World's Classics, Oxford: University Press, 2003, pp 9-10.

[৩৮] ফয়েজুল আজিম, 'চিত্রকলা', পৃ. ৩।

[৩৯] Romila Thapar, *Sakuntala: Texts, Readings, Histories,* New Delhi: Kali for Women, 1999, pp. 43.

শতকে বাংলায় চিত্রকলার প্রচলন ছিল ।[৪০] এ গ্রন্থ অনুযায়ী উত্তরবঙ্গের একটি প্রাচীন শহর পুন্ড্রবর্ধনের নির্গ্রন্থী উপাসকদের অঙ্কিত চিত্রে দেখা যায়, গৌতম বুদ্ধ নির্গ্রন্থ (গোসাল)-কে প্রণতি জানাচ্ছেন । এ ঔদ্ধত্যে মহারাজা অশোক ক্রুদ্ধ হয়ে শহরের আজীবিকদের সমূলে বিনাশ করেন । ঐতিহাসিক বিচারে এ কাহিনীর গুরুত্ব হয়তো তেমন কিছু নয়, কিন্তু এ থেকে একটি বিষয় নিশ্চিত অনুমান করা সম্ভব, খ্রিস্টের জন্মের অন্তত তিন শতাব্দী আগেই উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে চিত্রকলার চর্চা হতো ।

তবে মৌর্য-শুঙ্গ পর্বের আগের বাংলাদেশের ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এখনও পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আবিস্কৃত হয়নি । স্বাভাবিকভাবেই অনুমান করে নেয়া যায়, সমকালীন যুগের শিল্পকলা, বিশেষ করে চিত্রকলা চর্চার ইতিহাসও এখনও অস্পষ্ট । তবে ঐ সময়ের বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলকচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, আর সেগুলোর মাধ্যমে সমসাময়িক চিত্রকরদের শিল্পদক্ষতা সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায় । মহাস্থানগড় ও চন্দ্রকেতুগড়ে[৪১] পাওয়া শুঙ্গ যুগের ক্ষুদ্রাকৃতি টেরাকোটা ফলকচিত্রসমূহ এর উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে । মহাস্থানগড়ের নিকটবর্তী পলাশবাড়ি ও সরলপুরসহ কয়েকটি স্থান থেকে গুপ্তযুগের শেষদিকে তৈরি করা বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলকচিত্র পাওয়া গেছে ।[৪২]

---

[৪০] Robert A. Neil and Edward B. Cowell, *The Divyâvadâna: a collection of early Buddhist legends, now first edited from the Nepalese Sanskrit mss. in Cambridge and Paris*; Cambridge: University Press 1886, pp 419-429.

[৪১] চন্দ্রকেতুগড়ের টেরাকোটা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য, Enamul Haque, *Chandraketugarh : A Treasure House of Bengal Terracottas*, Dhaka, The International Centre for Study of Bengal Art, 2001 Ges Gourishankar De and Shubhradip De, *Chandraketugarh : A Lost Civilization* Kolkata, Sagnik Books, 2004.

[৪২] Gouriswar Bhattacharya, 'Trio of Prosperity: A Gupta Terracotta Plaque from Bangladesh', *South Asian Studies*, Vol. 12 , Issue. 1,1996.

আপাত দ্বিমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের পোড়ামাটির এ ফলকচিত্রগুলি স্থাপত্যিক অলংকরণের জন্য ব্যবহৃত হতো বলে এতে এক ধরণের স্বাভাবিক চিত্রধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। এসব ফলকচিত্রে পশুপাখি, মানব-মানবী, রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে কাল্পনিক গল্প গাথা রূপায়িত হয়েছিল। গুপ্তযুগের তুলনায় শুঙ্গ ফলকগুলিতে অলংকরণ বাহুল্য লক্ষণীয়। যেমন, শুঙ্গশিল্পী যেখানে অলংকার, কেশবিন্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেখানে গুপ্তশিল্পী বাহ্যিক অলংকরণের পরিবর্তে শারীরিক গঠন, অঙ্গ-ভঙ্গিমা এবং অভিব্যক্তির উপরেই জোর দিয়েছেন বেশি।[৪৩]

সুতরাং বলা যায়, পালপূর্ব যুগে বাংলায় প্রচলিত চিত্রমাধ্যমের পরিচয় পাওয়া না গেলেও উপরে বর্ণিত ফলকচিত্রগুলির মাধ্যমে এই সময়ে বাংলার চিত্রকলা সম্পর্কে অনুমান করা যায়। ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শিল্পকলার সাধারণ রীতি অনুসারে এ ধরনের শিল্পকীর্তিগুলোও খুব সম্ভব ছিল এক ধরনের 'সমবায়িক শিল্প', অর্থাৎ যৌথ শ্রমে নির্মিত শিল্পকলা, যেখানে চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও আনুষঙ্গিক শিল্পের শিল্পীদের মাঝে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই একই শিল্পী বিভিন্ন মাধ্যমের শিল্পী হিসেবে কাজ করতেন। তাই প্রাগৈতিহাসিক পর্বের এ সব পোড়ামাটির ফলকচিত্রগুলির কোন কোন শিল্পী হয়তো প্রচলিত চিত্রমাধ্যমেও কাজ করতেন, এমন অনুমান করা অযৌক্তিক হবে না।

পাল চিত্রকলা

প্রকৃতপক্ষে পাল আমলেই বাঙালির জাতিসত্ত্বার প্রথম বিকাশ ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে পাল রাজারা প্রায় চারশত বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা শাসন করেছেন। শুধু বাংলাতেই নয়, তাদের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ তাদেরকে সমগ্র পূর্ব-ভারতেই এক পরাক্রান্ত

[৪৩] অশোক ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫।

শাসকগোষ্ঠী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল। সুদীর্ঘ সময় ধরে ক্ষমতায় থাকার সূত্রে তারা এ অঞ্চলে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে এক অভাবনীয় উন্নতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। উপরের আলোচনা থেকে নিশ্চিত করেই বলা যায় যে, পাল আমলের পূর্বের কোনো চিত্রকলা এ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হয় নি। পাল আমলেই প্রথম ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্রকলারীতির ব্যবহার সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায়। সমগ্র পাল যুগেই এই রীতির চর্চা অব্যাহত ছিল, এমনকি পাল শাসনের অবসানের পরও এ রীতির প্রভাব ছিল। তাই বলা যায় পাল চিত্রকলাই বাংলার প্রাচীনতম চিত্রকলা।

পাল শাসকগণ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। আর সেই সূত্র ধরে পাল আমলে বৌদ্ধ ধর্মেরও বিবর্তন ঘটেছে, এতে ঢুকে পড়েছে তন্ত্রযান-বজ্রযান-কালচক্রযানের মতো নানা মতবাদ। পাল মিনিয়েচারগুলিতে এ সমস্ত ধর্মীয় বিশ্বাসেরই প্রকাশ ঘটেছে। পাল আমলের বিপুল সংখ্যক চিত্রালঙ্কৃত পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন স্থান থেকে আবিস্কৃত হয়েছে।[৪৪] এ থেকে পাল আমলে শিল্পের ব্যাপক প্রসার সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এ সময়ের তিনশতেরও অধিক চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া এর সাথে সেই সময়ের তৈরি তারিখ বিহীন পাণ্ডুলিপির চিত্র সংখ্যা যোগ করলে এ সংখ্যা আরও অনেক বৃদ্ধি পাবে।

পাণ্ডুলিপিসমূহ তালপাতায় লেখা ও চিত্রায়িত করা হয়েছে। তালপাতা ভঙ্গুর, এ কারণে অনেক পুথিচিত্র বর্তমানে জীর্ণ হয়ে পড়েছে। তুলনামূলক বিচারে দেখা যায় যে, পাল যুগের চিত্রালঙ্কৃত পাণ্ডুলিপিসমূহ উন্নতমানের তালপাতার (শ্রীতাড়) উপর অনুলিখিত ও চিত্রালঙ্কৃত করা হতো। তালপাতা বেশ পাতলা ও স্থিতিস্থাপক, তাই লেখার জন্য উপযুক্ত ও কম ভঙ্গুর। পুঁথি লেখার পূর্বে এ

[৪৪] এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দ্রষ্টব্য, সরসীকুমার সরস্বতী, *পালযুগের চিত্রকলা* এবং বর্তমান অভিসন্দর্ভ, পঞ্চম অধ্যায়, পৃ.

পাতা গোছা বেঁধে একমাস পানিতে ডুবিয়ে রাখা হতো এবং পরবর্তীকালে তা রোদে শুকিয়ে শঙ্খ দিয়ে ঘষে মসৃণ করে নেওয়া হতো। এরপর সুন্দর করে কেটে এবং বাঁধার জন্য ছিদ্র করার পর এ গুলিতে লেখা ও চিত্র অঙ্কন করা হতো। লিপিকর দৈর্ঘ্যের সমান্তরালে প্রতিটি পাতায় পাঁচ বা ছয় পংক্তি লিখতেন এবং প্রয়োজনীয় চিত্র অঙ্কনের জন্য জায়গা ছেড়ে দিতেন। প্রতিটি পাতায় সাধারণত ৬ সে.মি. ×৭ সে.মি. আয়তনের তিনটি চিত্র অঙ্কিত হতো এবং এগুলির মধ্যে একটি মাঝখানে ও অপর দুটি দুপাশে অঙ্কন করা হতো। তবে কোন কোন পুঁথিতে অঙ্কন করা হতো দুটি চিত্র।[৪৫]

পাণ্ডুলিপি চিত্রের অঙ্কনকৌশল খুব জটিল ছিল না।[৪৬] চিত্র অঙ্কনের জন্য সাধারণত পটভূমিটি একটি রং দিয়ে ভরে নেওয়া হতো, তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাতার উপর সরাসরি তুলির আঁচড়ে চিত্রাঙ্কন করা হতো। এরপর প্রতিকৃতিটি প্রয়োজনীয় রং দিয়ে ভরা হতো, রূপ ও গঠন অনুসারে রঙের ঘনত্বের তারতম্য করা হতো এবং উজ্জ্বল বর্ণের ছোয়ায় সম্পূর্ণ করা হতো রঙের কাজ। এরপর ভারতীয় চিত্রকলার রীতি অনুসারে একটি মাঝারি তুলি দিয়ে প্রথমে ভেতরকার রঙ এবং সর্বশেষে সরু তুলি দিয়ে লাল বা কালো রঙে প্রতিকৃতির গড়নের রেখা টানা হতো। চিত্রাঙ্কনে যে সমস্ত রঙ ব্যবহার করা হতো তা হলো হলুদ, চক সাদা, ইন্ডিগো নীল, প্রদীপের শিষের কালি, সিন্দুর এবং হলুদ ও নীলের মিশ্রণে সৃষ্ট সবুজ। বেশিরভাগ রঙই প্রয়োজনানুসারে সাদা মিশিয়ে হালকা করে নেয়া যেত। যেহেতু বৌদ্ধ দেব-দেবীই ছিল চিত্রাঙ্কনের প্রধান বিষয়বস্তু তাই চিত্রকর *সাধনমালা* ও অন্যান্য গ্রন্থে নির্দেশিত মূর্তিলক্ষণের নিয়মকানুন মেনে চলতেন। তবে দেবদেবীর চিত্রের চারপাশে খালি জায়গায় শিল্পীরা তাদের নান্দনিক অভিব্যক্তি ঘটাতেন

---

[৪৫] সরসীকুমার সরস্বতী, *পালযুগের চিত্রকলা*, পৃ. ১৯।

[৪৬] এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে *পঞ্চম অধ্যায়: চিত্ররীতি ও কৌশলের বিবর্তন*-এ। দ্রষ্টব্য, পৃ. .....

গাছপালা, স্থাপত্য এবং অন্যান্য চিত্রের মধ্যে । বেশির ভাগ দেবদেবীর চিত্রেই প্রাধান্য পেয়েছে হলুদ বা গাঢ় লাল রং । এছাড়া পটভূমির রং হিসেবেও হলুদ ও লাল ব্যবহার করা হয়েছে ।

তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারনাথের বিবরণী থেকে পাল চিত্রকলার রীতি চরিত্র সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায় । তাঁর মতে, পাল শাসক ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রি.) ও দেবপাল-এর (৮২১-৮৬১ খ্রি.) রাজত্বকালে শিল্পকলা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে ।[৪৭] এ দুজন শাসকের রাজত্বকালে বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গের দুজন শিল্পী ধীমান ও তাঁর পুত্র বিটপাল বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন । পাথর ও ধাতুর ভাস্কর্য গড়ায় এবং চিত্রাঙ্কনে তাঁরা ছিলেন খুবই খ্যাতিমান শিল্পী । কিন্তু শিল্পরীতির ক্ষেত্রে পিতা ও পুত্রের মধ্যে পার্থক্য ছিল । চিত্রকলার ক্ষেত্রে পিতা 'পূর্ব দেশীয় রীতি' এবং পুত্র 'মধ্যদেশীয় রীতি' (বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মধ্যদেশ হলো মগধ বা দক্ষিণ বিহার) অনুসরণ করেন । তারনাথের এ উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, পাল যুগে পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকলায় ছিল বরেন্দ্র ও মগধ অঞ্চলের দুটি পৃথক রীতি । তবে এ চিত্রকলার চরিত্র সঠিকভাবে বোঝার জন্য পাঁচ ও ছয় শতকে ধ্রুপদী চিত্রকলার উল্লেখ প্রয়োজন ।

ভারতীয় শিল্পকলার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে গুপ্ত সম্রাটদের (খ্রি. ৩২০-৬৭৫) এবং তাঁদের নিকটবর্তী সময়ে । এ সময়ে ভারতীয় প্রাচীরচিত্রের কৌশলগত উৎকর্ষ ও নান্দনিক শ্রেষ্ঠত্বের উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় অজন্তা, বাগ ও বাদামি প্রভৃতি গুহার দেয়ালে আঁকা ছবিকে । এ ধ্রুপদী চিত্রকলার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তার প্রবহমান নিরবচ্ছিন্ন ছন্দময় রেখা ও পরিপূর্ণভাবে

[৪৭] Cyrus Stearns, "Tāranātha," Treasury of Lives, accessed January 12, 2018, http://treasuryoflives.org/biographies/view/Taranata/2712 accessed on 12 June, 2012

বিকশিত সাবলীল শারীরিক গঠন ।[৪৮] শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যটি অর্জিত হয়েছে রঙের আলো-ছায়া ও রেখার সুনিপুণ ব্যবহারের মাধ্যমে । ধ্রুপদী যুগের ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় উপরোক্ত শিল্পাদর্শ অনুসরণ করা হয় এবং উভয় শিল্পই রেখার বিন্যাস ও নমনীয়তার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে । পাল যুগে শিল্পকলায় ধীমান ও বিটপাল ধ্রুপদী শিল্পকলাকেই পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন, একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে । তারনাথ উল্লেখ করেছেন যে, ধীমান ছিলেন 'নাগ' রীতির অনুসারী ।[৪৯] উত্তর ভারতের মথুরা ছিল নাগ উপাধিধারী রাজাদের একটি অন্যতম কেন্দ্র এবং এ মথুরা নগর ছিল ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পরীতির উৎসস্থল । পাল যুগে তৈরি মিনিয়েচারের ফিগারগুলিতে ছন্দময় রেখা ও পরিপূর্ণ শারীরিক গঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । প্রকৃতপক্ষে এই মিনিয়েচারগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এগুলিতে ধ্রুপদী শিল্পরীতির সকল বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে । এছাড়াও ইউরোপীয় মিনিয়েচারের সাথে এর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । পাল যুগের মিনিয়েচারের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে যে, সমসাময়িক পাথর ও ধাতুর তৈরি মূর্তির শিল্পরীতির অনুকরণে এগুলি আঁকা হয়েছিল ।

পাল মিনিয়েচারের ইতিহাস কয়েক শতাব্দী বিস্তৃত ছিল । স্বাভাবিক কারণেই এই দীর্ঘ পরিসরে এর শিল্পরীতি সব সময় এক রকম ছিল না । বিভিন্ন শতকে পাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কেন্দ্রে নির্মিত চিত্রকর্মের শিল্পশৈলীগত তুলনা করলে দুটি প্রধান ধারা লক্ষ্য করা যায় । দশ শতকের শেষ ও এগারো শতকের শুরুতে প্রথম মহীপাল (খ্রি. ৯৯৫-১০৪৫) ও নয়পালের (খ্রি.

---

[৪৮] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পৃ. ৪৯ ।

[৪৯] Lama Taranatha, *Taranatha's History of Buddhism in India*, translated into English by Alaka Chattopaddhaya, edited by Debiprasad Chattopaddhaya, New Delhi: Motilal Banarsidass Publ., 1990, pp 47-48.

১০৪৫-১০৫৮) রাজত্বকালে প্রস্তুতকৃত চিত্রাঙ্কিত পাণ্ডুলিপিগুলি একটি ধারায় অংকিত হয়েছিল। আর অন্য ধারাটি দেখা যায় এগারো শতকের শেষ থেকে বারো শতকের সমাপ্তি পর্যন্ত পাল শাসক রামপাল (খ্রি. ১০৮২-১১২৪) ও তাঁর উত্তরাধিকারীদের সময়ে চিত্রিত পাণ্ডুলিপিগুলোতে।

উল্লেখিত দুটি ধারার মধ্যে প্রথম ধারাটিতে মিনিয়েচারের বৈশিষ্ট্যের চেয়েও প্রবলভাবে দৃশ্যমান অজন্তার গুহাচিত্রের প্রভাব। ছবিগুলো পুঁথির পাতায় আঁকা হলেও রঙের ব্যবহার, মূর্তির শারীরিক গঠন বা ছন্দোময় প্রবহমান রেখার ব্যবহার অজন্তার দেয়াল চিত্রকেই মনে করিয়ে দেয়। অজন্তার মতো না হলেও পাল আমলে বাংলায়ও প্রাচীর চিত্র অংকিত হয়েছিল বলে এখন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে। নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মন্দিরে উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত প্রাচীর চিত্রের কিছু নিদর্শন থেকে একথা প্রমাণিত হয়েছে। দশ ও এগারো শতকের পুঁথিচিত্রের সঙ্গে এই দেয়ালচিত্রগুলোরও দারুণ মিল। বিষয়বস্তু এবং অংকন কৌশল উভয় ক্ষেত্রেই। তবে, দুটি ধারার তুলনা করলে বলা যায়, পুঁথিচিত্রের শিল্পীরাই নকশা অংকন ও রঙের ব্যবহারে বেশি দক্ষতার ছাপ রেখেছেন।

কালক্রমে এই দক্ষতা আরো বিকশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ের ছবিগুলোতে তাই দেখা যায় একই সঙ্গে দুটি পৃথক চিত্র মাধ্যমের নন্দনতাত্ত্বিক বিকাশ। পাল আমলে বাংলায় ভাস্কর্যশিল্পের ব্যাপক উন্নতি হয়েছিল। রামপাল ও তাঁর উত্তরাধিকারী গোবিন্দপালের সময়ের মিনিয়েচারগুলোতে যেন সমসাময়িককালের ভাস্কর্য, বিশেষ করে নারী মূর্তিগুলির ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকেই তুলির আঁচড়ে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ এগারো ও বারো শতকের প্রথমভাগে হরিবর্মণের রাজত্বকালে লালমাই অঞ্চলে দুটি পরিচিত পাণ্ডুলিপি তৈরি করা হয়েছিল। এ দুটির মধ্যে প্রথমটির কিছু অংশ ব্যক্তিগত সংগ্রহে এবং বাকি অংশ বরোদা

রাজ্য জাদুঘর ও চিত্রশালায় সংরক্ষিত আছে এবং এটি হরিবর্মণের অষ্টম রাজ্যাঙ্কে উৎসর্গ করা হয়েছিল। দ্বিতীয়টি রাজশাহীর বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে এবং এটিও হরিবর্মণের উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে অনুলিখিত। রাজশাহীরটি প্রচলিত *অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার* পাণ্ডুলিপি,[৫০] বরোদারটি *পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার*।[৫১]

উভয় পাণ্ডুলিপিতেই ৬ সেমি×৫.৫ সেমি আয়তনের চিত্র পাতার মধ্যস্থলে স্থান পেয়েছে। রাজশাহীর পাণ্ডুলিপিটির প্রথমে, মাঝে এবং সর্বশেষে মোট ছয়টি ছবি রয়েছে। পাতার এক পাশে পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিমের তিনজন তথাগত বুদ্ধ এবং অপর পৃষ্ঠায় প্রত্যেকের সঙ্গে সম্পৃক্ত বোধিসত্ত্ব বা বৌদ্ধ দেবী-প্রতিমার চিত্র রয়েছে। বরোদা পাণ্ডুলিপিতে সুস্পষ্ট মূর্তিতাত্ত্বিক ধারণা পাওয়া যায় না। বিহারে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলিতে বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, পূজার চিত্র সুবিন্যস্তভাবে স্থান পেয়েছে। মধ্যবর্তী মার্জিনে, যেখানে পুঁথি বাঁধার জন্য ছিদ্র রয়েছে, জ্যামিতিক মোটিফ দেখা যায়। বাইরের মার্জিনে রয়েছে স্তূপের প্রতিকৃতি।

হরিবর্মণের রাজত্বকালে তৈরি উপরোক্ত দুটি পাণ্ডুলিপির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে লন্ডন জাদুঘরে রক্ষিত অন্য একটি পাণ্ডুলিপির (আনু. ১১০০-১১২৫ খ্রিস্টাব্দে তৈরি) অনেক বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে। তাই অনুমান করা হয় এটিও বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কোন চিত্রশালায় অনুলিখিত ও চিত্রায়িত হয়েছিল। লন্ডন জাদুঘরে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিতে ৬৩টি পাতার মধ্যে ৫৩টিতে ছবি রয়েছে। প্রতিটি পাতায় মধ্যস্থানে একটি করে মূর্তি অঙ্কিত এবং পাতার

---

[৫০] Claudine Bautze-Picron, 'Buddhist Painting during the reign of Harivarmadeva (end of the 11th c.) in Southeast Bangladesh', *Journal of Bengal Art*, vol. 4, Dhaka: ICSBA, 1999, pp. 192-193.

[৫১] Jinah Kim, *Receptacle of the sacred : illustrated manuscripts and the Buddhist book cult in South Asia*, Berkeley : University of California Press, 2013, p. 57.

দুপ্রান্ত বরাবর স্তূপের উঁচু ভিতের উপর তিনখাঁজ বিশিষ্ট কুলুঙ্গির ভেতর দেবতার প্রতিকৃতি সম্বলিত মার্জিন অঙ্কন করা হয়েছে ।

উপরিউক্ত তিনটি পাণ্ডুলিপি একই রীতিতে চিত্রায়িত । সমান পটভূমির উপর মূর্তি অঙ্কিত এবং এতে উজ্জ্বল রং গাঢ় নীল অথবা লাল ব্যবহার করা হয়েছে । তবে এ ধরনের চিত্রকলায় সাদা রঙের ব্যবহার বেশি পরিলক্ষিত হয় । প্রতিকৃতির উন্মুক্ত চক্ষুসহ বড় মুখাবয়ব এবং প্রতিকৃতিটি একটি স্থাপত্যিক কাঠামোর উপর হয় দন্ডায়মান নতুবা উপবিষ্ট । মন্দির আকৃতির চালচিত্রের উভয় পাশে দুটি বৃহদাকার বৃক্ষ সুন্দরভাবে চিত্রায়িত । সমান পটভূমিতে অঙ্কিত রেখার মাধ্যমে চিত্রায়নই এ রীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য । এছাড়া ভক্তি প্রদর্শনের দৃশ্যও এ চিত্রসমূহে লক্ষ্য করা যায়, যা অন্য কোন শিল্পরীতিতে দেখা যায় না ।

উল্লেখিত পাণ্ডুলিপিসমূহের ছবিগুলোতে প্রতিমাকে মন্দিরের অভ্যন্তরে দন্ডায়মান অবস্থায় আঁকা হয়েছে । খ্রিস্টিয় বারো শতকে তৈরি মায়ানমারের পাগানের ফ্রেস্কো চিত্রের শিল্পশৈলীর সঙ্গে এ সব পাণ্ডুলিপির চিত্রশৈলীতে মিল রয়েছে । লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত পাণ্ডুলিপির একটি বোর্ডের চিত্রালঙ্করণে এ মিল লক্ষ্য করা যায় ।

উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গের কোনো বৌদ্ধ বিহারের উল্লেখ কোনো পাণ্ডুলিপিতে নেই । তাই পাণ্ডুলিপির ছবিগুলো কোন চিত্রশালায় অংকিত হয়েছিল তা শনাক্ত করার জন্য নির্ভর করতে হয় পাণ্ডুলিপিতে বিধৃত ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর কিংবা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার বা বিহারের শিল্পরীতির সঙ্গে পার্থক্যের বিবেচনায় । এভাবেই রাজা রামপালের সমসাময়িক পাণ্ডুয়া অঞ্চলের সোম নামে জনৈক ব্যক্তির উৎসর্গীকৃত পাণ্ডুলিপিটিকে সোমপুরের শিল্পকর্মশালায় তৈরি পাণ্ডুলিপি বলে শনাক্ত করা হয়ে থাকে ।

এগারো শতকের শেষ ও বারো শতকের প্রথমদিকে বিহারে অনুলিখিত ও চিত্রায়িত পাণ্ডুলিপিসমূহের শিল্পরীতি ও মূর্তিলক্ষণের সঙ্গে উত্তর বঙ্গের পাণ্ডুলিপির শিল্পরীতির মিল রয়েছে। এমনকি নেপালের পাণ্ডুলিপিসমূহের সঙ্গেও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলায় চিত্রায়িত পাণ্ডুলিপিসমূহে মন্দিরের প্রতিকৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, যার অভ্যন্তরে দাঁড়ানো অথবা উপবিষ্ট দেব-দেবীর প্রতিকৃতি। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাণ্ডুলিপিসমূহে এটি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এমনকি বারো শতকের প্রথম দিকে পূর্ব বিহার, উত্তরবঙ্গ এবং নেপালে তৈরি চিত্রিত কাষ্ঠফলকেও এ সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষণীয়। সবগুলি না হলেও এ চিত্রালঙ্কৃত পাণ্ডুলিপিসমূহ বিক্রমশীলা মহাবিহার বা বিহারের মুঙ্গের জেলার কোন বৌদ্ধ বিহারে তৈরি হয়েছিল। গঙ্গা অববাহিকায় বহুসংখ্যক প্রস্তর ভাস্কর্য আবিষ্কৃত হয়েছে, যেগুলির সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও মগধে আবিষ্কৃত ভাস্কর্যের শিল্পশৈলীর মিল রয়েছে।

লন্ডনে সংরক্ষিত সোম কর্তৃক উৎসর্গীকৃত পাণ্ডুলিপি ছাড়াও লস এঞ্জেলসে একজোড়া চিত্রালঙ্কৃত কাঠের ফলকের শিল্পশৈলী দেখে এদেরকে এ অঞ্চলের শিল্পকর্ম বলে চিহ্নিত করা যায়। কাঠের ফলকে স্থাপত্য নিদর্শনাদির পেছনে রয়েছে বৃক্ষের দৃশ্য এবং ছোট ফুল ছড়ানো অলঙ্করণ। যে শিল্পরীতিতে এ দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে তা বিহারে দেখা যায় না। তবে বিহারের অনেক বৈশিষ্ট্যই এগারো শতকের শেষ ও বারো শতকের উত্তরবঙ্গের ভাস্কর্য শিল্পরীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই চিত্রকলায় মূর্তি প্রতিকৃতির বহুল উপস্থিতি বেশি লক্ষণীয়। কোন কোন জায়গায় গ্রন্থের লিখনের বিপরীতমুখী হয়ে আছে মূর্তির দেহ। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলপিতে প্রতি দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়ই এরূপ ঘটেছে। এর ফলে যখন পাণ্ডুলিপিটি বন্ধ করা হয় তখন প্রতিটি পুরুষ মূর্তির বিপরীতে থাকে একটি নারীমূর্তি; মনে হয় যেন তারা আলিঙ্গনাবদ্ধ।

যদিও স্বল্পসংখ্যক চিত্রালঙ্কৃত পাণ্ডুলিপি বাংলায় অবস্থিত চিত্রশালায় অনুকৃত হয়েছিল বলে শনাক্ত করা যায়, তবু এসবে অঙ্কিত চিত্র থেকে উত্তর ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গের দুটি প্রধান চিত্রকর্মশালার শিল্পশৈলী ও মূর্তিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি ধারণা করা সম্ভব। এ অঞ্চলে পাওয়া প্রস্তর ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনা করে অজানা চিত্রালঙ্কৃত পাণ্ডুলিপি বা ছিন্নপত্রসমূহকে এসব চিত্রশালার সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

উপরে উল্লেখিত পাণ্ডুলিপির চিত্রসমূহে সূক্ষ্ম আঙুল, কৌণিক দেহাবয়ব, এবং চোখের অস্বাভাবিক চাহনি ইত্যাদি লক্ষ্মণসমূহ দেখা যায়। অশোক ভট্টাচার্যের মতে এ সকল লক্ষণ 'মধ্যযুগীয় চিত্ররীতি'র, যার প্রথম প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ইলোরা গুহার দেওয়ালচিত্রে এবং এর পূর্ণাঙ্গরূপ দেখা যায় বারো শতকে জৈন চিত্রায়িত পাণ্ডুলিপিতে।[৫২] পূর্ব ভারতে বারো শতক ও তেরো শতকে তৈরি কিছু তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ চিত্রে এই মধ্যযুগীয় চিত্ররীতির ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

পালযুগে অনুলিখিত ও চিত্রালঙ্কৃত বেশিরভাগ পাণ্ডুলিপিই মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ *অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা* অনুসরণে রচিত। এছাড়া অন্যান্য চিত্রিত পান্ডুলিপি হলো বজ্রযান বৌদ্ধ ধর্মীয় যেমন, *পঞ্চরক্ষা*, *কর-ব্যূহ*, *কালচক্রযানতন্ত্র*। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাণ্ডুলিপির বিষয়ের সঙ্গে চিত্রগুলির বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। পাণ্ডুলিপির বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে চিত্রসমূহ অংকিত হয় নি, কেবল শোভা বর্ধন করার উদ্দেশ্যেই এগুলো আঁকা হয়েছে। তাই এ সব ছবি গ্রন্থের চিত্ররূপায়ণ নয়, এগুলোকে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র শিল্পকর্ম হিসেবেই বিবেচনা করা যায়। সকল পাণ্ডুলিপিতেই চিত্রের বিষয়বস্তু ছিল গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর জীবনের বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা।

---

[৫২] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পৃ. ৪৯।

পাণ্ডুলিপিসমূহের 'দান-পুষ্পিকা' নামক উৎসর্গ শ্লোক থেকে জানা যায় এগুলো বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় ও তত্ত্বাবধানে তৈরি হতো- যাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে স্থবির, উপাসক বা ভিক্ষু বলে। এছাড়া কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে বৌদ্ধ অনুসারী সামন্ত নৃপতি বা রাজকর্মচারীর নামও উল্লেখ করা হয়েছে দাতা হিসেবে। পৃষ্ঠপোষকতার উদ্দেশ্য কেবল নিজের জন্য পুণ্যার্জন ছিল না, মাতা-পিতা, শিক্ষক ও গুরু সকলের জন্য পূণ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে এ পাণ্ডুলিপি তৈরি করানো হতো।

উপরোক্ত কারণ ছাড়াও এ চিত্রায়িত পাণ্ডুলিপি তৈরির মতো পুণ্য কাজের পেছনে কিছু গভীরতর প্রেরণা ছিল, যার ইঙ্গিত পাওয়া যায় *প্রজ্ঞাপারমিতা* গ্রন্থেই। গ্রন্থগুলিতে প্রচারিত ধর্মতত্ত্বে সম্যক জ্ঞান সকল মানুষ ও প্রাণীর জন্য তার যথাযথ প্রয়োগকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। এ উদার মানবতাবাদী চিন্তাধারার কারণেই বাংলায় বসবাসকারী সকল বৌদ্ধদের ধর্মানুষ্ঠানে এ গ্রন্থের পাঠ ও আবৃতি পুণ্যার্জনের অপরিহার্য অঙ্গ রূপে পরিগণিত হয়েছে। এ গ্রন্থের মাহাত্ম্য এত বেশি ছিল যে, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা এর পাণ্ডুলিপিকে পূজা করত। *অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা* গ্রন্থে চন্দন প্রলেপ ও ধূপকাঠি দিয়ে অর্চনার চিহ্ন পাওয়া যায়। তাছাড়া এ গ্রন্থে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করা মহাপুণ্যের কাজ। মালদা জেলার জগজ্জীবনপুরের বৌদ্ধ বিহারে সাম্প্রতিককালে একটি পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে।[৫৩] এতে দেখা যায়, একটি পা-ুলিপি, সম্ভবত *প্রজ্ঞাপারমিতা*, পদ্মের উপর রাখা আছে। এ থেকে মনে হয় এটি পূজনীয়। এ গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে তান্ত্রিক

[৫৩] অমল রায়, 'সম্প্রতি আবিস্কৃত বৌদ্ধ বিহার জগজ্জীবনপুর', *পুরাবৃত্ত*-১, কলকাতা, ১৪০৭ বাংলা সন। আরো দেখুন, Sudhin De, 'Excavations at Jagjivanpur - A Preliminary Report', *Pratna-Samiksha*, 2 and 3, Calcutta, 1993-94; Gautam Sengupta, 'A General's Act of Piety: A Newly Discovered Buddhist Monastery of Ancient Bengal', *Marg*, vol. 50, no. 4, 1999.

বৌদ্ধ দেবদেবীর ক্ষুদ্রাকৃতি রূপ। তাই মনে হয় যে, এ গ্রন্থ অত্যন্ত সম্মানিত স্থান অধিকার করেছিল।

আট থেকে বারো শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমতের একটি অন্যতম প্রধান ও শক্তিশালী কেন্দ্র ছিল বাংলা এবং এখান থেকেই এ মতবাদ বিভিন্ন দেশে, যেমন উত্তরে নেপাল ও তিব্বত এবং পূর্বে বার্মা ও থাইল্যান্ডে, বিস্তার লাভ করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাদের সঙ্গে চিত্রালঙ্কৃত পাণ্ডুলিপিসমূহ এ সমস্ত দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন, যার ফলে পাল রীতির চিত্রকলার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। বারো শতকের শেষের দিকে এবং তেরো শতকের শুরুতে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ব্রোঞ্জের ছোট বুদ্ধমূর্তি ও চিত্রসম্বলিত পাণ্ডুলিপিসহ এ সমস্ত পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে চলে গিয়েছিলেন। এর ফলে পরবর্তী শতকগুলিতে পাল শিল্পরীতি বিদেশের মাটিতে আরও পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়। তবে পাল মিনিয়েচারগুলির শিল্পরীতিকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে বিহার ও নেপালে তৈরি চিত্রালঙ্কৃত পাণ্ডুলিপিসমূহের শিল্পরীতিকে বিবেচনায় রাখতে হবে।

লোকায়ত চিত্রকলা ও পটচিত্ররীতি

পূর্বোল্লেখিত পাল যুগের চিত্রকলাকে প্রাচীন বাংলায় চিত্রচর্চার প্রাতিষ্ঠানিক রূপ হিসেবে দেখা যেতে পারে। বৌদ্ধ ভিক্ষু, কিংবা তাঁদের গুণমুগ্ধ অভিজাত ব্যক্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রশালা গড়ে তুলে এ পাণ্ডুলিপিগুলো চিত্রায়ন করা হয়েছিল। তবে এর বাইরেও বাংলায় চিত্রচর্চার একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারা বিদ্যমান ছিল। এ ধারাটি ছিল একান্তই লোকায়ত, সাধারণ মানুষের ছবি। স্বভাবতই এগুলোর নির্মাণ উপকরণ হতো তুলনামূলক নিম্নমানের, পুঁথিচিত্রসমূহ বিহারে যে বিশেষ যত্ন ও সম্মানের সঙ্গে সংরক্ষিত হতো এ সমস্ত চিত্র সেই সুবিধাও পেত না বলে প্রাচীন বাংলা থেকে লোকায়ত চিত্রের

তেমন কোনো নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে নানা সূত্র থেকে পাওয়া বর্ণনা থেকে অনুমান করে নেয়া যায়, সেই পুথিচিত্রের যুগ থেকে কিংবা হয়তো তারও আগে থেকে বিশেষ করে গ্রামবাংলায় পটচিত্রের ধারাও বিকশিত হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে গ্রামশিল্পী এবং রাজশিল্পী, এ দুই বর্গের কথা উল্লেখ করেছেন।[৫৪] পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উল্লেখ রয়েছে যে গ্রামশিল্পীরা পথের ধারে লোকজনকে হাতে আঁকা পটের সাহায্যে কংসবধ পালা দেখাচ্ছেন।[৫৫]

পট এঁকে তার সাহায্যে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষকে নানা রকম ধর্মকথা শোনাতেন বলে এই লোকশিল্পীদের পরিচয় ছিল পটুয়া নামে। ধর্মীয় আবেগ যুক্ত থাকলেও পটচিত্র ছিল মূলত শিল্পীদের জীবিকার মাধ্যম। এ ছাড়াও নানা ধর্মীয়-সামাজিক প্রয়োজনে বাংলার শিল্পীরা আলপনা, মনসাঘট, লক্ষ্মীর সরা, মঙ্গলঘট ইত্যাদি লৌকিক শিল্পকর্মের চর্চা করে আসছেন প্রাচীনকাল থেকেই। এ সব লৌকিক শিল্পকে সাধারণত কারুশিল্প হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। তবে মনে রাখা দরকার সখের হাঁড়ি, মনসাঘট, লক্ষ্মীর সরা ইত্যাদি কেবলই স্বকীয়তা-বিবর্জিত সাধারণ তৈজসপত্র নয়। মাটির তৈরী সাধারণ হাঁড়ির গায়ে রঙ-তুলি দিয়ে মাছ, পাতা কিংবা রেখা দিয়ে নকশা এঁকে শিল্পীতভাবে সাজানো হলে তবেই তা সখের হাঁড়ির মর্যাদা পায়; মনসাঘট বা লক্ষীর সরাও বাঙালি শিল্পীর তুলিতে হয়ে ওঠে অনন্য শিল্পকর্ম। মোটিফের ক্ষেত্রে অনুমাণযোগ্য কারণেই খুব একটা বৈচিত্র হয়তো নেই, কিন্তু তাই বলে এগুলির শিল্পসত্ত্বা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইউরোপের অনেক নামী

---

[54] *The Ashtadhyayi*, Translated into English by Srisa Chandra Vasu, Benaras: Sindhu Charan Bose, The Panini Office, 1897; Reprint, Charleston: Nabu Press, 2011. Vol. VI, Sloka 2.82

[৫৫] Surendranath Dasgupta, *The* Mahābhāsya *of Patañjali with annotation (Ahnikas I–IV),* Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 1991

শিল্পীরাও তো একই বিষয় নিয়ে ছবি এঁকেছেন, ভাস্কর্য তৈরি করেছেন নিজেদের মতো করে, তাই বলে সেগুলোকে পৌণপুনিকতার দোষে কারুশিল্প হিসেবে অবজ্ঞা করা হয় না। একই কথা খাটে নকশি পাটির বুননশিল্পের ক্ষেত্রে– এতে রঙ-বেরঙের বেত দিয়ে বুনন কৌশলে গাছ, পাখি, মসজিদ ইত্যাদির ছবি ফুটিয়ে তোলেন কারিগররা। এ সব ছবির শিল্পমূল্য অনস্বীকার্য।

এছাড়া প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে ধর্মীয় চেতনা থেকে অঙ্গে উল্কি আঁকতেন। সাধারণত এসব উল্কিতে থাকতো সূর্য, পাখি, সাপ ও বৃত্ত ইত্যাদি নকশা। বৈষ্ণবরা বাহুতে সূঁচ দিয়ে ছিদ্র করে আঁকতেন রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি। সূঁচ ফোটানো পর কেশুর্তিয়া নামে এক ধরনের পাতার রস লাগালে শরীরে নীলাভ রেখার সৃষ্টি হয়। এ অঞ্চলের উল্কি অংকনের করণ-কৌশল হয়তো খানিকটা ভিন্ন, তবে উল্কি একটি বিশ্বজনীন শিল্পমাধ্যম। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই এর প্রচলন আছে। এমনকি আধুনিক যুগের শিক্ষিত নারী-পুরুষরাও দেহের বিভিন্ন অঙ্গে উল্কি ধারণ করে। এক্ষেত্রে সৌন্দর্য ও সংস্কার দুই-ই কাজ করে।

বাংলার লৌকিক শিল্পকলা চর্চার আরেকটি দিক হলো প্রসাধন, বিশেষ করে নারীদের প্রসাধন। প্রাচীন ও মধ্যযুগে তো বটেই, এমনকি ব্রিটিশ আমলেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে কনের মুখ হলুদ ও চন্দনগুঁড়া দিয়ে চিত্রিত করা হতো। 'কনে-চন্দন' নামে পরিচিত এই প্রসাধনের সঙ্গে কপালে তিলক ফোঁটা দিয়ে কনে সাজানোর রীতির আসল উদ্দেশ্য ছিল কনের সৌন্দর্যবর্ধন। বিয়ের আগে কনের হাতে মেহেদি পরানোও একটি ঐতিহ্যবাহী রীতি। এছাড়া মুসলিম নারীরা সারা বছর হাতের তালুতে মেহেদি দিয়ে অলঙ্কৃত করে থাকেন। এক্ষেত্রে গাছ-পাতা ও রেখার

ডিজাইনের সঙ্গে একটি অতি পরিচিত অনুসঙ্গ হিসেবে থাকে কল্কা মোটিফ। বিশেষ করে বিয়ের সময় এর ব্যবহার হয় ব্যাপক ও বর্ণাঢ্য।

এ ধরনের আরেকটি জনপ্রিয় লোকচিত্র মাধ্যম হলো আলপনা। সংস্কৃত ভাষায় আলপনা বা আলিমপনা'র অর্থ আস্তর দিয়ে কোনো কিছু ঢেকে দেয়া। সাধারণত বিশেষ কোনো উপলক্ষে ঘরের মেঝেকে নকশায় অঙ্কিত করার রীতিই আলপনা নামে পরিচিত। সাধারণত ঐহ্যিক সুখ-সম্পদ ও আত্মীয়-স্বজনের মঙ্গল কামনা করে ছড়া বলে ও কাম্যবস্তুর আলপনা এঁকে দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়। হিন্দু নারীদের ব্রত এর আদি উৎস। লক্ষ্মীব্রত, সেঁজুতিব্রত, মাঘম-ল ব্রত, হরিচরণ ব্রত, বসুধারা ব্রত ইত্যাদি উপলক্ষে ছড়া ও কথা বলা এবং আলপনা আঁকার রীতি আছে। হিন্দু সমাজে অন্নপ্রাশন ও বিবাহ উপলক্ষেও আলপনা আঁকা হয়। আলপনা অঙ্কনের পেছনে যে মঙ্গলচিন্তা ও সৌন্দর্যচেতনা রয়েছে, তা মুসলিম সম্প্রদায়কেও আকৃষ্ট করেছে। তাই বাঙালি মুসলমানদের বিবাহ-অনুষ্ঠানেও এক সময় তা প্রচলিত হয়, এমনকি ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালির প্রায় সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অনুসঙ্গ হয়ে ওঠে আলপনা দিয়ে সাজানোর রীতি। এসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে আঁকা আলপনার বিষয়বস্তু ও নকশা আর ব্রত উপলক্ষে আঁকা আলপনার নকশা এক রকম নয়। ব্রত উপলক্ষে ব্রতের স্থান উঠান ছাড়াও ঘরের মেঝে, খুঁটি, দেওয়াল, দরজার পাল্লা, কুলা ইত্যাদিতেও আলপনা দেওয়া হয়। ব্রতের আসনপিঁড়িতে পদ্ম-শঙ্খ, অন্নপ্রাশনের আসনপিঁড়িতে ব্যঞ্জনের বাটি আর বিয়ের আসনপিঁড়িতে জোড় ফুল, ভ্রমর, পদ্ম ইত্যাদি মোটিফ থাকে। ব্রতের আলপনায় আভাস বা রূপক-প্রতীক দিয়ে বিষয়বস্তুকে বোঝাতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সেঁজুতি ব্রতের 'হাতে-পো কাঁখে-পো' আলপনাটি একটি বিমূর্ত নকশা; বহু সন্তানবতী নারীর প্রতিকৃতি কেবল রেখা দ্বারাই বোঝানো হয়। লক্ষ্মীব্রতে লক্ষ্মীদেবীর পা অনুরূপভাবে রেখাঙ্কিত মানবীয় পদচিহ্ন মাত্র,

অন্য কিছু নয় । সংক্ষেপে বলা যায়, ব্রতের আলপনায় বিষয়বস্তু থাকে নির্দিষ্ট, ধর্মীয় চেতনাই যার নিয়ামক ।

অন্য দিকে সামাজিক উৎসব উপলক্ষে অঙ্কিত আলপনায় নান্দনিক চেতনারই প্রতিফলন ঘটে । লতা-পাতা, ফুল-ফল ও জ্যামিতিক নকশা এসবের প্রধান চিত্রবস্তু । বর্তমানে যেমন একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে শহীদ মিনার চত্বরে, রাস্তায় ও প্রাচীরে আধুনিক শিল্পীদের দিয়ে আলপনা আঁকার রীতি প্রচলিত হয়েছে । এতে পদ্ম, চক্র এবং নানা প্রকার জ্যামিতিক ডিজাইন প্রাধান্য পায় । হিন্দু নারীদের ব্রতের অনুসঙ্গ হিসেবে যাত্রা শুরু হলেও এভাবে ধীরে ধীরে এর পালা বদল ঘটেছে, আর সেই পালাবদলের পালায় আলপনা হয়ে উঠেছে রীতিমতো শিল্পমাধ্যম ।

ব্রত উপলক্ষে যে আলপনা করা হতো, তার প্রধান উপকরণ চালের গুঁড়ির সাদা পিটালি । এ ছাড়া ঐতিহ্যবাহী আলপনার উপকরণ হিসেবে অনুষ্ঠানভেদে ইটের গুঁড়ি, কালো ছাই, গোবর-গোলা জল, সিন্দুর, হলুদ-বাটা ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়ে আসছে । ব্রতের আলপনা আঙুল বা কাঠি দিয়ে আঁকা হয় । তবে আধুনিককালে একুশে ফেব্রুয়ারি, পহেলা বৈশাখসহ বিভিন্ন জাতীয় ও সামাজিক উৎসব উপলক্ষে যে আলপনা আঁকা হয়, তাতে আধুনিক চিত্রকলার মতো রঙ-তুলির ব্যবহার করা হয় । তুলনামূলকভাবে এরূপ আলপনা দীর্ঘস্থায়ী হয় ।

আলপনার মতোই আরেকটি জনপ্রিয় লৌকিক মাধ্যম হলো ঘটচিত্র । এই ধরনের চিত্রেরও উৎস হিন্দু সমাজের পূজার আচার । মাটির তৈরী কলস জাতীয় পাত্র ঘট নামে পরিচিত । বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার অপরিহার্য অনুসঙ্গ এই ঘট । মঙ্গলঘট, মনসাঘট, নাগঘট, লক্ষ্মীর ঘট, কার্তিকের ভাঁড়, দক্ষিণরায়ের বারা ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের ঘটের প্রচলন রয়েছে । মঙ্গলঘটে পিটালি ও তেল-সিন্দুর দিয়ে আলপনা দেওয়া হয় । প্রতিমারূপী মনসার

মূর্তিযুক্ত ঘট ও সর্পরূপী মনসার পৃথক রীতির ঘট পাওয়া যায়। বাংলা একাডেমীর লোকশিল্প সংগ্রহে সর্পের ফণাযুক্ত একটি মনসাঘট আছে।[৫৬] আটটি নাগের ফণাযুক্ত ঘটকে 'অষ্টনাগ ঘট' বলে। সম্পদের দেবী লক্ষ্মীর প্রতিমা ও ধানছড়া অঙ্কিত ঘট 'লক্ষ্মীর ঘট' নামে অভিহিত।

তবে বাংলার লৌকিক চিত্রকলার সবচেয়ে বেগবান ও গুরুত্বপুর্ণ মাধ্যম হলো পটচিত্র। সংস্কৃত 'পট্ট' (কাপড়) শব্দ থেকে 'পট' শব্দের উৎপত্তি, আর এই পটে অঙ্কিত চিত্রই হচ্ছে পটচিত্র। প্রাচীন বাংলায় যখন কোন দরবারি শিল্পের ধারা গড়ে ওঠে নি তখন পটচিত্রই ছিল বাংলার গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক। আবহমান কাল ধরেই বাংলায় পটুয়াদের অস্তিত্ব আছে বলে জানা যায়, কিন্তু পটচিত্রের ধারায় অঙ্কিত ছবির প্রাচীনতম যে নিদর্শন সংরক্ষিত হয়েছে সেটি ১৪২১ শকাব্দ বা ১৪৯৯ সালের একটি বিষ্ণুপুরাণ পাণ্ডুলিপি, বর্তমানে কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত।[৫৭] পঞ্চদশ শতকেই মূলত বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত বিষয়বস্তুকে ঘিরে পটচিত্রের ধারা অত্যন্ত বেগবান হয়েছিল। পাল আমলের পর বাংলা চিত্রকলায় যে সাময়িক অবক্ষয়ের সূচনা ঘটেছিল, বলা যায় এর মধ্য দিয়ে সেটির অবসান ঘটেছিল।

পট প্রধানত দু প্রকার দীর্ঘ জড়ানো পট ও ক্ষুদ্রাকার চৌকা পট। জড়ানো পট ১৫-৩০ ফুট লম্বা ও ২-৩ ফুট চওড়া হয়। আর চৌকা পট হয় ছোট আকারের। কাপড়ের উপর কাদা, গোবর ও আঠার প্রলেপ দিয়ে প্রথমে জমিন তৈরি করা হয়। তারপর সেই জমিনে পটুয়ারা তুলি দিয়ে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করেন। পটে নানা ধরনের দেশজ রং ব্যবহৃত হয়। ইঁটের গুঁড়া, কাজল, লাল সিঁদুর, সাদা খড়ি, আলতা, কাঠ-কয়লা ইত্যাদিও রঙের কাজে ব্যবহার করা হয়। পটটিকে সাধারণত কয়েকটি অংশে ভাগ করে তার উপর লাল, নীল,

[৫৬] সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, তৃতীয় খ-, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০১১।

[৫৭] অশোক ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

হলুদ, গোলাপি, বাদামি, সাদা ও কালো রং লাগিয়ে ছবি আঁকা হয়। তুলি হিসেবে ব্যবহৃত হয় কঞ্চির ডগায় পশুর লোম বা পাখির পালক।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে আজও একটি বিশেষ চিত্রকর সম্প্রদায় এক আখ্যানধর্মী লোকচিত্রকলার পেশায় নিয়োজিত। পটুয়া নামে পরিচিত এ সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাস নিয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত রয়েছে। মধ্যযুগের হিন্দু জনসমাজ পেশার ভিত্তিতে বর্ণপ্রথা গড়ে উঠেছিল। বৃহদ্ধর্মপুরাণে বিশ্বরূপকার বিশ্বকর্মার নয় ছেলে সম্পর্কে উল্লেখ আছে। ঐ আখ্যান অনুযায়ী, নিচুজাতের এক রমণীর সঙ্গে বিশ্বকর্মার মিলনের ফলে ঐ নয় সন্তনের জন্ম হয়। ঐ নয় সন্তান তথা নবসায়কের নিয়তি নির্ধারিত হয় তাদেরকে গতর খাটিয়ে বেঁচে থাকতে হবে - এভাবে। পটচিত্রকরকে ঐ নয় সন্তানের কনিষ্ঠ সন্তান গণ্য করা হয়। আট সন্তান পেশাগত বা অন্যান্য উপায়ে সামাজিক পর্যায়ে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হলেও, নবম চিত্রকর সন্তানটি তাতে ব্যর্থ হওয়ায় তার জন্মকালের ললাটলিপির বোঝাই তাকে বয়ে চলতে হয়। চিত্রকরদের এ জনসমাজ সামাজিক পর্যায়ে তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য একযোগে ইসলাম গ্রহণ করে। তবে যেহেতু তারপরেও তাদের মধ্যে প্রতিমাপূজার রীতি থেকে যায় সে কারণে তারা মুসলিম জনসমাজের মূলধারায় সামাজিক পর্যায়ে গৃহীত বা স্বীকৃত হয় নি। আর তাই এ জনসমাজের লোকেরা তাদের দ্বৈত পরিচয় দিয়ে থাকে। নিজ সমাজের মধ্যে তারা তাদের মুসলিম নামে পরিচিত আবার তাদের হিন্দু গ্রাহকদের কাছে তাদের পরিচয় দেওয়া হয় হিন্দু নামেই। তবে তাদের নামের সাথে সাধারণ নাম : পটুয়া বা চিত্রকর -এ শব্দটি দেখেই তাদের পেশা ধরা যায়।

পটুয়াদের চিত্রকর্ম পটচিত্র অবশ্য বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়, তাদের বংশানুক্রমিক পেশা রক্ষার উপায়। এ শিল্পশৈলীর উত্তরাধিকার এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে বর্তায়। পটুয়া, পটিদার ও পট- এ সব নামে একজন চিত্রকর

সাধারণত পরিচিত। চিত্রকর একাধারে কবি, গায়ক ও চিত্রশিল্পী। চিত্রকর হিন্দু অতিকথার আখ্যান কাহিনীকে ছড়ার আকার দেয়। আর তাতে একটা নীতি শিক্ষার বিষয়ও থাকে। জড়ানো পটে ধারাবাহিক কয়েকটি কাঠামো বা ফ্রেমে আখ্যানকাহিনীর ধারাচিত্রগুলি আঁকে পটচিত্রকর। গ্রাহকের কাছে সে তার জড়ানো পটের ফ্রেমগুলি একের পর এক খুলে ধরে বর্ণনা করে যেতে থাকে। আর তার মাঝে যে নীতি শিক্ষার বিষয় তুলে ধরা হয় তাতে জীবনের নানা পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে শ্রোতারা সজাগ হয়ে ওঠে।

পটচিত্রের পরিকল্পনা ও শৈলীতে শিল্পকলার কোন উদ্ভাবনী প্রতিভার স্বাক্ষর রাখার আকুতি পরিদৃষ্ট হয় না। বংশানুক্রমে হস্তান্তরিত ও পূর্বপুরুষদের রেখে যাওয়া শৈলীর প্রশিক্ষণে ধরাবাঁধা কিছু ধারাবিন্যাস, রেখা, রং এবং ভাবভঙ্গিমার গতানুগতিক উত্তরাধিকার এ পটচিত্রকলা। এগুলির সবই শেখানো হয় পরের প্রজন্মকে। শৈলীগত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যে শৈলী আমরা পটচিত্রে লক্ষ করি, তাতে এক অনন্য আকৃতিগত সারল্য ও রঙের অপূর্ব সুসঙ্গতি নজরে পড়ে। পটচিত্র বাংলার লোকশিল্পকলার সকল ঐতিহ্যিক উৎকর্ষে বৈশিষ্ট্যমি-ত। এ শিল্পকলা সাংস্কৃতিক সমজাতীয়তায় ও মূর্তির সাথে নিবিড় সম্পর্কিত এক জনগোষ্ঠীর উদ্দেশে নিবেদিত। পটচিত্র সাধারণত কাগজ বা মাড়যুক্ত কাপড়ে আঁকা হয়। পটচিত্রে অঙ্কিত প্রতিকৃতিগুলো সাধারণত থ্রি কোয়ার্টার প্রোফাইলে আঁকা হয়। ছবির চরিত্রের হাতের তালু থাকে মুষ্টিবদ্ধ। চিত্রে দেহাবয়বের ভাবভঙ্গিতে গতিশীলতার প্রকাশ ঘটলেও মুখে সাধারণত কোনো অভিব্যক্তি থাকে না।

জড়ানো পটচিত্রে সাধারণত ধারাবাহিকভাবে কাহিনী বর্ণনের স্বার্থে অনেকগুলো কাঠামো বা ফ্রেমে বিভক্ত করে ছবি আঁকা হয়। এ সব ফ্রেমের সংখ্যা কখনো কখনো বিশটিরও বেশি হয়ে থাকে। আয়তাকার আরেক ধরনের জড়ানো পট পাওয়া যায়, সেগুলোতেও অনেক সংখ্যক ফ্রেম থাকে।

যমপট বা জাদুপট ও চক্ষুস্মান পট তৈরির সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়বস্তু জড়িত। এগুলি সাম্প্রতিক কোন ঘটনায় শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য আঁকা হয়। হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত নানা আখ্যানকাহিনী চিত্রিত করার জন্য চিত্রকরেরা লোকসাহিত্য উপাদানের সাহায্য নিয়ে থাকে। এসব ছবিতে মানুষ ও দেবতার প্রতিকৃতির সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়, তাদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যগুলির তফাৎ অবশ্য লক্ষ্য করা যায় তাদের মাথায় পরা মুকুট এবং দেবমূর্তিগুলোর বিশেষ পরিচায়ক চিহ্ন তথা তাদের দেহভঙ্গি ও হাতের আয়ুধসমূহ থেকে। তবে চিত্রের বিষয় বর্ণনে বাস্তব ও কল্পনার সীমানা মিলেমিশে একাকার হতে দেখা যায়। এধরনের লোকপ্রিয় অতিকথামূলক ধর্মীয় মূলভাবগুলির উদাহরণ হিসেবে মহিষাসূরমর্দিনী, কমলে কামিনী, বেহুলা-লখিন্দর, মনসা-চাঁদ সওদাগর, কৃষ্ণ-রাধা, চৈতন্যলীলা ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। মরং বুরু, মরা-হাজা, পিচলু বুড়ি ইত্যাদির কাহিনী সাঁওতাঁল সম্প্রদায়ের জন্য আঁকা হয়ে থাকে। আর মিশ্র শ্রেণির গ্রাহকদের জন্য পীর পট আঁকা হয়। এতে পীর যে সব অলৌকিক ঘটনা সম্ভব করেন তা আঁকা হয়। রাশিচক্র দেখিয়ে রাশিপট আঁকার বিষয়টিও জনপ্রিয়। যম, যাদু ও চক্ষুদান পটের মতো রাশিপট যাদুটোনা ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

আমাদের আলোচ্য সময়ের প্রেক্ষিতে এই পটচিত্রের ধারা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ, কেননা আঠারো-উনিশ শতকে কলকাতার কালীঘাটকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল পটচিত্রের একটি অত্যন্ত বেগবান ধারা। আলোচ্য সময়ের চিত্রকলায় দেশজ এবং ইউরোপীয় রীতির সংঘাত ও সংশ্লেষণের প্রক্রিয়ার এক অনবদ্য উদাহরণ এই পটচিত্র। ১১ ইঞ্চি × ৮ ইঞ্চি মাপের কাগজে দেবদেবীর মূর্তির পাশাপাশি সমকালীন সমাজের নানা দিক নিয়ে ব্যঙ্গচিত্রও আঁকতেন কালিঘাটের শিল্পীরা, কালী মন্দিরের তীর্থযাত্রীদের কাছে স্মারক হিসেবে তা বিক্রি করা হতো এক পয়সা থেকে চার পয়সায়। দামে যত সস্তাই হোক, এই

পটের মধ্য দিয়েই আধুনিকায়নের পর্বে বাংলা চিত্রকলায় যুক্ত হয়েছিল লৌকিক ধারার প্রভাব ।

পটের বিষয়বস্তু হয় সাধারণত ধর্মীয়, সামাজিক ও কাল্পনিক । পটুয়াদের তুলিতে মানুষের ভাবলোক ও আধ্যাত্মিক জীবন সহজ-সরলভাবে প্রতিফলিত হয় । বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অষ্টম শতাব্দী থেকে বুদ্ধদেবের জীবনী-সংক্রান্ত জাতকের গল্পসম্বলিত 'মস্করী' নামক পট প্রদর্শন করতেন । পরবর্তী সময়ে হিন্দুধর্ম ও পুরাণ হয় পটের প্রধান বিষয় । হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবী, যেমনঃ দুর্গা, কালী, মনসা, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, যম, চ-ী, দশ-অবতার প্রভৃতি; পৌরাণিক কাহিনী, যেমনঃ রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি, এমনকি কৈলাস, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ইত্যাদি পবিত্র স্থানসমূহও এতে মূর্ত হয়ে ওঠে । এছাড়া জাদু, গাজী এবং হিতোপদেশমূলক চিত্রপটও অঙ্কিত হতে দেখা যায় । হিন্দুধর্মের শিব-পার্বতীলীলা, মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, বৈষ্ণবধর্মের শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ইত্যাদি পটের আকর্ষণীয় বিষয় । রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, যেমনঃ রামের বনবাস, সীতাহরণ, রাবণবধ, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদিও পটে অঙ্কিত হয় ।

হিন্দু ধর্মভিত্তিক এ সব বিষয়বস্তুর পাশাপাশি সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্যও আলাদা এক ধরনের পটের বিকাশ ঘটে । এ সব পটের বিষয়বস্তু মুসলিম সুফি-সাধক বা সমরবিজেতাদের কাহিনী । 'গাজীর পট' নামে পরিচিত এই পটের একটি অতি পরিচিত বিষয়বস্তু ছিল গাজীকালু-চম্পাবতীর কাহিনী । এতে গাজীকে কখনও দেখা যায় সুন্দরবনের রাজার সঙ্গে লড়াই করতে; কখনও বাঘের পিঠে সমাসীন; কখনও মাথায় টুপি অথবা রাজমুকুট, পরনে রঙিন পাজামা কিংবা ধুতি, এক হাতে চামর বা ত্রিকোণ পতাকা এবং অন্য হাতে তলোয়ার বা মুষ্টিঘেরা জ্যোতি । গাজীর পটে মানিকপীর, মাদারপীর, সত্যপীর, কালু ফকির, বনবিবি প্রভৃতি সম্পর্কে নানা অলৌকিক ক্রিয়াকর্মের ছবিও প্রদর্শিত হয় । এরূপ ধর্মীয় বিশ্বাসের পাশাপাশি নানা

কৌতুক, রঙ্গরসসম্বলিত কাহিনী, ব্যঙ্গচিত্র এবং সামাজিক দুরবস্থার চিত্রও অঙ্কিত হয়। কখনও কখনও প্যাঁচা, বানর, গরু, বাঘ, সাপ, কুমির এবং গাছপালাও স্থান পায়। লোকধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ অনেক সময় পটুয়া এবং পটচিত্রকে ঝাড়ফুঁকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। অনেকে গৃহে পটচিত্র সংরক্ষণ করাকে কল্যাণ এবং দৈব-দুর্বিপাক থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বলেও মনে করে।

বারো-তেরো থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলার পটুয়ারা এ শিল্পকর্ম নির্মাণে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। বাংলাদেশের ঢাকা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও মেদিনীপুর ছিল এ শিল্পের প্রধান ক্ষেত্র। মানচিত্রের মতো জড়িয়ে একটি বাঁশের দ-ের মাথায় ঝুলিয়ে পটচিত্র প্রদর্শন করা হতো, সঙ্গে গানের সুরে বিষয়বস্তু বর্ণনা করতেন পটুয়ারা। পটচিত্রের সঙ্গে পটুয়া সঙ্গীতের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে; পটে যা অঙ্কিত হয়, গানের বাণীতে তাই বর্ণিত হয়। এ গান পাঁচালির ঢঙে গাওয়া হয়।

বাংলাদেশে এক সময় গাজীর পট খুবই জনপ্রিয় ছিল। মুন্সিগঞ্জের কাঠপট্টির সুধীর আচার্য ছিলেন একজন খ্যাতনামা পটুয়া। তিনি ১ ইঞ্চি×৮ ইঞ্চি আয়তনের গামছার ওপর ইটের গুঁড়া ও তেঁতুলের বিচির আঠায় তৈরি জমিনে লাল, কালো, হলুদ, সবুজ প্রভৃতি রঙে একটি বড় প্যানেলে বাঘের পিঠে গাজী এবং চব্বিশটি ছোট ছবির খোপ আঁকেন। এ সব ছবির মধ্যে মৃত্যুদূত বা যমবিষয়ক ছবির প্রাধান্য থাকায় এটিকে যমপটও বলা হয়। কলকাতার আশুতোষ মিউজিয়াম এবং গুরুসদয় দত্ত মিউজিয়ামে একাধিক গাজীর পট রক্ষিত আছে। তবে বাংলা চিত্রকলার আধুনিকায়ন, বিশেষ করে ছাপাই ছবির আবির্ভাবের পর থেকে পট চিত্রের জনপ্রিয়তা যেমন কমেছে, তেমনি ধীরে ধীরে পটুয়ারাও তাদের পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছেন।

সুলতানি আমলে চিত্রকলা চর্চা

একাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলার অধিকাংশ অঞ্চলই বৌদ্ধ পালরাজাদের হাত থেকে পৌরণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুগামী সেন ও বর্মণ রাজাদের অধিকারে চলে যায়। পাল রাজারা ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু। তাই তাঁদের শাসনকালে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য থাকলেও হিন্দু পৌরাণিক দেব-দেবীর মন্দির স্থাপন ও মূর্তি নির্মাণে কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। বরং নয়পাল (আ. ১০২৭-৪৩ খ্রি.) ও তৃতীয় বিগ্রহপালকে (আ. ১০৪৩-৭০ খ্রি.) দেখা যায় হিন্দু মন্দির প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করছেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্য থেকে আগত সেন ও বর্মণ রাজারা ছিলেন বেদ-ব্রাহ্মণ তথা বর্ণাশ্রম-আশ্রয়ী হিন্দু ধর্মের উদ্যমী পরিপোষক। তাঁদের আমলে বাংলার বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের যে নিগৃহীত হতে হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। এই প্রতিকূল পরিবেশে স্বাভাবিকভাবেই পাল-পুঁথিচিত্রের প্রবাহিত ধারাটি ক্ষীয়মান হয়ে পড়ে। তবে তা যে একেবারেই স্তব্ধ হয়ে যায়নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় লক্ষণ সেন (আ. ১১৭৯-১২০৬ খ্রি.) ও হরিবর্ম দেবের সময়ে লিখিত ও চিত্রিত পূর্বোক্ত বৌদ্ধ পুঁথিগুলিতে।

ত্রয়োদশ শতকের সূচনায় তুর্কি সেনানায়ক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার উদ্দিন খলজির বিজয় অভিযান বরং এই ধারায় আরো বড় প্রতিবন্ধকতার সূচনা করেছিল। বখতিয়ার সমগ্র বাংলা অধিকার করতে পারেননি, তবে পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের ওপর তিনি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে সেনদের বর্ণাশ্রম প্রথার কারণে সমকালীন বাংলায় যে সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছিল, বখতিয়ারের নেতৃত্বে তুর্কিদের বিজয় এবং এ দেশে ইসলাম ধর্মের প্রসারে তার একটা ভূমিকা ছিল। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে এই মত নিয়ে দ্বিতীয় চিন্তার

অবকাশ রয়েছে। বাংলায় বর্ণাশ্রম প্রথার তীব্রতা রাজধানী গৌড় ও তার আশ-পাশেই বেশি ছিল এবং তুর্কিরাও ওই অঞ্চলটিই আগে দখল করেছে। কিন্তু ধর্ম হিসেবে ইসলাম কখনোই বাংলার ওই অঞ্চলটিতে প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। বরং ক্ষমতার কেন্দ্রের বাইরে, বাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলেই ইসলামের বিকাশ ঘটেছে দ্রুত। তাছাড়া, প্রাপ্ত ঐতিহাসিক সূত্রগুলো নিশ্চিত করছে, তুর্কিদের আক্রমণের সামনে হিন্দু-বৌদ্ধ ভেদাভেদ ছিল না, তাঁদের হাতে হিন্দুদের মন্দির যেমন ধ্বংস হয়েছে তেমনি রেহাই পায়নি বৌদ্ধদের বিহারও। তবকাত-ই নাসিরির বর্ণনা থেকে জানা যায় বাংলা বিজয়ের অল্পকিছুকাল আগে বখতিয়ারের সৈন্যরা কীভাবে বিহারের ওদন্তপুরী বৌদ্ধ বিহার আক্রমণ করে সেখানে রক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলো ধ্বংস করেছিল।[৫৮] এভাবে তুর্কি আক্রমণে দক্ষিণ বিহার ও বাংলার বৌদ্ধ বিহারগুলি ধ্বংস হওয়ার ফলেই নিরাশ্রয় হয়ে পূর্ব ভারতের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা নেপাল ও তিব্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁদের হাত ধরে পূর্ব ভারতীয় শিল্পরীতিও বৌদ্ধপ্রধান দেশদুটিতে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছিল। এইভাবেই বাংলার রূপকলার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল নেপাল ও তিব্বতের ভাস্কর্য ও চিত্রকলা। তিব্বতের সঙ্গে বাংলার সম্পর্ক অবশ্য আরো পুরনো, পাল আমলেই অতীশ দীপঙ্করের মতো বৌদ্ধ ধর্মগুরুরা তিব্বতে মহাযান-বজ্রযান ধর্মব্রত প্রচার করেছিলেন।

বাংলায় মুসলি অধিকারের প্রথম একশত বছর বা তারচেয়ে কিছু বেশিকাল জুড়ে চলেছিল এই প্রাথমিক সংঘাত। আফগানিস্তান-তুর্কিস্তান থেকে আসা মুসলিম শাসকরা এ সময় একদিকে বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকায় তাদের রাজ্য সম্প্রসারণের চেষ্টা করে গেছেন, অন্য দিকে যুগপৎ তাদের আবার নজর

[৫৮] মিনহাজ-ই সিরাজ, *তবকাৎ-ই নাসিরি*, বাংলা অনুবাদ আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩। পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ২০১৪।

দিতে হয়েছে দিল্লীর সঙ্গে সম্পর্কের ওপর। কারণ, সরাসরি দিল্লীর তত্ত্বাবধানে বাংলায় মুসলিম বিজয় সম্পন্ন না হলেও দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম শাসনের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল দিল্লীই, তাই এ পুরো অঞ্চলটিকেই দিল্লীর সুলতানরা নিজেদের রাজ্যের অংশ বলে বিবেচনা করতেন। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না থাকায় এই সময়ে বাংলার মুসলিম শাসকরা শিল্পকলা চর্চার দিকে সেভাবে মনোযোগ দিতে পারেননি। ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় 'সারা দেশে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকাহ নির্মাণের' কথা উল্লেখ করা হলেও সে সব কোথায় নির্মিত হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি, প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বাংলায় বিদ্যমান মুসলিম স্থাপত্যের সর্বপ্রাচীন নিদর্শনটি তাই এ অঞ্চলে মুসলিম বিজয়ের প্রায় একশত বছর পরের। ত্রিবেণীতে অবস্থিত জাফর খান গাজীর সমাধি ও মসজিদটিও আবার রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নয়, নির্মিত হয়েছিল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়।

তবে চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় স্বাধীন সুলতানদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা ইতিহাসের এই গতি-প্রকৃতি অনেকটাই বদলে দেয়। শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-৫৭ খ্রি.) আমল থেকে বাংলার স্বাধীন সুলতানরা দেশ শাসনের ব্যাপারে স্থানীয় হিন্দুদের সঙ্গে এক রকম বোঝাপড়া করে নিজেদের শক্তিকে সংহত করতে উদ্যোগী হন। দিল্লীর সঙ্গে চলমান সামরিক লড়াইয়ে সাফল্যের সূত্র যে স্থানীয় যুদ্ধকৌশল ও ভৌগলিক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ, সেটা বুঝতে পেরেই তারা এমনটা করেছিলেন মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। এর ফলে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে তো বটেই, আঞ্চলিক সংস্কৃতির বাহক হিসেবেও বাংলার বৈশিষ্ট্য সর্ব ভারতীয় স্বীকৃতি অর্জন করে। বাংলার সুলতানেরা ইসলামে পূর্ণবিশ্বাসী থেকেও বাংলার দেশজ সংস্কৃতির প্রতি যে বিশেষ যত্নবান ছিলেন তা জানা যায় রামায়ণ, মহাভারত প্রমুখ মহান সংস্কৃত

গ্রন্থগুলির বাংলা অনুবাদে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে। এই পৃষ্ঠপোষকতা ইলিয়াস শাহী শাসনকালে শুরু হয়েছিল, তবে তার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটে হোসেন শাহী (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রি.) শাসনকালে। আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) নিজে চৈতন্যদেবের গুণগ্রাহী ছিলেন, অন্যদিকে চৈতন্যদেবও তাঁকে সুশাসন হিসাবে সম্মান প্রদর্শনে ছিলেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে, দেশের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধির ফলে, সাংস্কৃতিক বিকাশ এমন এক স্তরে পৌঁছেছিল যার তুলনা চলে কেবলমাত্র পাল শাসনকালের সঙ্গেই। সুলতানি আমলে বাংলার স্থাপত্যকর্মগুলি একদিকে যেমন সমকালীন উত্তর ভারতীয় সুলতানি স্থাপত্যের প্রভাব প্রদর্শন করে, অন্যদিকে সেগুলি বিশেষভাবে বাঙালির সৃজনশীলতার সাক্ষ্যও বহন করে। দেশজ সংস্কৃতির প্রতি এই আগ্রহের পাশাপাশি সুলতানরা মুসলিম দুনিয়ার সংস্কৃতির প্রতিও সমান আগ্রহী ছিলেন। রাজ দরবারের ভাষা ছিল ফারসি, ইলিয়াস শাহী সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.) পারস্যের কবি হাফিজের সঙ্গে পত্রবিনিময় করে ফারসি ভাষায় তাঁর নিজের লেখা অসম্পূর্ণ গজল সম্পূর্ণ করে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। মা হুয়ানের বর্ণনা থেকেও জানা যায় পঞ্চদশ শতকে বাংলার সরকারি ভাষা ছিল ফারসি। স্বয়ং সুলতানের ফারসি কাব্যচর্চা নিশ্চিত করছে, এ সময় বাংলায় ফারসিতে সাহিত্য চর্চা হতো। তবে ইলিয়াসশাহী আমলের এমন কোনো পাণ্ডুলিপি এখনো আবিস্কৃত হয়নি যার সূত্র ধরে নিশ্চিত করা যায় এ সময় বাংলায় পাণ্ডুলিপিভিত্তিক চিত্রকলার প্রচলন ছিল। কিন্তু হোসেনশাহী আমলে চিত্রিত অন্তত একটি পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাওয়া যাওয়ায় এখন নিশ্চিত করেই বলা যায়, সুলতানি আমলে বাংলায় পাণ্ডুলিপিভিত্তিক চিত্রকলার চর্চা হতো। হোসেন শাহের পুত্র নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২ খ্রি.) বাংলার দরবারে পারস্যের চিত্ররীতিতে পাণ্ডুলিপি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন।

তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে মুসলমান শাসনের প্রারম্ভিককালে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বাংলার মূর্তি ও চিত্রকলার অনুশীলন স্তম্ভিত হয়ে পড়েছিল। চিত্রশিল্পের কিছু অবশেষ অবশ্য গ্রামীণ লোকচিত্রের স্তরে গ্রামের সাধারণ মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় রক্ষিত হয়েছিল। কেননা পরবর্তীকালের গ্রামবাংলার পটচিত্রে প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের চিত্রকলার রেশ সহজেই চোখে পড়ে। এসময় বাংলার শিল্পীরা যে সকলেই কর্মহীন হয়ে পড়েছিলেন, তা হয়তো নয়। কেননা নতুন শাসকবর্গ তাঁদের নিজস্ব উদ্যমে এই সময় থেকেই নতুন এক রীতির স্থাপত্যকর্মের সূত্রপাত করেন, গৌড়ের মসজিদ ও সমাধিসৌধগুলিতে আজও যার পরিচয় পাওয়া যায়। মূলত পোড়ামাটির ইট ও টালিতে তৈরি এই স্থাপত্যকর্মগুলি নির্মিত হয়েছিল এ দেশেরই কারিগরদের হাতে। টালি ও ইটের নকশায় যে জ্যামিতিক ও লতাপুষ্পের অলংকরণ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি পশ্চিম এশিয়ার আরবীয় ও ভারতীয় নকশার সমন্বয়েই পরিকল্পিত। এই অলঙ্করণের মধ্য দিয়েই সমকালীন শিল্পীদের রূপভাবনা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। এগুলির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো এই, যে এতে প্রতিকৃতির রূপায়ণ প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ, রক্ষণশীল ইসলামি মতবাদ অনুসারে মানুষ ও পশুপাখির রূপায়ন নিষিদ্ধ।

চতুর্দশ শতকের শেষদিকে দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়লে ভারতজুড়ে তৈরি হয় এক ভিন্ন রকম রাজনৈতিক পরিস্থিতি। বিশেষত শেষ ক্ষমতাশালী তুঘলক সম্রাট ফিরোজ শাহের মৃত্যু (১৩৮৮ খ্রি.) এবং তৈমুরের উত্তর ভারত আক্রমণ ও দিল্লি লুণ্ঠন (১৩৯৮ খ্রি.) এ পরিস্থিতিকে ত্বরান্বিত করেছিল। দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন সালতানাতের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আরো আগেই, এই সময়ে উত্তর ভারতের গুজরাট, মালব ও জৌনপুরের সুলতানরাও স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলায় স্বাধীন সালতানাতের প্রতিষ্ঠাও ঘটেছিল এই

সময়েই, একই প্রেক্ষাপটে। ভারতের চিত্রকলার ইতিহাসে এইসব প্রাদেশিক সুলতানদের বিশেষ অবদান স্বীকৃত হয়েছে। পূর্ব ভারতের বৌদ্ধ ও পশ্চিম ভারতের জৈন পুঁথিচিত্রের ঐতিহ্য ক্ষীণকায়া হয়ে যাওয়ার পর এই সুলতানদের দরবারেই নতুন এক ধারার অণুচিত্র বা মিনিয়েচারের অনুশীলন শুরু হয়। নতুন এই চিত্ররীতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া থেকে আগত মুসলিম শাসক ও তাঁদের সহকর্মীবৃন্দ, স্বভাবতই তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন তাঁদের পূর্ব-পুরুষের দেশ পারস্য বা ইরানে ইতিপূর্বেই বিকশিত অত্যন্ত সমৃদ্ধ পাণ্ডুলিপিভিত্তিক মিনিয়েচার চিত্রকলার অনুরণন। নুসরত শাহের দরবারে এই সমৃদ্ধ পারসিক চিত্রশিল্পের ধারা এসে পৌঁছেছিল। তাঁর আগে বা পরে আর কোনো সুলতান বাংলার দরবারে পারসিক চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায় না। কিন্তু চীনা পরিব্রাজক মা হুয়ান লিখে গেছেন যে তিনি বাংলার নানা শহরে পেশাদারি শিল্পীদের দেখেছেন।[৫৯] এইসব শিল্পীদের মধ্যে পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার শিল্পীদের উপস্থিতি থেকে থাকতেই পারে, যদিও এ সম্পর্কে সম-সাময়িক কোনো সূত্র থেকে নিশ্চিত করে বলার মতো কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।

নুসরত শাহের দরবারে যে পাণ্ডুলিপিটি চিত্রায়িত হয়েছিল, সেটি হলো *ইস্কান্দারনামা* বা আলেকজান্ডারের কাহিনীভুক্ত *শরফনামা*। গৌড়ের সুলতান নুসরত শাহের জন্য ১৫৩১-৩২ খ্রিস্টাব্দে জনৈক হামিদ খান এই পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুত করেছিলেন। বর্তমানে এই দুর্লভ পাণ্ডুলিপিটি রক্ষিত আছে লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে। সমকালীন মালবে অংকিত *নিমতনামা*'র ছবিগুলির সঙ্গে তুলনা করলে ইস্কান্দারনামা'র ছবিগুলো উৎকৃষ্টতর বলে প্রতীয়মান হয়।

---

[৫৯] মা হুয়ানের বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য, *Ying-yai Sheng-lan, The Overall Survey of the Ocean's Shores 1433 by Ma Huan*, translated by J.V.G. Mills, with foreword and preface, London: Hakluyt Society, 1970; reprint, London: White Lotus Press 1997.

রূপবিন্যাস থেকে শুরু করে মানুষের অবয়ব রচনায় *ইস্কান্দারনামা*'র ছবিকে পারসিক চিত্রকলার এক সুপরিণত ঐতিহ্যেরই অনুগামী বলে মনে হয়। আগে-পরে আর কোনো চিত্রিত পাণ্ডুলিপি পাওয়া না গেলেও তাই অনুমান করা যায়, বাংলায় পারসিক ধাঁচের পাণ্ডুলিপি চিত্রকলার চর্চা ছিল।

পাণ্ডুলিপির প্রতি, বিশেষ করে চিত্রায়িত পাণ্ডুলিপির প্রতি মুসলিমদের আকর্ষণ সর্বজন বিদিত। প্রতিকৃতি চিত্রায়নের ব্যাপারে শুরুর দিতে খানিকটা রক্ষণশীলতা দেখা গেলেও খ্যাতিমান লিপিকার বা ক্যালিগ্রাফারকে কোরান-এর একটি পাতা লেখার জন্য বিপুল পরিমাণ পারিশ্রমিক দেওয়া হতো সেই আব্বাসীয় আমল থেকেই। এরই সূত্র ধরে কালক্রমে আরবি হরফের নানান রূপান্তর ঘটতে থাকে এবং সেই হরফ আলংকারিক চরিত্র অর্জন করে। প্রথম প্রথম ক্যালিগ্রাফির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আরবীয় লতাপুষ্পের নকশা দিয়ে সজ্জিত করা হত পাণ্ডুলিপির পাতা। ধীরে ধীরে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু এবং ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এমন গ্রন্থে চিত্ররূপায়ণের পালা শুরু হয়। তবে যেহেতু ইসলামি বিশ্বাসে প্রতিকৃতি চিত্রায়নের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা রক্ষণশীল, তাই ছবিতে বাস্তবতার রূপায়ণ নয়, বরং মুসলিম শিল্পীরা এক আদর্শায়িত কল্পনার জগতকে চিত্রায়িত করতেন। সে জগতের মানুষ, পশুপাখি, গাছপালা সবই সুন্দর, কিন্তু তারা যেন ভিন্ন কোনো এক কল্পলোকের বাসিন্দা। এভাবে এক সময় উজ্জ্বল রঙে আঁকা ছবি হয়ে ওঠে পারসিক পাণ্ডুলিপির অবিচ্ছেদ্য অংশ। দক্ষ লিপিকর ও নিপুণ শিল্পীর দ্বারা লিখিত ও সজ্জিত এইসব মূল্যবান গ্রন্থের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ধনী ও রুচিসম্মত অভিজাত মুসলমানেরা। প্রাচীনকাল থেকেই শিল্পকলায় পারস্যের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিল, সেই সঙ্গে বাইজ্যান্টাইন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সিরিয়া-ফিলিস্তিন এলাকা দখল করার পর সেখানকার শিল্পকলার বর্ণাঢ্য ঐতিহ্যও আকৃষ্ট করেছিল মুসলিম চিত্রকরদের। পাণ্ডুলিপিভিত্তিক চিত্রকলার চর্চা শুরু

হয়েছিল এই বাইজ্যান্টাইনদের অনুকরণেই। আব্বাসীয় আমলে বাগদাদ বা এর আশে-পাশের নানা শহরে গড়ে ওঠা শিল্পচর্চা কেন্দ্রগুলিতে চিত্রিত পাণ্ডুলিপিসমূহে অনেক ক্ষেত্রে মূল বাইজ্যান্টাইন পাণ্ডুলিপির ছবিগুলোর অনুকৃতি করা হতো তা নিদেনপক্ষে সেগুলির অনুকরণে নতুন ছবি যোগ করা হতো। ১২৫৮ সালে মধ্য এশিয়ার তুর্কমান নেতা হালাকু খানের আক্রমণে বাগদাদ নগরী ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক যুগের এই সব মুসলিম পাণ্ডুলিপিরও বেশিরভাগই ধ্বংস হয়ে যায়। তবে সৌভাগ্যক্রমে হালাকু খানের বংশধররা পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীর মধ্যেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হয়ে ওঠেন মুসলিম সংস্কৃতির নয়া পৃষ্ঠপোষক। তাদের মাধ্যমে পাণ্ডুলিপি চিত্রের নবজন্ম হয় পারস্যে, আর তাতে যুক্ত হয় চীনা চিত্ররীতির ঐতিহ্য। এইভাবে অন্ততপক্ষে তিনটি শিল্পধারার সংযোগের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল পারস্যের মুসলিম পাণ্ডুলিপি-চিত্রের ঐতিহ্য।

এই ধারা আরো বেগবান হয়েছিল পঞ্চদশ শতকে তৈমুরের বংশধরদের আনুকুল্যে তৈমুরীয় শৈলীর অনুচিত্রভিত্তিক পাণ্ডুলিপির বিকাশের মধ্য দিয়ে। আর সে চিত্রকলা আরও পরিণত ও পরিশীলিত হয় ষোড়শ শতকে-পারস্যের বিখ্যাত সাফাভিবংশের শাসনকালে। সাফাভি সুলতান শাহ ইসমাইল (১৫০১-১৫২৪ খ্রি.) পশ্চিম পারস্যের তাব্রিজ শহরে রাজত্ব শুরু করে নানাদিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। তিনি তৈমুরবংশীয় সুলতানদের এককালীন রাজধানী পূর্ব পারস্যের হেরাত শহরটিও অধিকার করে নেন। হেরাত ছিল পরিশীলিত সংস্কৃতির এক শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র, যেখানে তৈমুরীয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় পাশাপাশি বসবাস করতেন কবি, শিল্পী ও দার্শনিকরা। শাহ ইসমাইল তাঁর পুত্র তাহমাস্পকে এই শহরে পাঠিয়েছিলেন শিক্ষা লাভের জন্য। তাহমাস্প সেখানে পালিত হন শিল্পরসিক অমাত্য কাজি-ই-জাহানের কাছে। শৈশবের এই সাহচর্য তাহমাস্পকে পরে পারস্যের চিত্রকলার এক শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক করে

তোলে। তরুণ রাজকুমার তাহমাস্পকে খুশি করার জন্য শাহ ইসমাইল তৈমুরীয় দরবারের মহান শিল্পী বিহজাদকে রাজকীয় গ্রন্থশালার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। তাহমাস্প সিংহাসনে আরোহন করলে (১৫২৪ খ্রি.) বিহজাদ তাঁর দরবারের প্রধান চিত্রকর হিসেবে নিযুক্ত হন। বিহজাদ তাঁর তৈমুরীয় শৈলীর অভিজ্ঞতায় সাফাভি চিত্রশৈলীকে পরিশীলিত করতে সহায়ক হন- তিনি ছিলেন তৈমুরীয় ও সাফাভি চিত্রশৈলীর মধ্যবর্তী সেতু। সাফাভি শৈলীর এই প্রথম দিককার ধারাই এসে পৌঁছেছিল বাংলায়। নুসরত শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড়ে অংকিত *ইস্কান্দারনামা*'র পাণ্ডুলিপি চিত্রে সেই ধারারই প্রমাণ পাওয়া যায়। বাহাত্তর পৃষ্ঠার এই পাণ্ডুলিপিতে ছবি আছে নয়টি।[৬০] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনো ছবিতেই শিল্পীর স্বাক্ষর নেই। ফলে ছবিগুলি কার আঁকা তা জানা যায় না। এই ছবিগুলি মূলত পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধের পারসিক চিত্রধারায় অংকিত হলেও বিহজাদের নিজস্ব শৈলীর কিছু ছাপ বহন করছে বলে মনে হয়- যেমন রূপবিন্যাসের শৃঙ্খলায় ও মনুষ্য অবয়বের ভঙ্গিমায়। আলোকবিচ্ছুরিত আকাশের সঞ্চারমান মেঘের রূপায়নেও বিহজাদের প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু যা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তা হল এই ছবিগুলিতে বাংলার স্থানীয় প্রভাবও একই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। রূপনির্মিতির সারল্যে, বিশেষত পাতাকাটা খিলান, ছত্রি ও নানা বর্ণের টালির অলংকরণ সমন্বিত স্থাপত্যের সুমিত ব্যবহারে, এবং বৃক্ষের রীতিসিদ্ধ রূপায়ণে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের গৌড়ের পরিবেশ শিল্পীর রূপভাবনায় কাজ করেছিল বলে মনে হয়।

[৬০] MR Tarafdar, 'The Illustrataions in Sharafnama', in *Journal of Bengal Art*, vol. 1, Dhaka: Interanational Centre for the Study of Bengal Art, 2000.

ছবিগুলিতে এই ভারতীয় প্রভাবের কথা অ্যান্ড্রু টপসফিল্ড এবং জেরেমিয়া লস্টিও স্বীকার করেছেন।[৬১]

পারস্যের শিল্পীরা যে সেসময় একমাত্র সাফাভি সুলতান শাহ তাহমাস্পের ও তাঁর অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষকতার উপরই নির্ভরশীল ছিলেন, তা নয়। কৃতী শিল্পীরা অটোমান, উজবেক, এমনকী ভারতের প্রাদেশিক সুলতানদের দরবারেও সাদরে গৃহীত হতেন। নুসরত শাহের আমলে গৌড়ের সুলতানি দরবারে এইভাবেই আহৃত হয়েছিলেন সুদুর পারস্যের শিল্পী। এরও কিছুকাল পরে, ১৫৪৫ খ্রিস্টাব্দে, তাহমাস্প চিত্রকলার প্রতি তাঁর বিশেষ আতিশয্যকে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতাজাত মানসিক দুর্বলতার লক্ষণ মনে করে সম্পূর্ণভাবে চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা ত্যাগ করলে সাফাভি দরবারের অনেক শিল্পীকেই বাধ্য হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে হয়। তারই ফলে সাফাভি শৈলীর অন্ততপক্ষে চারজন যশস্বী শিল্পী মীর সৈয়দ আলি, খাজা আব্দুস সামাদ, মীর মুসাব্বির ও দোস্ত মহম্মদ ভারতে হুমায়ুনের দরবারে চলে আসেন। আকবরের আগ্রহে ও আনুকূল্যে তাঁদের হাতেই সূচিত হয় দরবারি মুঘল-চিত্রকলা। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হল প্রাদেশিক সুলতানদের দরবারে তার আগেই পারসিক শিল্পীদের পোষকতা মিলেছিল। আর সেই সুলতানদের অন্যতম ছিলেন বাংলার নুসরত শাহ।

সুলতানি আমলে বৈষ্ণব আশ্রিত চিত্রকলা

হোসেন শাহী আমলে বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়। স্বাভাবিকভাবেই সেখানকার দরবারে পারসিক ও আরবিক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল প্রবল। তখন ফারসি ভাষাই ছিল সরকারি ভাষা, আর সেই কারণেই পারসিক চিত্রকলা

[৬১] J.P. Losty, *Indian Book Painting*, London: The British Library, 1986; Andrew Topsfield, *An Introduction to Indian Court Painting*, London: H.M.S.O., 1984.

পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল নুসরত শাহের দরবারে। পাশাপাশি সে সময় ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে প্রাণবন্ত ছিল নিকটবর্তী নবদ্বীপ শহর। হোসেন শাহের আমলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল এই নবদ্বীপ শহরেই। নবদ্বীপে কলাশিল্পের চর্চা কতদূর ছিল, প্রামাণ্য সূত্রের অভাবে তা পরিষ্কারভাবে জানা যায় না। তবে গৃহস্থ জীবনে পূজাব্রততে আলপনা রচনা আর বিবাহে পিঁড়ি অংকণের যে প্রচলন ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া নৃত্য-গীত-অভিনয়কলায় চৈতন্যদেবের পারদর্শিতা থেকে মনে হয়, ওইসব শিল্পের অনুশীলনও নবদ্বীপে ছিল। তুলনায় বরং চিত্রকলা সম্পর্কে তথ্য প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না চৈতন্যজীবনী-কাব্যগুলি থেকে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে নবদ্বীপে চিত্রকলার চর্চা ছিল না। অধুনা আবিষ্কৃত বংশীবদনের লেখা *শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত* গ্রন্থে নবদ্বীপের চিত্রকলার স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া গেছে।[৬২] বংশীবদন ছিলেন চৈতন্যের অন্তর্ধানের পর শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনি লিখছেন: শ্রীবাসমন্দিরে জনৈক ভাস্কর শ্রীগৌরাঙ্গকে শ্রীকৃষ্ণের 'গোদোহনলীলা' চিত্রপটে প্রদর্শন করলে গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ ভাবাবেশে গোপলীলানুকরণ করে নৃত্য করেছেন। এই গ্রন্থে অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ভাগবতগণের সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণের পর শ্রীগৌরাঙ্গ চিত্রগৃহে বিশ্রাম নিলেন।

চৈতন্যদেবের ধর্মকে আশ্রয় করে নৃত্য-গীত-অভিনয়ের সঙ্গে চিত্রকলার বিকাশ ছিল স্বাভাবিক। বিশেষত, তিনি তাঁর প্রেমভক্তি'র ধর্মকে ভাবোন্মদনার মধ্য দিয়েই-ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে শিল্পানুভূতিকে সম্মিলিত করেই-সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের মধ্যেই ছিল এই দুই-ধর্মীয় ও কাব্যিক-অনুভূতির সহাবস্থান; তিনি খ্যাত হন সংকীর্তন-রস-নৃত্যবিহারী নামে। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতি স্ফুর্ত

[৬২] দ্রষ্টব্য, সুরেন্দ্রমোহন শাস্ত্রী, *শ্রীগৌরাঙ্গ লীলামৃত*, কলকাতা, ১৩৮১ বাংলা সন।

হয়ে উঠেছিল তাঁরই অনুপ্রাণিত প্রেমভক্তি নির্ভর বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ভিত্তিতে। সেই ধর্মান্দোলন এক নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলার চিত্রকলাকেও বিশেষভাবে সঞ্জীবিত করে তুলেছিল।

ঘটনাটি ঘটে ষোড়শ শতকের শেষ দিকে। বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে শাস্ত্র অধ্যয়ন ও গোপাল ভট্টের কাছে দীক্ষা গ্রহণের পর বৃন্দাবনের গোস্বামীদের রচিত এক গাড়ি শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে বাংলায় ফিরছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। তাঁর সঙ্গী ছিলেন নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ। দুর্গম জঙ্গলপথ পেরিয়ে গাড়ি বনবিষ্ণুপুর পৌঁছালে গোপালপুর গ্রামে একদল দস্যু ধনদৌলত মনে করে বৈষ্ণবগ্রন্থাদি লুঠ করে নেয়। লুণ্ঠিত গ্রন্থের উদ্ধারের আশায় শ্রীনিবাস হাজির হন বনবিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বীর হাম্বীরের রাজসভায়। হাম্বীর তাঁর সাত্ত্বিক রূপদর্শনে ভাবান্তরিত হয়ে সপরিবারে তাঁর কাছে দীক্ষা নেন। এই ঘটনায় কেবল মল্লভূমির নয়, সারা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে রূপান্তর দেখা দেয়। হাম্বীর এবং তাঁর পুত্র ও পৌত্র রঘুনাথ সিংহ ও বীর সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় সারা সপ্তদশ শতক জুড়ে বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্মাশ্রিত সাহিত্য ও সংগীত, মন্দির-স্থাপত্য ও চিত্রকলা এক অভূতপূর্ব সৃজনশীলতায় বিকাশ লাভ করে। এই সাংস্কৃতিক বিকাশ অষ্টাদশ মতকের মধ্যভাগ, অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের সূচনাকালে বিষ্ণুপুর রাজাদের বিপর্যয় ঘটার পূর্ব পর্যন্ত অক্ষুন্ন থেকে বাংলার পরস্পরাগত কলাশিল্পকে আধুনিক কালের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দরবারি চিত্রকলা: মুর্শিদাবাদ রীতি

বাংলায় চিত্রকলার বিকাশপর্বে একটি গুরুত্বপুর্ণ অধ্যায় ছিল মুর্শিদাবাদ চিত্রকলা। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে মুর্শিদাবাদ নগরকে ঘিরে গড়ে ওঠা নতুন অভিজাততন্ত্র যেমন দিল্লী-আগ্রার মুঘল দরবারের অনুকৃতি ছিল, তেমনি তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা মুর্শিদাবাদ ঘরানার চিত্ররীতিরও সূচনা হয়েছিল দিল্লী-আগ্রাকেন্দ্রিক মুঘল শৈলীরই আঞ্চলিক রূপ হিসেবে। কিন্তু নবাবী আমল থেকে শুরু করে এর অব্যবহিতকাল পরে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন আমলের শুরুর দিকে মুর্শিদাবাদে চিত্রিত ছবিতে এর পাশাপাশি যুক্ত হয়েছিল বাংলার দেশীয় এবং বিশেষ করে ইউরোপিয় উপাদান, বাংলা চিত্রকলার বিকাশে আধুনিকতার সূচনা হয়েছিল যার হাত ধরে।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলায় চিত্রকলা চর্চার ঐতিহ্য লালিত হয়ে আসছে। এ ঐতিহ্যের সবচেয়ে বেগবান ধারাটি বিকশিত হয়েছে রাজদরবারকে কেন্দ্র করে। পালরাজা প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বের অষ্টম বছরে (আনুমানিক ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ) নালন্দা মহাবিহারে লেখা অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা নামের একটি পুঁথির অলঙ্করণ হিসেবে আঁকা ১২টি ছবিকে বলা যায় বাংলার দরবারি চিত্রকলার প্রাচীনতম নিদর্শন।[৬৩] চিত্রকলা চর্চার এ ধারাবাহিকতা মুসলিম শাসনামলেও অব্যাহত ছিল। ঐহিত্যগতভাবে মুসলিম চিত্রকলাও ছিল মূলত পাণ্ডুলিপি নির্ভর, বাংলার

[৬৩] সরসীকুমার সরস্বতী, *পালযুগের চিত্রকলা*, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ. ১৩।

সুলতানরাও সে ধরনের ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সুলতান নুসরাত শাহের আমলে চিত্রায়িত *শরফনামা* পাণ্ডুলিপির ছবিগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে, সুলতানি আমলে বাংলার শিল্পীদের ছবিতে পারসিক চিত্রকলার প্রভাব ছিল।[৬৪] এ প্রভাব আরো বেশি করে পড়েছে মুঘল আমলের ছবিতে, বিশেষ করে মুঘল যুগের শেষ দিকে বিকশিত মুর্শিদাবাদ চিত্রকলায়। পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে চিত্রকলার বিকাশে মুঘলদের পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকা অতুলনীয়, কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় থেকে একদিকে তাঁর নিজের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী আর অন্য দিকে মুঘলদের কেন্দ্রিয় শাসন ভেঙে পড়তে শুরু করায় পতনের পালা শুরু হয়েছিল মুঘল চিত্রকলায়। বাধ্য হয়ে মুঘল শিল্পীরা নতুন পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে দিল্লী আগ্রা ছেড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে থাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে, জন্ম নেয় মুঘল চিত্রকলার বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক শৈলী। উত্তর ভারতের পাহাড়ি রাজ্যসমূহ এবং অযোধ্যার পাশাপাশি বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদকে ঘিরেও গড়ে ওঠে একটি শক্তিশালী শিল্প-ঘরানা।

এই সময়ে ভঙ্গুর মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে নতুন নতুন অভিজাততন্ত্র গড়ে উঠছিল, মুর্শিদাবাদের নবাবী ছিল তাঁর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। নবাব মুর্শিদ কুলি খান তাঁর নতুন রাজধানী মুর্শিদাবাদে দিল্লীর দরবারেরই একটি ছোটখাটো সংস্করণ গড়ে তুলেছিলেন। মুঘলদের প্রতি তাঁর আনুগত্যে কোনো ঘাটতি ছিল না, আঠারো শতকের গোড়ার দিকে মুঘলরা কেবল বাংলা থেকেই নিয়মিত রাজস্ব পেত, কিন্তু বার্ষিক প্রায় তিন কোটি রুপি নগদ রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে তিনি বাংলায় নিজেকে মুঘল সম্রাটের ছায়া হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। মুঘলদের রাজস্ব ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজিয়েছিলেন তিনি, আর সেই সূত্র ধরে বাংলায় গড়ে উঠেছিল এক নতুন ভূ-অভিজাত শ্রেণি। মুর্শিদ

[৬৪] M.R. Tarafdar, 'Some Illustrations of the Period of Nusrat Shah', in *Journal of Bengal Art*, Vol. 1, Dhaka, 1996, পৃ. ২১২-১৮।

কুলি খানের আনুকুল্যে বেড়ে ওঠা এই জমিদার শ্রেণির অনেকেই ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী, এবং তাঁরাও নিজেদের জমিদারীতে রীতিমতো রাজ্যপাটই গড়ে তুলেছিলেন। এই সব জমিদারী 'রাজ্যে'ও সম্প্রসারিত হয়েছিল চিত্রকলা চর্চার ধারা। প্রাচীন বাংলার ঐতিহ্য আর মুঘল রীতির ধারাবাহিকতা ধরে রেখে এই চিত্রকলায়ও পাণ্ডুলিপি চিত্রনের ধারা অব্যাহত ছিল, কিন্তু মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নিদর্শনগুলো ছিল দরবারি ছবি, বিশেষ করে নবাবসহ দরবারের অভিজাতদের প্রতিকৃতি।

মুর্শিদ কুলি খান অবশ্য আওরঙ্গজেবের মতোই একজন কট্টোর ধর্মপ্রাণ মুসলিম ছিলেন, নিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন করতেন। দৃশ্যত চিত্রকলার প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু মুঘল প্রশাসন ব্যবস্থার চরিত্রটাই ছিল এমন, যে তা মুঘল অভিজাতদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকে রূপান্তর করতো। জনগণের কাছ থেকে যে খাজনা তারা আদায় করতেন, সেটার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতেই যেন 'জনসেবা' করতেন তাঁরা। জনগণের সামনে নিজেদের তুলে ধরতেন জনগণের (এবং ধর্মের) রক্ষক, গরীবের আশ্রয়স্থল এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। শুধু তা-ই নয়, একই সঙ্গে প্রজাদের তুলনায় নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতেন তাঁরা। দামী পোশাক ও মণিরত্নে সজ্জিত থাকতেন, সবচেয়ে শক্তিশালী হাতি কিংবা ঘোড়ায় সওয়ার হতেন, ব্যবহার করতেন কারুকার্যখচিত অস্ত্র-শস্ত্র। সব মিলিয়ে তাঁর যে একটা আদর্শ রূপ গড়ে তোলা হতো, সেটা ছিল এক কথায় ঈর্ষণীয়।[৬৫] তাঁর নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্রও তৈরি করে দিত কারুশিল্পীরা। আর এ জন্য

[৬৫] "The Formulation of Imperial Authority Under Akbar and Jahangir," in Richards, J.F. (Ed.), *Kingship and Authority in South Asia*, Madison: Center for South Asian Studies, University of Wisconsin, 1978, pp. 252–285. Reprinted in Muzaffar Alam and Sanjay Subrahmanyam, *The Mughal State 1526–1750*, Delhi: Oxford University Press, 1998.

মুঘলদের রাজকীয় গৃহস্থালির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল 'কারখানা'। আকবরের আমল থেকেই বাদশাহ ও তাঁর পরিবারের সকলের পরণের কাপড় থেকে শুরু করে অস্ত্র-শস্ত্র এমনকি অলঙ্কারাদি পর্যন্ত তৈরি হতো এই রাজকীয় কারখানায়। এই কারখানারই অংশ হিসেবে থাকতো কুতুবখানা বা গ্রন্থাগার এবং সুরতখানা বা চিত্রশালা। সুরতখানার কর্মী হিসেবে চিত্রকররাও ছিলেন এই কারখানারই অংশ, ছবির উৎপাদন সম্পন্ন হতো বিভাজিত শ্রমের ভিত্তিতে। শিল্পীরা তাঁদের তুলি নিয়ে হাজির থাকতেন; রঙ, কাগজ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় অন্য সব উপকরণ তৈরির জন্য ছিলেন আলাদা কারিগর। এমনকি একটি ছবিতের অঙ্কন প্রক্রিয়ায়ও কখনো কখনো একাধিক শিল্পীর কাজ যুক্ত হতো, কেউ করতেন প্রাথমিক ড্রইং বা *তারাহি*, কেউ করতেন *রঙ-আমেজি* বা রঙের কাজ আবার কারো দায়িত্ব ছিল চূড়ান্তভাবে মুখচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা বা *চেহরা-কুশাই*। প্রাচীন ভারতের জাতিভেদ প্রথা-অনুসারে বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষেই শিল্পীরা কাজ শিখতেন বংশ পরম্পরায়। আকবর এই প্রথা ভেঙে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মেধা, পালকি-চালকের ঘরে জন্ম নেয়া দাসবন্ত তাই আকবরের দরবারের খ্যাতিমান শিল্পী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। আকবর কিংবা জাহাঙ্গীরের রাজকীয় কারখানার শিল্পীদের কাজের বিষয়ও নির্ধারণ করে দিতেন তাঁরাই, তারপর সপ্তাহান্তে অন্য কারুশিল্পীদের মতোই তাদের কাজ উপস্থাপন করতে হতো বাদশাহর সামনে, পছন্দ হলে বাদশাহ 'ইনাম' বা পুরষ্কার দিতেন; পছন্দ না হলে বাতিল করে দিতেন, এমনকি কখনো কখনো শাস্তিরও ব্যবস্থা করতেন![৬৬] মুঘল দরবারে ছবির উৎপাদন ব্যবস্থা তাই ছিল যৌথ প্রচেষ্টার ফসল। রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়ের মতে এর একটা খারাপ দিক ছিল এই, যে এর ফলে শিল্পীরা তাদের পৃষ্ঠপোষকদের ওপর অনেকখানি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন, স্বাধীন শিল্পীসত্ত্বার বিকাশ ঘটানোর

[৬৬] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, *দরবারি শিল্পের স্বরূপ মুঘল চিত্রকলা*, কলকাতা: থিমা, ১৯৯৭, পৃ. ২৭

সুযোগ ছিল না তাদের।[৬৭] রাজার দরবারে পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে তাঁকে খুঁজে নিতে হতো অন্য কোনো পৃষ্ঠপোষক। তবে সেটার অভাব ছিল না, কারণ রাজ দরবারের অভিজাতরা বাদশাহকে অনুকরণ করতেন, আমির-ওমরাহদের প্রত্যেকের বাড়িগুলোই রাজপ্রাসাদের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ হিসেবে গড়ে উঠতো।

আঠারো শতকের শুরুর দিক থেকেই মুঘলদের শৌর্য-বীর্য ক্ষয়িষ্ণু ধারায় রূপান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু তাদের প্রতিষ্ঠিত রাজকীয় রীতি ও আচার-অনুষ্ঠানগুলো ততদিনে এতটাই শিকড় গেঁড়ে বসেছে যে ভঙ্গুর মুঘল সাম্রাজ্যের আনাচে-কানাচে যে সকল আঞ্চলিক রাজ্য গড়ে উঠছিল, সেগুলিতেও গড়ে উঠছিল এরই প্রতিচ্ছবি। মুর্শিদাবাদের দরবার ছিল এর আদর্শ উদাহরণ।

মুর্শিদ কুলি খান রাজস্ব প্রশাসনে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে গিয়েই তিনি এই ভূ-খ-ের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসে রীতিমতো পালা-বদলের সূচনা করেছিলেন সম্ভবত নিজের অজান্তেই। এ কাজ করতে গিয়ে তাঁকে পড়তে হয়েছিল বহু বছর ধরে প্রচলিত ব্যবস্থার সুবিধাভোগী সামন্তশ্রেণির, দেশে তৈরি হয়েছিল এক ধরনের অস্থিরতা। রাজস্ব আদায় এবং নিজের রাজকীয় অবস্থানের বিষয়ে অত্যন্ত কট্টর অবস্থান নিয়ে শক্ত হাতে সে পরিস্থিতি সামাল দিয়েছিলেন তিনি। সমকালীন ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলীমের বর্ণনা থেকে এর খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। সলীম লিখেছেন,

> তাঁর ব্যক্তিত্ব বড় ছোট সকলের মনে এতই ভীতি সঞ্চার করতো যে সিংহহৃদয় ব্যক্তিরাও তাঁর সামনে কাঁপতো। খান ক্ষুদ্র জমিদারদের তাঁর সামনে উপস্থিত হতে দিতেন না। মুৎসুদ্দি, আমিল এবং নেতৃস্থানীয় জমিদারগণও তাঁর সামনে আসন গ্রহণে সাহস করতেন না। হিন্দু

[৬৭] Ratnabali Chatterjee, *From Karkhana to the Studio,* p. 17.

> জমিদারদের পালকি চড়া নিষিদ্ধ ছিল, তবে তারা জাওয়ালা ব্যবহার করতে পারতেন। মুৎসুদ্দিরা তাঁর সামনে ঘোড়ায় চড়তেন না, সরকারি অনুষ্ঠানে মনসবদারদের সামরিক পোশাক পরে উপস্থিত হতে হতো। তাঁর সামনে কেউ কাউকে অভিবাদন করতে পারতেন না, এর ব্যতিক্রম হলেই তৎক্ষণাৎ তিরষ্কার করা হতো।[৬৮]

এই ক্ষমতার উৎস কোথায় ছিল, সলীম সেটাও জানিয়েছেন,

> বাদশাহী ক্ষমতার (বা কর্তৃত্বের) প্রতি নওয়াবের এতই শ্রদ্ধা ছিল যে তিনি এ ব্যাপারে কাউকেই ছাড় দিতেন না। তিনি নিজে কখনো বাদশাহী নৌবহরে ভ্রমণও করতেন না। ..... নওয়াব যেহেতু বাদশাহের সহকারী ছিলেন, তাই তাঁর দরবার দিল্লীর দরবারের ছায়া স্বরূপ ছিল, এমনকি দিল্লীর বাদশাহদের ক্ষমতা যখন সামান্যই অবশিষ্ট ছিল তখনো।[৬৯]

মুঘল অভিজাতদের রীতি অনুযায়ী নিজের এই রাজকীয় অবস্থান নিশ্চিত করতে তাঁকে 'জনসেবা'য় ব্রতী হতে হয়েছে। উদ্বৃত্ত রাজস্বের একটা অংশ তিনি ব্যয় করেছেন মসজিদ ও প্রাসাদসহ নানা ধরনের স্থাপত্য নির্মাণে। ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তিদের উদার পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছেন তিনি। তবে সবচেয়ে বেশি ব্যয় করতেন হজরত মোহাম্মদ (সা.) এর জন্মদিন বা ঈদ-ই মিলাদুন্নবী'র উৎসব উপলক্ষে। এ উৎসবেই তাঁর রাজকীয় ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর সুযোগ ছিল সবচেয়ে বেশি। এ উপলক্ষে রবিউল আউয়ালের ১ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত উৎসব চলতো। মুর্শিদাবাদ এলাকার আশপাশ থেকে এ সময় ধার্মিক, শেখ ও দরবেশদের ডেকে এনে আপ্যায়ণ করা হতো, মুর্শিদ কুলি খান নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের খাওয়া তদারকি করতেন। এ সময় 'মাহি নগর থেকে লালবাগ পর্যন্ত সমগ্র নদীতীর এমনভাবে চেরাগের আলোয় সজ্জিত করা হতো যে নদীর অপর তীরের

---

[৬৮] গোলাম হোসেন সলীম, *বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ)*, অনুবাদঃ আকবরউদ্দিন, ঢাকা, ১৯৭৪; পুনর্মুদ্রণ, ঢাকাঃ অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৮, পৃ. ১৩৫।

[৬৯] গোলাম হোসেন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ*, পৃ. ১৩৫-১৪৯।

দর্শকরাও বিস্ময়ের সঙ্গে মসজিদের গায়ে উৎকীর্ণ কোরআনের আয়াত পড়তে পারতেন ।'[৭০]

অভ্রের লণ্ঠন আর ঝাড়বাতি দিয়ে ভাগিরথী নদীর দুই তীর সাজানোর কাজে প্রচুর টাকা খরচ করা হতো, দিল্লী-আগ্রা থেকে আসা পেশাদার শিল্পীরা এই কাজে যোগ দিতেন । সমকালীন ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাবা-তাবাই তাঁর সিয়ার-উল মুতাখখেরিন গ্রন্থে লিখেছেন, এ কাজে নাকি লক্ষাধিক কর্মী নিয়োগ করা হতো ।[৭১] মুর্শিদকুলি খান নিজে চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন এমন তথ্য সমকালীন ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় পাওয়া যায় না । তবে মুর্শিদাবাদের একজন নাম না জানা শিল্পীর আঁকা একটি ছবি সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাঁর দরবারেও দরবারি ছবির চল ছিল (চিত্র ২.১) । ছবিটিতে আঁকা হয়েছে পূর্বোল্লেখিত উৎসবের দৃশ্য । ভাগিরথী নদীর তীরে নিজের প্রাসাদে একটি চাঁদোয়ার নিচে দরবারে বসে আছেন মুর্শিদ কুলি খান, তাঁর পেছনে নদীতে ভাসমান নৌকা ও নদীতীর জুড়ে আলোকসজ্জা । মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার এটিই সবচেয়ে পুরনো নিদর্শন । রবার্ট স্কেলটন অনুমান করেছেন ছবিটি ১৭২০ সালে আঁকা ।[৭২] ছবিটি অবশ্য একেবারেই মুঘল রীতিতে কাগজের ওপর ঘন জলরঙ বা গুয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা । ছবির চরিত্রগুলোও মুঘল দরবারি ছবির মতোই পোশাকে সজ্জিত, তবে নিচু রেলিং দিয়ে ঘেরা একটি চত্বরের মাঝে চাঁদোয়ার নিচে নবাবের বসে থাকার যে দৃশ্যপট এখানে সাজানো হয়েছে, সেটি পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদের ছবির প্রায় অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয় ।

---

[৭০] *রিয়াজ-উস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ*, পৃ. ১৪৮ ।

[৭১] Mir Gholam Hussein Khan, *Siyar-ul-Mutakkherin,* Translated into English by John Briggs, London: Oriental Translation Fund, 1880, Vol. 1, pp 387-88.

[৭২] Robert Skelton, 'Murshidabad Painting', in *Marg,* Vol. X, No. I, Bombay, December 1956, p. 19.

নিজে চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খুব একটা খ্যাতি না পেলেও মুর্শিদ কুলি খান যে মুঘল দরবারি রীতি অনুসারে ছবি আঁকানোর ব্যবস্থা করেছিলেন, এই ছবিটি তার প্রমাণ। তবে প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার চেয়েও এ ক্ষেত্রে তাঁর অপ্রত্যক্ষ ভূমিকাটিই বরং খুলে দিয়েছিল চিত্রকলার এক নতুন ঘরানার বিকাশের পথ। মুর্শিদাবাদের দরবারে মুঘল দরবারের যে প্রতিচ্ছবি তিনি গড়ে তুলেছিলেন, সেখানে গড়ে উঠেছিল নতুন এক পৃষ্ঠপোষক শ্রেণি। সমকালীন ইতিহাস থেকে জানা যায়, বছরে অন্তত একবার, 'পুন্যাহ উৎসবের সময় তিনি উপযুক্ত জমিদারদের মধ্যে খিলাৎ বিতরণ করতেন, উপহার দিতে জমকালো পোশাক, ঘোড়া ও অস্ত্র-শস্ত্র।'[৭৩] অন্য দিকে, প্রতি বছর তিনি দিল্লীতে বিপুল পরিমাণ উপহার সামগ্রী পাঠাতেন, সেগুলোর মধ্যে থাকতো বাংলার উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র এবং হাতির দাঁতের তৈরি শিল্প-সামগ্রী। দিল্লীতে প্রতি বছরের পাঠানো রাজস্বের বাইরেও উদ্বৃত্ত টাকা থাকতো তাঁর কাছে, এর মধ্য থেকে 'এক কোটি নব্বই লক্ষ রুপি নবাবের খাজাঞ্চিখানা ও স্থানীয় অভিজাতদের মধ্যে বিতরণ করা হতো।'[৭৪] এই বিপুল ধন-সম্পদ ত্বরান্বিত করেছিল নগর মুর্শিদাবাদের বিকাশ, ছোট একটি টাকশাল শহর থেকে দুই দশকের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ হয়ে উঠেছিল সমৃদ্ধ রাজধানী। আর সেই রাজধানীর নতুন অভিজাতবর্গের ক্রয় ক্ষমতাও বেড়েছিল, যা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে থাকা শিল্পীকুলের জন্য।[৭৫] এই শিল্পীদের হাত ধরেই মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার বিকাশ আর তাই বলা যায়, মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার বিকাশ শুরু হয়েছিল মুঘল রীতির ধারাবাহিকতা হিসেবেই। ততোদিনে এই

[৭৩] গোলাম হোসেন সলীম, *বাংলার ইতিহাস (রিয়াজ-উস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ)*, পৃ. ১৪৮।

[৭৪] *রিয়াজ-উস-সালাতীনের বঙ্গানুবাদ*, পৃ. ১৪৮।

[৭৫] Ratnabali Chatterjee, *From Karkhana to the Studio,* p 18.

রীতি আর পারসিক চিত্রকলার অপভ্রংশ নয়, হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষের স্থানীয় রীতিই ।

মুর্শিদ কুলি খানের উত্তরসুরি ও তাঁর জামাতা সুজাউদ্দিন এবং পৌত্র সরফরাজ খান উভয়েই বিলাসী জীবন যাপন করতেন, সুতরাং চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করা তাঁদের জন্য অস্বাভাবিক কোনো বিষয় ছিল না । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই দুই শাসকের সময়কালের কোনো ছবি এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায়নি । তাই নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় তাঁরা আসলেই চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কি না । তবে ১৭৪০ সালে নবাব আলিবর্দী খান সিংহাসনে আসীন হওয়ার পরই মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার স্বর্ণযুগ সূচিত হয় । পরিণত বয়সে সিংহাসনে বসা আলিবর্দী অবশ্য তাঁর শাসনকালের প্রথম ১০ বছর যুদ্ধ করেই কাটিয়েছেন, মারাঠা বর্গিদের সঙ্গে সেই যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিজেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিপতি হিসেবে প্রমাণ করতে করতেই কেটে গেছে এক দশক । তবে তাঁর শাসন আমলের শেষ সাত বছর ছিল শান্তির সময়, আর এ সময়েই তিনি চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আবির্ভুত হন । ব্যক্তিগত জীবনে একপত্নীক এবং আলিবর্দী মুর্শিদ কুলি খানের মতোই সংযত জীবনাচরণ অনুসরণ করতেন, কিন্তু মুঘল অভিজাতদের মতো করে নিজের শৌর্য প্রকাশের নিরন্তর চেষ্টা ছিল তাঁর । ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাবাতাবাই জানিয়েছেন, সূর্যোদয়ের দুই ঘণ্টা আগে ঘুম থেকে উঠতেন তিনি, প্রাত-কৃত্য ও ফজরের নামাজ শেষ করে, কফি পান করে খুব সকালে দরবারে বসতেন । দুই ঘণ্টা চলতো এ দরবার, তাঁরপর তিনি বিশ্রাম নিতেন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের সান্নিধ্যে । প্রতি বছর শীতকালে নিয়ম করে রাজমহলের পাহাড়ে শিকার করতে যেতেন আলিবর্দী খান ।[৭৬] মুঘল দরবারি ছবির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল দরবার এবং রাজ পরিবারের জীবন-কাহিনী ফুটিয়ে তোলা,

[৭৬] Mir Gholam Hussein Khan, *Siyar-ul-Mutakkherin,* pp. 463-65

মুর্শিদাবাদের শিল্পীরাও নিপুণভাবেই করেছেন সেই কাজটি। লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহশালায় রক্ষিত দুটি ছবি থেকে আলিবর্দীর জীবন সম্পর্কে গোলাম হোসেনের উপরোক্ত বর্ণনা যেন হুবহু খুঁজে পাওয়া যায়। প্রথম ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে মুর্শিদাবাদের ছবির চিরচেনা প্রেক্ষাপট প্রাচীর ঘেরা খোলা ছাদে জাজিমের ওপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন নবাব, পেছনে বাতাস করছে দুই পরিচারক আর তাঁর পাশে বসা ভ্রাতুস্পুত্র নওয়াজিশ মুহম্মদ, সামনে আরেক ভ্রাতুস্পুত্র সৈয়দ আহমদ খানের সঙ্গে দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা (চিত্র ২.২)।[৭৭] দ্বিতীয় ছবিটি শিকার দৃশ্যের, নদীর ধারে ঘোড়ায় চড়ে বর্শা হাতে নবাব তাড়া করছেন কৃষ্ণসার হরিণকে (চিত্র ২.৩)।[৭৮] ১৭৫০ সালে এ ছবিটি যখন আঁকা হয়, আলিবর্দীর বয়স তখন ৭০ পেরিয়ে গেছে। মুখের সাদা দাড়িতে সে বয়সের ছাপ সত্ত্বেও তাঁর নিজের সাবলীল বর্শাচালানোর ভঙ্গি আর রুচিসম্মত পোশাক, এমনকি তাঁর ঘোড়াটিরও তেজোদীপ্ত ভঙ্গি সেই বয়সকে আড়াল করে ফুটিয়ে তুলেছে রাজপুরুষের শৌর্য। লক্ষ্যণীয়, এ দুটি ছবিতেও মুঘল পরম্পরার ছাপ স্পষ্ট। রঙে, রেখায় আর দৃশ্যপটের বিন্যাসে, সর্বত্র।

তবে এই ধরনের প্রতিকৃতি মুর্শিদাবাদের ছবিতে রীতিমতো বিরল। মুঘল দরবারি ছবির সঙ্গে মুর্শিদাবাদের ছবির বিষয়বস্তুতে একটি পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। মুঘল দরবারি ছবির দুটি অতি পরিচিত বিষয়বস্তু ছিল 'দরবারে সমাসীন বাদশাহ' আর 'যুদ্ধের ময়দানে বাদশাহ'। মুর্শিদাবাদের প্রতিকৃতি চিত্র ঠিক এই দুটি দৃশ্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না। মুঘল প্রতিকৃতিতে দরবারের চোখ-ধাঁধানো রূপ ফুটিয়ে তোলা হতো ঝকঝকে উজ্জ্বল রঙে, মুর্শিদ কুলি খান ও আলিবর্দী খানের পূর্বোক্ত ছবিদুটি ছাড়া মুর্শিদাবাদের প্রতিকৃতি চিত্রে রঙের

[৭৭] Victoria & Albert Museum, London, Museum No: D.1201-1903

[৭৮] Victoria & Albert Museum, London, Museum No: D.1199-1903

এই উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তোলা হয়নি। সেগুলোর বেশিরভাগই একান্তই ঘরোয়া পরিবেশের, যেন অন্ত:পুরের অভ্যন্তরের দৃশ্য। রেলিং ঘেরা ছাদে ভ্রাতুষ্পুত্র ও নাতিদের সঙ্গে আলিবর্দীর ছবিটি এর আদর্শ উদাহরণ, এ রকমই একান্ত বিশ্বস্ত ও আপনজনদের সঙ্গে আলাপরত অবস্থায় চিত্রিত হয়েছেন মুর্শিদাবাদের অভিজাতরা। মুঘল দরবারি প্রতিকৃতির মতো এই প্রতিকৃতিগুলোয় নেই জ্যোতির্বলয়ের ব্যবহার, কিংবা শাসক-অভিজাতদের বিশ্ববিজেতা হিসেবে প্রতিফলিত করার চেষ্টা। রাজকীয় ভাবগাম্ভীর্যের পরিবর্তে বরং যেন গৃহাভ্যন্তরে অবসর যাপনের ছবিই প্রাধান্য পেয়েছে এখানে।

কিন্তু শিল্পীদের মননে-মানসে সেই ধারণাটি সুপ্ত হয়ে ছিল, সুযোগ পেয়ে তারা সেটার বহি:প্রকাশও ঘটিয়েছেন, বিশেষ করে পাণ্ডুলিপিচিত্রে। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালায় রক্ষিত *নল ওয়া দামান* পাণ্ডুলিপিটি[৭৯] এর উদাহরণ। ভারতীয় পুরাণের রাজা নল ও তাঁর পত্নী দময়ন্তীর বিয়োগান্তক প্রেমকাহিনীটিকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন আবুল ফয়েজ ফৈজি। ১৯০৪ সালে পাণ্ডুলিপিটি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সংগ্রহশালায় দান করেছেন মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবার। এটি লিখিত হয়েছিল দিল্লীতেই, কিন্তু পরবর্তীকালে এটি মুর্শিদাবাদের নবাবের সংগ্রহশালায় অন্তর্ভুক্ত হয় এবং খুব সম্ভবত সেখানেই এর ছবিগুলো চিত্রিত হয়। চিত্রগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় এঁকে আঠা দিয়ে লাগিয়ে নতুন করে বাঁধাই করা হয়েছে, যা দেখে বোঝা যায় যে ছবিগুলো পরবর্তীকালে সংযোজন করা হয়েছে।[৮০]

[৭৯] ক্যাটালগ ১৯২৫, নং সি ৩২৫

[৮০] Ratnabali Chatterjee, *From Karkhana to the Studio,* p 18., p. 38, fn 10.

এই পাণ্ডুলিপিতে কিংবদন্তির রাজা নল ও তাঁর স্ত্রী দময়ন্তীর জীবনকে ঘিরে নানা ঘটনার ছবি আঁকতে গিয়ে মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা যেন ফুটিয়ে তুলেছেন মুর্শিদ কুলি খানের দরবারকেই। এই পাণ্ডুলিপির যুদ্ধদৃশ্যগুলোও যেন আকবর-জাহাঙ্গীরের দরবারে চিত্রায়িত আকবরনামা পাণ্ডুলিপির অবিকল প্রতিচ্ছবি (চিত্র-২.৪)।

এছাড়াও আরো অন্তত দুটি পাণ্ডুলিপিকে মুর্শিদাবাদের চিত্রশালার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে বিবেচনা করা যায়। প্রথমটি ডাবলিনের চেস্টার বিটি সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত *দস্তর-ই হিম্মত*।[৮১] পাণ্ডুলিপিটি যে মুর্শিদাবাদের নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায়ই চিত্রিত হয়েছিল এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।[৮২] অন্য পাণ্ডুলিপিটি আসলে মুর্শিদাবাদে চিত্রায়িত নয়, চিত্রায়িত হয়েছিল মোরাদাবাদে, ১৭৬১ থেকে ১৭৬৩ সালের মধ্যে। মহাভারতের ফারসি সংস্করণ *রজমনামা*র এই পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করেছিলেন স্যার এলিজা ইমপে; এর তিনটি ভলিউমে তাঁর ১৭৭৫ সালের সিলমোহর রয়েছে।[৮৩] বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংগৃহিত পাণ্ডুলিপিটির শেষ দিকের কয়েকটি ছবিতে মুর্শিদাবাদ রীতির ছাপ লক্ষ্য করেছেন লস্টি। তিনি এই পাণ্ডুলিপিটির বেশ কয়েকটি ছবি প্রকাশও করেছেন। এর মধ্যে একটি ছবিতে ধৃতরাষ্ট্র, কুন্তি ও গান্ধারীকে জঙ্গলে একজন ঋষির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেখা যাচ্ছে (চিত্র ২.৫)। ছবিটিতে ঋষি ও তাঁর সঙ্গীরা এবং ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁর সঙ্গীরা মুখোমুখি বসে আছেন, কিন্তু কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছেন বলে মনে হয় না। দৃষ্টিহীন

---

[৮১] পা-ুলিপিটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, L.Y. Leach,, *Mughal and Other Indian Paintings in the Chester Beatty Library,* London: Scorpion Cavendish, 1995.

[82] J.P. Losty, 'Painting at Murshidabad 1750-1820' in *Murshidabad: Forgotten Capital of Bengal*, ed. Neeta Das and Rosie Llewellyn-Jones, Mumbai: Marg Foundation, 2014, pp. 82-105

[৮৩] ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ নং এমএস ৫৬৪০।

ধৃতরাষ্ট্রের হাঁটুতে চিবুক রেখে বসা চিন্তাক্লিষ্ট চেহারাসহ অঙ্কনরীতিতে মুঘল রীতির ছাপ, কিন্তু ছবির সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ তাঁর পিছনের গাছের সারি। সেখানে প্রত্যেকটি গাছকে নিখুঁত ডিটেইলসহ এঁকেছেন শিল্পী, কিন্তু সেই অঙ্কনরীতিতে ইউরোপীয় ধারার রিয়েলিজমের কোনো ছাপ নেই, আছে মুঘল পরম্পরায় ঘন জলরঙে আঁকার চেষ্টা। এরসঙ্গে বরং সমসাময়িককালের রাজপুত রীতির মিল দেখতে পেয়েছেন লস্টি।[৮৪]

স্যার ইমপের সঙ্গেই জড়িত আরেকটি পাণ্ডুলিপির কথাও এই সূত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যদিও সেটি আরেকটু পরের দিকের বলে হয়তো কোম্পানি চিত্রকলার সঙ্গেই আলোচিত হওয়া উচিত ছিল। ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী *রামায়ণ* এর এই পাণ্ডুলিপিটি বর্তমানে রয়েছে ব্রিটিশ লাইব্রেরির সংগ্রহে।[৮৫] সরাসরি ইমপের তত্ত্বাবধানে চিত্রিত হলেও এর অঙ্কনরীতিতে ব্রিটিশ চিত্ররীতির কোনো ছাপ নেই, মুঘল ঘরানায় প্রশিক্ষিত শিল্পীরাই এটির অলঙ্করণের কাজ করেছেন। এই পাণ্ডুলিপিটির একটি ছবিতে লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পনখার নাক কেটে নেয়ার দৃশ্য অঙ্কিত হয়েছে। মুঘল পাণ্ডুলিপির মতোই হাশিয়া-সজ্জিত করে ছবিটি বিন্যস্ত হলেও এতে রঙ ও প্রতিকৃতি চিত্রনে বাংলার প্রচলিত পটচিত্রধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[৮৬] ছবিটিতে স্পষ্ট দুটি ভাগ রয়েছে, ওপরের অংশে মূল ঘটনাটি বর্ণীত হয়েছে, নিচের অংশে রাম এবং লক্ষ্মণ লড়াই করছেন সাধারণ রাক্ষস-সৈনিকদের বিরুদ্ধে (চিত্র ২.৬)।

মুঘল শিল্পীদের এই পরম্পরাগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ইউরোপিয় রীতির সংমিশ্রণের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে যায় এই সময় থেকেই। মুর্শিদাবাদ থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে কাশিমবাজারে ইংরেজ ও ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া

---

[৮৪] J.P. Losty, 'Painting at Murshidabad 1750-1820' pp. 82-105

[৮৫] ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ নং ৫৭২৫ (নতুন)

[৮৬] J.P. Losty, 'Painting at Murshidabad 1750-1820' pp. 82-105

কোম্পানির বাণিজ্য কুঠি ছিল। ইউরোপিয়দের সঙ্গে বাণিজ্য করে এই সময় সম্পদে ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করে স্থানীয় একটি বণিক শ্রেণী, আবির্ভাব হয় এক নয়া অভিজাততন্ত্রের। এদের বেশিরভাগই ছিলেন হিন্দু, সঙ্গে ছিলেন আর্মেনিয় ব্যবসায়ীরাও। নবাবের দরবারের আভিজাত্যকে অনুকরণ করতে এরাও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা দিতে শুরু করেন। কিন্তু আবার ইউরোপিয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরে তাঁদের রুচিতেও সাহেবি প্রভাব পড়তে শুরু করে। ব্রিটিশদের ড্রইংরুমে সংগৃহিত ছবি দেখে ইউরোপিয় ছবির কায়দা-কৌশল শিখতে শুরু করেন স্থানীয় শিল্পীরাও।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা বণিক থেকে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে এই ধারা আরো বেগবান হয়। এ সময় গুরুত্ব হারাতে শুরু করেন নবাবরা। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের সভাসদদেরও অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে, ফলে মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের খুঁজতে হয় নতুন পৃষ্ঠপোষক। আর এ ভূমিকায় আবির্ভুত হন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা। মুর্শিদাবাদকে ঘিরেই শুরু হয়েছিল কোম্পানি চিত্রকলার যাত্রা, তবে বাংলার রাজধানী হিসেবে কলকাতা নগরীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ চিত্রকলার কেন্দ্রও সরে গেছে কলকাতায়। অশোক ভট্টাচার্য তাই বাংলা চিত্রকলার কোম্পানি-শৈলীকে দুটি পর্বে ভাগ করেছেন, মুর্শিদাবাদ পর্ব ও কলকাতা পর্ব।[৮৭] সমসাময়িককালে ঢাকার নায়েব নাজিমগণ, নওয়াব পরিবার এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে সখ্যের সূত্রে গড়ে ওঠা নব্য অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায়ও চিত্রকলার চর্চা হয়েছে, এবং সে সব ছবিতেও উল্লেখিত দুটি ধারারই ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।

মুর্শিদ কুলি খান ও আলিবর্দী খানের আমলে নবাবী পৃষ্ঠপোষকতায় চিত্রকলা চর্চার উদাহরণ আগেই দেওয়া হয়েছে। আলিবর্দী খানের পর ক্ষমতায় বসা

[৮৭] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পৃ. ৬২-৭৯

তাঁর দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা নানার মতো নিস্কলুস চরিত্রের অধিকারী ছিলেন না। সুরা ও নারীর প্রতি তাঁর আসক্তি নিয়ে ইতিহাসে অনেক বিতর্ক রয়েছে, কিন্তু তাঁর চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্যের বেশ খানিকটা ছাপ পাওয়া যায় সমকালীন চিত্রকলায়। সিরাজের পৃষ্ঠপোষকতায় মুর্শিদাবাদের ছবিতে যোগ হতে থাকে নতুন নতুন অনুসঙ্গ–রাগমালা সিরিজের চিত্রায়ন যার অন্যতম। সিরাজউদ্দৌলার সময়ে ও তাঁর পরবর্তীকালে মুর্শিদাবাদে একাধিকবার চিত্রায়িত সঙ্গীত বিষয়ক এ চিত্রমালার অনেকগুলো ছবি বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। এসব ছবির কোনো কোনোটিতে নায়কের চরিত্র-চিত্রায়ন করতে গিয়ে চিত্রকররা স্বয়ং নবাব সিরাজউদ্দৌলারই ছবি এঁকেছেন।[৮৮] সিরাজউদ্দৌলা অত্যন্ত রূপবান পুরুষ ছিলেন, তাঁর সমালোচক ঐতিহাসিকরাও সেটা স্বীকার করেছেন। তাঁর এবং তাঁর সঙ্গিনী নায়িকাদের রূপায়নে তাই অন্য রকম এক সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটাতে শুরু করলেন শিল্পীরা। শুধু তা-ই নয়, রাগমালার বিভিন্ন রাগের উপযুক্ত সময় ও পরিবেশের প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে ছবির পশ্চাৎপটের দিকেও নজর দিতে হলো শিল্পীদের, কখনো গুরুমেঘে ঢাকা আকাশ, কখনো প্রথম সূর্যকিরণে ঝলমল করে ওঠা ভোর, কখনো বা সন্ধ্যার মৃদু আলোয় বিচ্ছুরিত হতে লাগলো ছবির পশ্চাৎপট। মুঘল ঘরানার ছবিতে পশ্চাৎপট ছিল গৌণ বিষয়, কিন্তু ঠিক সমকালীন যুগে ইউরোপজুড়ে চলছিল রোমান্টিকতায় আচ্ছন্ন প্রকৃতি-দৃশ্য রূপায়নের প্রবণতা। ইউরোপিয়ানদের কাছে দেখা ল্যান্ডস্কেপ পেইন্টিং থেকে জ্ঞাতসারে হোক বা নিজেদের অজান্তেই হোক মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা গ্রহণ করেছিলেন পশ্চাৎপট রূপায়নের কৌশল। সিরাজের দরবারে চিত্রায়িত রাগমালা সিরিজের অনেকগুলো ছবি কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম বিচারপতি স্যার এলিজা ইমপের বিদুষী স্ত্রী লেডি মেরি ইমপের সংগৃহ

[৮৮] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পৃ. ৫৯

করেছিলেন। ছবিগুলি এখন লন্ডনের লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম এবং ব্রিটিশ লাইব্রেরির সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এছাড়াও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের কয়েকটি সংগ্রহশালায় রাগমালা সিরিজের আরো কিছু ছবি পাওয়া গেছে। ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত এ সিরিজের একটি ছবিতে গুজ্জরি রাগিনী চিত্রায়ন করতে গিয়ে আঁকা হয়েছে খোলা ছাদে তানপুরা হাতে বসে গাইতে থাকা এক রমনীকে (চিত্র ২.৭)।[৮৯] দৃশ্যপটে মুর্শিদাবাদের ছবির চেনা আবহ, নিচু রেলিং ঘেরা খোলা ছাদ। তবে তার পেছনের ভূমিদৃশ্যে পাহাড়, গাছ-পালা ও নদী, নদীতীরে দাঁড়ানো বকের সারিও দৃশ্যমান। মুঘল ঘরানারই গুয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা ছবিটি, এমনকি পশ্চাদপটের গাছ ও নদীর রূপায়নও মুঘলছবির মতোই। কিন্তু লক্ষ্যণীয়, গাছের পাতার ফাঁকে যে আলোছায়ার খেলা দৃশ্যমান, সেটা একেবারেই ইউরোপিয় ধারার। এই ছবিতে শেডিং ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিল্পী অবশ্য বাস্তবতার ছাপ রাখতে পারেননি, শুধু গাছের পাতার ফাঁকেই আছে আলোছায়ার খেলা, ছবির মূল চরিত্রের কোথাও এর ছাপ নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় রক্ষিত আরো পরের দিকের একটি ছবিতে এই শেডিংয়ের ব্যবহারে পরিণতির ছাপ লক্ষ্যণীয় (চিত্র ২.৮)। রামকারী রাগিনী শীর্ষক এ ছবিতেও একটি তাকিয়ার ওপর বসে আছে নায়িকা, তার সামনে হাঁটু গেড়ে ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিমায় নায়ক।[৯০] কিন্তু এর প্রেক্ষাপট সেই প্রাসাদের রেলিং ঘেরা খোলা ছাদ নয়, প্রাচীরঘেরা একটি বাড়ির আঙ্গিনা। পেছনের ঘরটির ছাদের দুই স্তর বিশিষ্ট ছজ্জার ফাঁকে যেমন নিখুঁতভাবে ফেলা হয়েছে শেড, তেমনি হাল্কা শেড খুঁজে পাওয়া যাবে দেয়ালের গায়ের যথাযথ স্থানে এমনকি নায়িকার বসার

[৮৯] Victoria & Albert Museum, London, Museum No: IS-71 : 1954

[৯০] J. P. Losty, *Indian Painting 1580-1880,* Catalogue of Exhibition held on 15-22 March, 2013 in New York, p 42, picture 22

তাকিয়ার চাদরের ওপর বালিশের আর তাকিয়ার নিচে ঝুলে থাকা চাদরের ছায়াও নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জে.পি. লস্টি অনুমান করেছেন এ ছবিটি খুব সম্ভব ১৭৬০ থেকে ১৭৭০ সালের মধ্যে আঁকা।[৯১]

পলাশীর যুদ্ধ মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পুরো পাল্টে দিলেও ১৭৬৫ সালে ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক দিওয়ানি লাভের আগে পর্যন্ত রাজধানী ছিল এই শহরেই, আর নামেমাত্র হলেও নবাবরা ছিলেন। কোম্পানির আনুকুল্যে নবাবী পেলেও মীর জাফর এবং মীর কাশিম পূর্বতন নবাবদের মতোই দরবার পরিচালনা করতেন, জাঁক-জমকেও তাঁদের অনুকরণ করতেন। চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতাও এর ব্যতিক্রম ছিল না। নবাব মীর জাফরের বেশ কয়েকটি প্রতিকৃতি বর্তমানে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। অশোক ভট্টাচার্য এর মধ্যে দুটি ছবির বর্ণনা দিয়েছেন।[৯২] একটিতে মীর জাফর ও তাঁর পুত্র মীরন শিকারের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে ঘোড়ায় চড়ে সৈন্য সমাবেশ পরিদর্শন করছেন, অন্যটি ভাগিরথীর তীরে একাকী দ-ায়মান মীর জাফরের ছবি। এর মধ্যে প্রথম ছবিটিতে শিল্পী হিসেবে লখনৌ থেকে আগত পুরাণনাথ ওরফে হুনহার-এর সিলমোহর রয়েছে (চিত্র ২.৯)।[৯৩] মীর কাশিমের আমলে লখনৌ থেকে মুর্শিদাবাদের দরবারে শিল্পীদের আগমণের ধারা আরো বেগবান হয়। উইলিয়াম ফুলারটন নামে একজন ইংরেজ শল্যচিকিৎসক মীর কাসিমসহ তাঁর দরবারের অনেক অভিজাতবর্গের চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেছিলেন। মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ৪৬টি ছবি তিনি সংগ্রহ করেছিলেন, যেগুলো বর্তমানে রয়েছে লন্ডনের

---

[৯১] J. P. Losty, *Indian Painting 1580-1880,* p. 32

[৯২] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পৃ. ৫৯

[৯৩] Victoria & Albert Museum, London, Museum No: IM.13-1911

ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে।[৯৪] ছবিগুলো তিনি কীভাবে সংগ্রহ করেছিলেন তা অবশ্য জানা যায় না, বেশির ভাগ ছবির শিল্পীর নামও অজ্ঞাত। এই ছবিগুলোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ নবাব মীর কাশিমের সময়কাল, অর্থাৎ ১৭৬০ থেকে ১৭৬৩ সালের মধ্যে আঁকা। এর মধ্যে একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে দরবারে বসে একজন হিন্দু অভিজাতের সঙ্গে কথা বলছেন নবাব মীর কাশিম (চিত্র ২.১০)।[৯৫] ছবির দৃশ্যপট যথারীতি মুর্শিদাবাদের চিরপরিচিত, নিচু প্রাচীর ঘেরা খোলা ছাদে, চাঁদোয়ার নিচে নবাবের আসন। হাতে গড়গড়ার নল ধরে কথা বলছেন নবাব, পশ্চাদপটে ভাগিরথী নদী। একই রকম আরেকটি ছবিতে নবাবের জায়গায় দেখা যাচ্ছে একজন অভিজাত ব্যক্তিকে। তাঁকে মীর কাশিমের আর্মেনিয় সেনাপতি গুরগিন খান বলে শনাক্ত করা হয়েছে (চিত্র ২.১১)।[৯৬]

এই দ্বিতীয় ছবিটি সমকালীন চিত্রকলার আরেকটি দিক উন্মোচিত করছে। দরবারি জাঁক-জমক কমে আসায় নবাব মীর জাফরের সময়কাল থেকেই অবশ্য মুর্শিদাবাদের শিল্পীরাও বিকল্প পৃষ্ঠপোষকের সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন। সেটা পেয়েও যান তাঁরা–ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্কের সূত্র ধরে হঠাৎ করে বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়ে ওঠা স্থানীয় অভিজাতবর্গের মধ্যে। এদের অনেকেই ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় আঁকা ছবিতে বিষয়বস্তু হিসেবে কখনো পৌরাণিক কাহিনী, কখনো বা একেবারেই গ্রামীণ দৃশ্যের অবতারণা পাওয়া যায়।

---

[৯৪] Fulerton Collection, Victoria & Albert Museum, London, Museum No: IM-33 : ১৯১২. পরবর্তী অধ্যায়ে এই সিরিজের ছবিসমূহ নিয়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। দ্রষ্টব্য, পৃ. .....

[৯৫] Victoria & Albert Museum, London, Museum No: D.1178-1903

[৯৬] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পৃ. ৬০

ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত এ রকম চারটি ছবির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম ছবিটিতে অঙ্কিত হয়েছে পৌরাণিক দৃশ্য, কিন্তু খোলাছাদে শামিয়ানার নিচে রামের দরবারের দৃশ্যও মনে করিয়ে দিচ্ছে মুর্শিদাবাদের ছবির চিরপরিচিত দরবার দৃশ্যের কথা (চিত্র ২.১২)।[৯৭] দ্বিতীয়টিতে খোলাছাদে জাজিমের ওপর বসে নৃত্য উপভোগ করছেন একজন হিন্দু অভিজাত (চিত্র ২.১৩)।[৯৮] এ দুটি ছবিই চিরায়ত মুঘল রীতিতে আঁকা, কিন্তু তৃতীয় ছবিটির দৃশ্যপট একেবারেই অন্য রকম (চিত্র ২.১৪)। এই ছবিটির বিন্যাস আনুভূমিক এবং এতে আঁকা হয়েছে একটি আশ্রমে যোগী ও যোগিনীর সঙ্গে দেখা করতে আসা এক রমনীর ছবি।[৯৯] নদীতীরের আশ্রম, সেখানে যে ঘরের সামনে বসে আছেন যোগী ও যোগিনী, সেটি ইউরোপিয় কোম্পানির কুঠি-বাড়ির স্টাইলে টালি দিয়ে আচ্ছাদিত। ঘরের সামনের নদীর ঘাটে ময়ূরপঙ্খী নৌকা থেকে নামছেন অভিজাত রমনীটি। ঘরের দরজায় আলোছায়ার খেলা পূর্বোক্ত রাগমালার ছবিটির কথা মনে করিয়ে দেয়, তবে তারচেয়েও বেশি করে লক্ষ্যণীয় এ ছবির পশ্চাৎপটের ভূমিদৃশ্য, যেখানে ইউরোপিয় রীতির রৈখিক পরিপ্রেক্ষিতের সাহায্যে আঁকা হয়েছে আদিগন্ত বিস্তৃত নদী আর তার ওপরে টুকরো টুকরো মেঘে ছাওয়া আকাশ। গাছের ফাঁক দিয়ে মেঘের উঁকি দেওয়া যে ফটোগ্রাফিক ত্রিমাত্রিকতার আভাস দিচ্ছে, মুর্শিদাবাদের প্রথম দিকের ছবিতে তা ছিল বিরল। এ ছবির রঙের ব্যবহারেও বৈচিত্র আছে, মুঘল ঘন জলরঙের সঙ্গে এতে ইউরোপিয় স্টাইলের স্বচ্ছ জলরঙও ব্যবহৃত হয়েছে।

[৯৭] Victoria & Albert Museum, London, Museum No: D.357-1908

[৯৮] Victoria & Albert Museum, London, Museum No: IM.246-1921

[৯৯] Victoria & Albert Museum, London, Museum No: IS.14-1955

নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্ট-এ সংরক্ষিত মুর্শিদাবাদের জনৈক অভিজাত ব্যক্তির প্রতিকৃতিতেও পশ্চাৎপটের ভূমি দৃশ্যে একই রকম মেঘের কারুকাজ লক্ষ্যণীয় (চিত্র ২.১৫) । ওপরের অংশের এই মেঘমালাকে বাদ দিলে এই ছবিটির বিন্যাস হুবহু মুঘল ঘরানার, থ্রি কোয়ার্টার প্রোফাইলে দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে শুরু করে পোশাক-আশাক সবকিছুই মুঘল বাদশাহদের প্রতিকৃতিকে মনে করিয়ে দেয় । কিন্তু মুঘল প্রতিকৃতির সঙ্গে এর পার্থক্যটাও লক্ষ্যণীয়, বিশ্ববিজেতা এবং অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে মুঘলরা তাঁদের ছবিতে যেসব প্রতীক ব্যবহার করতেন, তার কোনোটাই নেই এতে । তাছাড়া তাঁর দাঁড়ানোর জায়গাটি মুর্শিদাবাদের ছবির সেই চির পরিচিত রেলিং ঘেরা খোলা ছাদ । বলা যায়, মুঘল আর মুর্শিদাবাদী প্রতিকৃতির এক সংশ্লেষণ খুঁজে পাওয়া যায় এতে ।

ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের শেষোক্ত ছবিটিতে আঁকা হয়েছে একটি গ্রামীণ দৃশ্যপটে একটি পুকুর ঘাটে গাছের নিচে এক নারীর চুল শুকানোর দৃশ্য (চিত্র ২.১৬) ।[১০০] দৃশ্যপটে নতুনত্ব থাকলেও এ ছবির অংকনরীতি অবশ্য মুঘল ঘরানারই । ঘন জলরঙেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সন্ধ্যার আলো-আঁধারি ।

পলাশী পরবর্তী যুগের মুর্শিদাবাদে পৃষ্ঠপোষকদের তালিকায় কেবল যে নবাবের দরবারের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ কিংবা এ দেশীয় নব্য অভিজাত জমিদার বা ব্যবসায়ীরাই ছিলেন, তা নয় । কোম্পানির ইংরেজ কর্মকর্তা-কর্মচারিরাও নবাবদের অনুকরণে চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন । নবাবের দরবারের অভিজাতদের মতো করেই তাঁরাও যে নিজেদের প্রতিকৃতি আঁকিয়ে নিতেন, তার প্রমাণ মেলে ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে সংগৃহিত

[১০০] Victoria & Albert Museum, London, Museum No: D.1184-1903

একটি ছবিতে।[১০১] ছবিতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সামরিক পোশাক পরা একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তাকে একটি নদীর তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে (চিত্র ২.১৭)। দৃশ্যপটটি একটু ভিন্ন হলেও মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা রেলিংঘেরা ছাদের ওপর দাঁড়ানো বা বসা অবস্থায় অভিজাতদের যে ছবি আঁকতেন, সে সব ছবিতে যেভাবে দিগন্তরেখা ফুটিয়ে তোলা হতো, এখানেও ঠিক সেভাবেই আঁকা হয়েছে তা। ছবির রঙের বিন্যাস থেকে শুরু করে কর্মকর্তাটি এবং তাঁর পেছন থেকে উঁকি দেয়া অল্পবয়সী একটি ছেলের দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের দরবারি রীতির ছাপ সুস্পষ্ট।

ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকদের জন্য মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা যে সব ছবি আঁকতেন, সেগুলো আঁকা হয়েছিল তাঁদের নিজস্ব শৈলী, মুঘল-রীতিতেই। ঘন জলরঙ বা এড়ঁধপযব রীতিতে, হাতে তৈরি বিশেষ ধরনের কাগজের ওপর আঁকা এ সব ছবির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়েছে মূলত মুঘল চরিত্র চিত্রায়ণ। তবে বাদশাহ বা নবাব এবং তাঁদের দরবারের অভিজাতবর্গের প্রতিকৃতির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়েছেন ইংরেজ সাহেবরাও। পূর্বোক্ত ফুলারটন সংগ্রহশালার একটি ছবিতে একজন মুঘল অভিজাতের সামনে তাঁর পুত্রদের বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। ছবিটির অংকনরীতি, এমনকি মোটিফেও মুর্শিদাবাদী শৈলীর ছাপ সুস্পষ্ট: চাঁদোয়ার নিচে, কার্পেটের ওপর বসে থাকা অভিজাত ব্যক্তিটির পোশাক-আশাক এবং বসার ভঙ্গিও মুঘল শৈলীর ছবিতে বহুল প্রচলিত। এ ছবিটির শিল্পীর নাম জানা যায় না। তবে পূর্বোক্ত শিল্পী দীপ চাঁদের আঁকা প্রায় এ রকমই একটি ছবিতে মুঘল অভিজাতদের ভঙ্গিতে দেখা যাচ্ছে একজন ইংরেজ সাহেবকে। কার্পেটের ওপরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে তিনি হুঁকো খাচ্ছেন। পোশাকে-আশাকে তাঁকে ইংরেজ হিসেবে চিনে নেওয়া যায়, তবে তাঁর সামনে পেছনের পরিচারকদের পোশাক মুঘল

[১০১] Victoria & Albert Museum, London, Museum No: IS.16-1955

ধরনের। শুধু মোটিফ বা বিষয়বস্তুতেই নয়, পৃষ্ঠপোষকদের রুচিবোধের সঙ্গে তাল মেলাতে এই সময়ের ছবিতে অংকন কৌশলেও ধীরে ধীরে ইউরোপীয় প্রভাব ফুটে উঠতে শুরু করে। ঘন জলরংয়ের পরিবর্তে স্বচ্ছ জলরং বার ওয়াটার কালারের ব্যবহার শুরু হয়, মুঘল ছবির দ্বিমাত্রিকতা ছাড়িয়ে আলো-ছায়া আর পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহারে ত্রিমাত্রিকতার আবহও ছড়াতে শুরু করে। ফুলারটন সিরিজেরই একটি ছবিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০২] জলরংয়ে আঁকা এ ছবিতে চন্দ্রালোকিত নিসর্গকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে শিল্পী চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন পরিপ্রেক্ষিত।

মুর্শিদাবাদের এই দরবারি রীতির অনুকরণে যে নবাবের দরবারের অভিজাতরাও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঢাকার নায়েব নাজিমদের তত্ত্বাবধানে চিত্রকলা চর্চার উদাহরণ থেকে। সমকালীন ঐতিহাসিক বর্ণনায় এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া না গেলেও উনিশ শতকে চিত্রায়িত বেশ কিছু চিত্র নিদর্শন পাওয়া গেছে। বর্তমানে ঢাকার জাতীয় জাদুঘরে এ রকম ৩৯টি ছবি আছে। ছবিগুলো এঁকেছেন আলম মুসাব্বির নামে একজন চিত্রকর এবং তাঁর কয়েকজন শিষ্য মিলে। আলম মুসাব্বির তাঁর ছবিগুলো 'নুসরাত শাহ'-এর জন্য আঁকা বলে উল্লেখ করেছেন। এই নুসরাত শাহ খুব সম্ভবত ঢাকার নায়েব নাজিম নুসরাত জং। মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দী খান নুসরাত জংয়ের নানা জাসারাত খানকে ১৭৫৫ সালে ঢাকার নায়েব নাজিম বা ডেপুটি সুবাহদার হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। নবাব মীর কাশিমের শাসনকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে দায়িত্ব পালন করে গেছেন। তবে মুর্শিদাবাদের নবাবদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের সময়ে জাসারত খান নবাবদের আদেশ অমান্য করে ইংরেজদের

[১০২] 'Moonlit Landscape'; দ্রষ্টব্য, Robert Skelton, 'Murshidad Painting', p. 19

সাহায্য করেছিলেন। সে কারণে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে্য ১৭৬৫ সালে মীর কাশিম তাঁকে বিহারে ডেকে পাঠিয়ে বন্দী করে রেখেছিলেন। বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয়ের পর স্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাউন্সিল জাসারত খানকে পুনরায় ঢাকার নায়েব নাজিম হিসেবে নিয়োগ দেয়। তাঁকে নবাব উপাধি দেয়া হয়। ১৭৯৯ সালে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর দৌহিত্র সৈয়দ মুহাম্মদ উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন, তাঁকে নবাব হাশমত জং উপাধি দেয়া হয়। ১৭৮৫ সালে তাঁর মৃত্যু হলে নুসরাত জং ঢাকার নবাব হিসেবে নিয়োগ পান এবং ১৮২২ সালে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নিজে তারিখ-ই নুসরাত জঙ্গি নামে একটি ইতিহাস গ্রন্থ লিখেছেন, যেটিকে ঢাকার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ আঁকরগ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে পূর্বসুরী জাসারাত খান ও হাশমত জংয়ের শাসনকাল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করলেও নিজের শাসনামল সম্পর্কে তিনি খুব বেশি কিছু লিখেননি। তাঁর বর্ণনাতেও নবাবদের তত্ত্বাবধানে চিত্রকলা চর্চার কোনো বিবরণ নেই। তবে তা সত্ত্বেও জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত চিত্রকর্মগুলো তাঁর আমলেই চিত্রায়িত হয়েছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।[১০৩] তারিখ-ই নুসরাত জঙ্গিসহ সমকালীন একাধিক বিবরণে ঢাকার নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় ঈদ ও মহররমের উৎসব উদযাপনের বর্ণনা পাওয়া যায়। আলম মুসাব্বির ও তাঁর শিষ্যদের আঁকা ছবিগুলোতে এই দুটি উৎসব উদযাপনের দৃশ্য রয়েছে। একটি ছবিতে ঢাকার নিমতলী দেউরির সামনে থেকে নবাবদের ঈদ মিছিল শুরুর দৃশ্য আঁকা হয়েছে (চিত্র ২.১৮)। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে এই মিছিলে অংশ নিত বলে জানা যায়। ছবিতেও তেমনটাই দেখা যাচ্ছে। জলরঙে আঁকা ছবিটির গুরুত্বপুর্ণ দিক হলো পশ্চাদপটে নিমতলী দেউরির অবস্থান। জাসারত খান ঢাকায় ফেরার পর তাঁর বাসস্থান হিসেবে এই

[১০৩] নাজমা খান মজলিস, *আলম মুসাব্বির*, বাংলাপিডিয়া, প্রথম খ-, পৃ. ...।

প্রাসাদটি তৈরি করা হয়েছিল ১৭৬৬ সাল নাগাদ। তবে ১৮২৪ সালে বিশপ হেবার ঢাকায় এসে দেখেছিলেন নিমতলী দেউরি জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। এই ছবিতে নিমতলী দেউরিকে ঝকঝকে চেহারায় আঁকা হয়েছে, আবার ছবিটি অঙ্কনে মুঘল ঘরানার ঘন জলরঙের পরিবর্তে ইউরোপীয় ঘরানার স্বচ্ছ জলরঙ পদ্ধতির ব্যবহারও লক্ষ্যণীয়। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করে অনুমান করা হয় এই ছবিটিসহ এই সিরিজের ছবিগুলো সম্ভবত উনিশ শতকের গোড়ার দিকে আঁকা হয়েছিল।

এই সিরিজের অন্য একটি ছবিতে আঁকা হয়েছে মহররমের তাজিয়া মিছিল (চিত্র ২.১৯)। এই ছবিটির পশ্চাদপটে আঁকা হয়েছে ঢাকায় শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামবাড়া হোসেনী দালান। পূর্বোক্ত ছবিটির তুলনায় এটিতে অনেক বেশি উজ্জ্বল রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, বিশেষ করে সিঁদুরে লালরঙের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। হাতে তৈরি ২২ ইঞ্চি × ২৮ ইঞ্চি মাপের কাগজের ওপর ইউরোপীয় ঘরানার কালারওয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা হলেও ছবিগুলোতে যে রঙ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো সম্ভবত ব্রিটেন থেকে আমদানি করা কেমিকেল রঙ নয়, বরং এগুলো দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়েছিল। উপরোক্ত বিষয়াবলী বিবেচনা করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে আলম মুসাব্বিরের এই ছবিগুলোতে বাংলার স্থানীয় রীতি এবং কোম্পানি আমলে বিকশিত ইউরোপীয় ঘরানার চিত্র-বৈশিষ্ট যুগপৎ ব্যবহৃত হয়েছিল। আঠারো ও উনিশ শতকে বাংলার দরবারি চিত্রকলার ধারাও যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাচ্ছিল, এ ছবিগুলো সে সত্যিটাকেই তুলে ধরছে।

ঢাকার এই ছবিগুলো যখন আঁকা হচ্ছে, তার আগেই অবশ্য বাংলার চিত্রকলায় অন্য রকম একটি যুগান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৭৬৪ সালে মুর্শিদাবাদের নবাবের কর্তৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্ত হওয়ার পর বাংলার শাসন কেন্দ্র মুর্শিদাবাদ থেকে চলে যায় কলকাতায়। নতুন রাজধানী

হিসেবে নগর কলকাতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা চিত্রকলায়ও যুগাবসান ঘটে, নতুন পৃষ্ঠপোষকদের রুচিবোধের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়ে ওঠে কোম্পানি চিত্রকলার ধারা। অংকন রীতি, কৌশল আর মোটিফ, সব কিছুই এ সময় পরিবর্তিত হয়, ধীরে ধীরে বাংলা চিত্রকলা প্রবেশ করে আধুনিকতার যুগে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের ছবি দিয়েই আসলে খুব সন্তর্পণে শুরু হয়েছিল এই আধুনিকায়নের ধারা। মুঘল ঘরানা ছেড়ে ইউরোপিয় ঘরানায় রূপান্তরের বীজ মুর্শিদাবাদের চিত্রকররা হয়তো বপন করেছিলেন নিজেদের অজান্তেই, পশ্চাৎপটের ভূমিদৃশ্য রূপায়নে, আলো-ছায়ার ব্যবহারে এবং তারপর ধীরে ধীরে ঘন জলরঙ ছেড়ে স্বচ্ছ জলরঙ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার সতর্ক পর্যালোচনা থেকে সেটি প্রমাণিত হয়।

চিত্র ২.১ নবাব মুর্শিদ কুলি খানের দরবার (শিল্পী: অজ্ঞাত)
ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, লন্ডন (সংগ্রহ নং আইএস ১৩৩৬/এ–১৯৬৪)

চিত্র ২.২ নবাব আলিবর্দী খানের প্রতিকৃতি
শিল্পী: অজ্ঞাত, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, সংগ্রহ নং ডি১২০১-১৯০৩

চিত্র ২.৩ নবাব আলিবর্দী খানের হরিণ শিকার
শিল্পী: অজ্ঞাত, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, সংগ্রহ নং ডি ১১৯৯-১৯০৩

চিত্র ২.৪ যুদ্ধের দৃশ্য : নল ওয়া দামান পা-ুলিপি (ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল সংগ্রহশালা, কলকাতা, বাঁয়ে) এবং আকবরনামা পা-ুলিপি (ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ২:১০৮-১৮৯৬, ডানে)

চিত্র ২.৫ জঙ্গলে ঋষির আশ্রমে ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তি
ইমপে *রজমনামা*, ব্রিটিশ লাইব্রেরি এমএস ৫৬৪০, ফোলিও ৩৮৪ ভি।

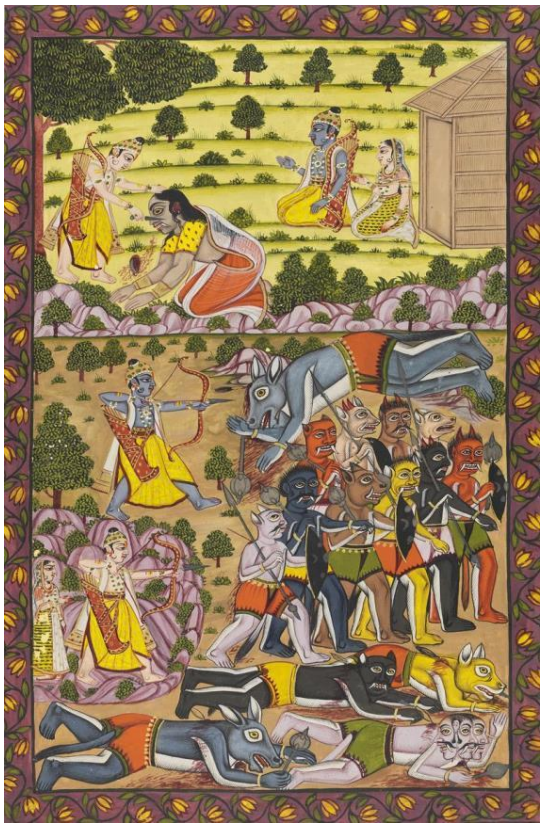

চিত্র ২.৬ শূর্পনখার নাসিকা কর্তন
ইমপে রামায়ণ, ১৭৭০–৮০
ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ
সংগ্রহ নং

চিত্র ২.৭ গুজ্জরি রাগিনী (ইমপে রাগমালা)
ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং
আইএস ৭১–১৯৫৪

চিত্র ২.৮ রামকারী রাগিনী (রাগমালা সিরিজ)
ব্যক্তিগত সংগ্রহ, ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

চিত্র ২.৯ মীর জাফর ও মিরনের সৈন্য সমাবেশ পরিদর্শন
শিল্পী: পুরাণনাথ ওরফে হুনহার, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএম ১৩-১৯১১

চিত্র ২.১০ নবাব মীর কাশিমের প্রতিকৃতি
শিল্পী: দীপ চাঁদ, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম
সংগ্রহ নং ১১৭৮-১৯০৩

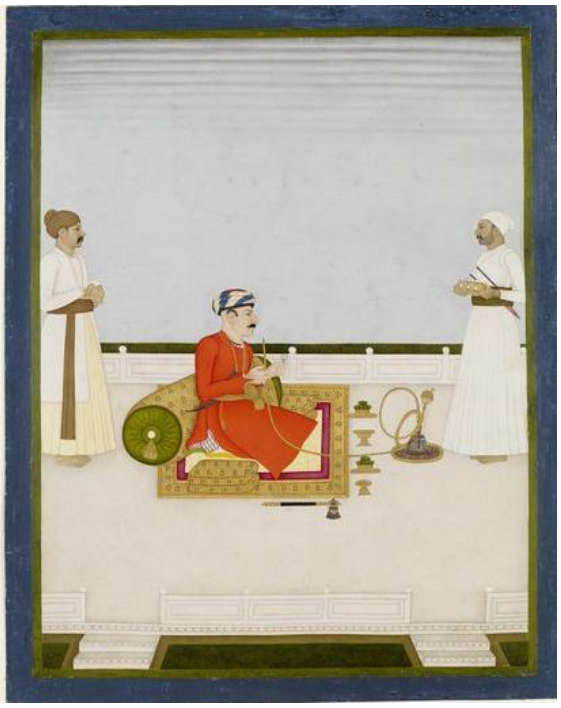

চিত্র ২.১১ মীর কাশিমের সেনাপতি গুরগিন খান
শিল্পী: দীপ চাঁদ, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম
সংগ্রহ নং ১১৮০-১৯০৩

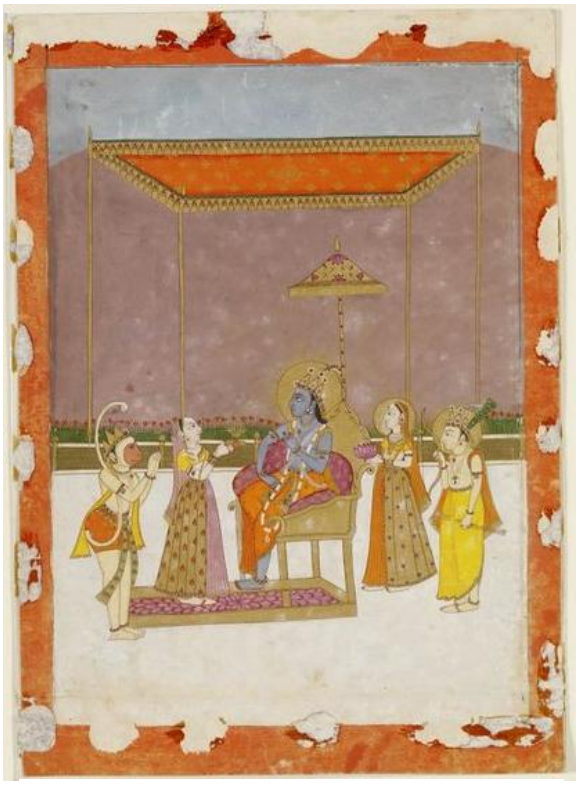

চিত্র ২.১২ রামের দরবার, *বিচ্ছিন্ন মিনিয়েচার*
শিল্পী: অজ্ঞাত, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম
সংগ্রহ নং ডি-৩৫৭-১৯০৮

চিত্র ২.১৩ নৃত্য উপভোগ করছেন জনৈক অভিজাত, *বিচ্ছিন্ন মিনিয়েচার*
শিল্পী: অজ্ঞাত, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, সংগ্রহ নং আইএম ২৪৬-১৯২১

চিত্র ২.১৪ আশ্রমে যোগী-যোগিনীর সান্নিধ্যে নারী
শিল্পী: অজ্ঞাত, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, সংগ্রহ নং আইএস ১৪-১৯৫৫

চিত্র ২.১৫ মুর্শিদাবাদের জনৈক অভিজাত
শিল্পী: অজ্ঞাত, মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্ট, নিউ ইয়র্ক

চিত্র ২.১৬ চুল শুকানো
ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, সংগ্রহ নং : ডি ১১৮৪–১৯০৩

চিত্র ২.১৭ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাপতির প্রতিকৃতি
ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, সংগ্রহ নং : আইএস ১৬–১৯৫৫

চিত্র ২.১৮ ঢাকার নবাবদের ঈদ উৎসব
শিল্পী: আলম মুসাব্বির, সময়কাল উনিশ শতক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ
সংগ্রহ নং

চিত্র ২.১৯ ঢাকায় মহররমের তাজিয়া মিছিল
শিল্পী: আলম মুসাব্বির, সময়কাল উনিশ শতক
বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর সংগ্রহ
সংগ্রহ নং

তৃতীয় অধ্যায়

অভিজাত চিত্রকলা: কোম্পানি শৈলী

ব্রিটিশ শাসন শুরুর ঠিক আগে বাংলার রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদে। অর্ধ শতাব্দী ধরে বিকাশমান মুর্শিদাবাদ নগরীতে মুঘল চিত্রকলার পরম্পরা অনুসরণ করে কীভাবে নতুন একটি চিত্রভাষা গড়ে উঠেছে, পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, যে মুর্শিদাবাদ চিত্রকলা ছিল মুঘল দরবারি চিত্রকলারই অনুরণন, আর তার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল মুর্শিদাবাদের দরবারকে কেন্দ্র করে। মুর্শিদাবাদের নবাবগণ এবং তাঁদের অনুকরণে তাঁদের দরবারের নব্য বিকাশমান অভিজাতবর্গ ছিলেন এই চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক, তাঁদের অভিরুচি বাস্তবায়নেই মুঘল ধারায় প্রশিক্ষিত চিত্রকররা মুর্শিদাবাদে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। কিন্তু ১৭৫৭ সালের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হঠাৎ করে বদলে দেয় পরিস্থিতি। মুর্শিদাবাদের নবাবরা তখনো ছিলেন, কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর তাঁদের হাতে আর ক্ষমতা ছিল না, ছিল না তাঁদের অঢেল উপার্জন আর ইচ্ছেমতো খরচ করবার সামর্থ্যও। মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে তাঁরা বসতে পারছিলেন ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দয়ায়, তা-ও সেই সিংহাসনের অধিকার বজায় রাখা নিয়েই তাদের এত ব্যস্ত থাকতে হতো, যে আসলে চিত্রকলার মতো সুকুমার বৃত্তির দিকে নজর দেয়ার কোনো সুযোগই ছিল না। ১৭৬৪ সালের বক্সারের যুদ্ধ এবং ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী হস্তান্তরের পর তাঁদের নামমাত্র নবাবীরও অবসান ঘটে, নবাব পরিবারের সদস্যরা ক্ষমতা

হারিয়ে পরিণত হন পেনশনভোগীতে। খুব স্বাভাবিক, চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করার মতো পরিবেশ ও সামর্থ্য তাঁদের ছিল না।

তবে মুর্শিদাবাদের চিত্রকলা কিন্তু একেবারে হারিয়ে যায়নি। আসলে মুর্শিদাবাদে ছবির পৃষ্ঠপোষক তো কেবলই নবাব পরিবার ছিল না; সমসাময়িককালে মুর্শিদাবাদের দরবারকে ঘিরে যে নব্য অভিজাততন্ত্র বিকশিত হচ্ছিল তাদেরও একটি বড় ভূমিকা ছিল পৃষ্ঠপোষক হিসেবে। এই অভিজাততন্ত্রের বিকাশের নেপথ্যে আবার আঠারো শতকের গোড়ার দিক থেকেই কাজ করে আসছিল আরেকটি অনুঘটক- বাণিজ্য। নবাবী বাংলার রাজধানী থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে কাশিমবাজারে ইংরেজ ও ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য কুঠি ছিল, চুঁচুড়ায় ছিল ডাচ কোম্পানির কুঠি। বাংলার সঙ্গে বাণিজ্য এমনই লোভনীয় ছিল, যে এই সময় ইউরোপের আরো অনেক দেশের বণিকরাই এই বাজারটি ধরার চেষ্টা করছিল। দিনেমার, এমনকি বেলজিয়ানরাও কোম্পানি খুলে বাণিজ্য শুরু করেছিল বাংলার সঙ্গে। এই বাণিজ্যের সূত্র ধরে বাংলায় গড়ে উঠছিল একটি নতুন ধনিক শ্রেণী, যাদের পেশা ছিল ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যসত্ত্বভোগী হিসেবে কাজ করা। ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর বেশিরভাগই বাণিজ্য করতো মূলত দাদনের মাধ্যমে। এদেশের কৃষক ও বিশেষ করে তাঁতীদের কাছ থেকে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য কিনতো তারা, এমনিতেই দারুণ সস্তা এই পণ্য আরো সস্তায় কিনতে তারা প্রতিযোগিতা করে দাদন দিত উৎপাদকদের–তাদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে উৎপাদিত দ্রব্য তাদের কাছেই বিক্রি করতে হতো উৎপাদকদের। এই প্রক্রিয়াটিতে দুই পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের কাজটি করে একদল লোক হঠাৎ করেই অনেক সম্পত্তির মালিক হয়ে উঠেছিল।

বাংলায় বাণিজ্য নিয়ে লড়াই ছিল বহু পক্ষের মধ্যে। কিন্তু সেই লড়াইয়ে নানা কারণে ইংরেজরাই ছিল সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে। মুঘলদের কাছ থেকে বাৎসরিক মাত্র তিন হাজার টাকা থোক পিশকাশের বিনিময়ে সারা দেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েছিল তারা, এই অধিকারের অপব্যবহার নিয়ে বাংলার সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে দেন-দরবার করতে হলেও ছলে-বলে-কৌশলে সেটি ঠিকই ব্যবহার করে যাচ্ছিল তারা। আর এ কাজে তাদের সহায়তা করে যাচ্ছিল ওই মধ্যস্বত্ত্বভোগী শ্রেণীটি। পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের নেপথ্যেও ছিল সেই শক্তির ভূমিকা, যারা মনে করতো নবাবদের চেয়ে ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা গেলে তারা বেশি লাভবান হবে। নবাবী আমল থেকেই এই শ্রেণীটি সম্পদে ফুলে-ফেঁপে উঠতে থাকে, আর অবধারিতভাবেই নিজেদের আভিজাত্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতাকেও বেছে নেয়।

পলাশীর যুদ্ধের পর একই ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারাও। 'নবাবী' হাল গ্রহণের সব রকমের চেষ্টাই তারা করেছেন, এই দেশে থাকতে তো বটেই এমনকি দেশে ফিরে যাওয়ার পরও অনুসরণ করেছেন নবাবদের জীবনাচরণ। পলাশীর যুদ্ধের পর এদেরই পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বেঁচে গিয়েছিল মুর্শিদাবাদের চিত্রকলা, যদিও পৃষ্ঠপোষকের রুচির সঙ্গে বদলে গিয়েছিল তার চিত্রভাষাও। নতুন ধারার এই চিত্রকলাই সাধারণত কোম্পানি চিত্রকলা নামে পরিচিত।

কাশিমবাজারের কুঠি আর নিকটবর্তী মুর্শিদাবাদ নগরীকে ঘিরেই শুরু হয়েছিল কোম্পানি চিত্রকলার যাত্রা, তবে বাংলার রাজধানী হিসেবে কলকাতা নগরীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ চিত্রকলার কেন্দ্রও সরে গেছে কলকাতায়। পৃষ্ঠপোষকদের ভাবনার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে শুধু চিত্রশালার অবস্থান চিত্রভাষাই নয় বদলে গেছে অঙ্কন কৌশলও। অশোক ভট্টাচার্য তাই বাংলা

চিত্রকলার কোম্পানি-শৈলীকে দুটি পর্বে ভাগ করেছেন, মুর্শিদাবাদ পর্ব ও কলকাতা পর্ব।[১০৪] সমসাময়িককালে ঢাকার নায়েব নাজিমগণ, নওয়াব পরিবার এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে সখ্যের সূত্রে গড়ে ওঠা নব্য অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায়ও চিত্রকলার চর্চা হয়েছে, এবং সে সব ছবিতেও উল্লেখিত দুটি ধারারই ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।

আধুনিকায়নের এই ধারাটিকে বেগবান করতে সবচেয়ে জোরালো ভূমিকা রেখেছিলেন ইউরোপ থেকে ভাগ্য অন্বেষণে আশা শিল্পীরা। তাদের অনেকেই ছিলেন পেশাদার শিল্পী, তবে সৌখিন চিত্রকরদের সংখ্যাও একেবারে কম ছিল না। কিন্তু শুধু তাঁরাই নন, কোম্পানি চিত্রকলার বিকাশে অবদান রেখেছেন মুর্শিদাবাদ, এমনকি আশপাশের অন্যান্য মুঘল প্রাদেশিক শিল্পকেন্দ্রে দীক্ষা নেয়া স্থানীয় শিল্পীরা। কোম্পানির নানা কাজে এ সময় দেশীয় শিল্পী, বিশেষ করে নকশাবিদ বা ড্রাফটসম্যানদের নিয়োগ করা হতো। এই সব শিল্পীরা স্থানীয় চিত্রশৈলী, অর্থাৎ মুর্শিদাবাদী রীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তবে কোম্পানির কাজের প্রয়োজনে এদের অনেককে ইউরোপীয় ধারায় প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল। এভাবে পৃষ্ঠপোষকদের অভিরুচি বদলের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল বাংলা চিত্রকলায় পালা বদলের পালা। পূর্ববর্তী অধ্যায়েই বর্ণনা করা হয়েছে যে কোম্পানি আমলের চিত্রকলা চর্চার ইতিহাসকে দুটি পর্বে ভাগ করা হয়, মুর্শিদাবাদ পর্ব এবং কলকাতা পর্ব।

মুর্শিদাবাদ পর্ব

ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকদের জন্য মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা যে সব ছবি আঁকতেন, সেগুলো আঁকা হয়েছিল তাঁদের নিজস্ব শৈলী, মুঘল-রীতিতেই। ঘন জলরঙ বা এড়ঁধপযব রীতিতে, হাতে তৈরি বিশেষ ধরনের কাগজের ওপর আঁকা এ

[১০৪] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পৃ. ৬২-৭৯

সব ছবির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়েছে মূলত মুঘল চরিত্র চিত্রায়ণ। তবে বাদশাহ বা নবাব এবং তাঁদের দরবারের অভিজাতবর্গের প্রতিকৃতির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়েছেন ইংরেজ সাহেবরাও। এ সময়কার বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ৪৬টি ছবির একটি বিশাল সংগ্রহ বর্তমানে রয়েছে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে।[১০৫] ইংরেজ শল্যচিকিৎসক উইলিয়াম ফুলারটন ছবিগুলো সংগ্রহ করেছিলেন।

উইলিয়ম ফুলারটন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে চিকিৎসক হিসেবে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৭৪৪ সালে। ১৭৫১ সালে তিনি কলকাতার সেকেন্ড সার্জন হিসেবে পদোন্নতি পান। ১৭৫৬ সালে সিরাজউদ্দৌলাহ যখন কলকাতা দখল করে নেন, তখন তিনি সেখানেই ছিলেন। এরপর ১৭৫৭ সালে তিনি আরো বড় দায়িত্ব পান, নিয়োগ লাভ করেন কলকাতার মেয়র হিসেবে। ১৭৬৩ সাল পর্যন্ত এই দায়িত্ব পালন করার পর তিনি পাটনায় কোম্পানির কুঠিতে প্রধান শল্যবিদ হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে চলে যান। চিকিৎসক হিসেবে ফুলারটন নবাব মীর কাসিম থেকে শুরু করে মুর্শিদাবাদের দরবারের অনেক অভিজাতবর্গের সঙ্গেই পরিচিত হয়েছিলেন, মীর কাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বাঁধলে পাটনায় অবস্থানরত কোম্পানির অন্য প্রায় সকল অফিসাররাই নিহত হলেও সে কারণেই তিনি বেঁচে যান। মির্জা হিম্মত আলী খান নামে নবাবের দরবারেরই একজন কর্মচারি তাঁকে পাটনা থেকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন।[১০৬] ১৭৬৬ সালে কোম্পানির চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়ার পরও তিনি অনেকদিন পর্যন্ত পাটনাতেই রয়ে যান। কোম্পানির কর্মকর্তারা

---

[১০৫]. Fulerton Collection, Victoria & Albert Museum, London, Museum No: IM-33 : 1912

[১০৬] Gholam-Hoseyn Khan Tabataba'i, *Seir Mutaqherin,* translated into English by Raymond (Haji Mustapha), Calcutta: T.D. Chatterjee 1902, reprint 1926, Vol. II, p. 510

যে মুর্শিদাবাদের নবাবদের অনুকরণ করতেন, ফুলারটন ছিলেন তার জ্বাজল্যমান উদাহরণ। নবাবদের অনুকরণে তিনি একাধিক বাঙালি রমনীকে 'বিবি' হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতা এবং পাটনায় অবস্থানকালে তিনি ইতিহাসবিদ গোলাম হোসেন তাবাতাবাইসহ অনেক স্থানীয় লোকের সঙ্গে বন্ধুত্বও করেছিলেন। চিত্রকলার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের ওই ছবিগুলো থেকে। এছাড়াও তাঁর সংগ্রহের আরো চারটি ছবি আছে ব্রিটিশ লাইব্রেরির সংগ্রহে।[১০৭] ছবিগুলোর উল্টো পিঠে তাঁর নামের আদ্যাক্ষর ডব্লিউ.এফ. এবং সংগ্রহের সাল, ১৭৬৪ লেখা আছে। সমকালীন সময়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অনেক কর্মকর্তারই নামের আদ্যাক্ষর ডব্লিউ এফ হওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু পূর্বোক্ত হিম্মত আলী খানের একটি প্রতিকৃতিও এই সংগ্রহশালায় থাকায় নিশ্চিত হওয়া গেছে যে এগুলো শল্যবিদ ফুলারটনেরই সংগ্রহ ছিল।

ছবিগুলোতে যেহেতু সংগ্রাহকের পুরো নামই নেই, তাই এগুলো কীভাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল তার বর্ণনাও পাওয়া সম্ভব হয়নি। বেশির ভাগ ছবির শিল্পীর নামও অজ্ঞাত। কেবল একজন শিল্পীর নামই জানা যায়–দীপ চাঁদ। সমকালীন অন্য শিল্পীদের মতোই দীপ চাঁদের জীবনকাহিনীও জানার কোনো উপায় নেই। তবে ফুলারটনের সংগ্রহে থাকা তাঁর আঁকা নবাব মীর কাসিমের আর্মেনিয়ান সেনাপতি গুরগিন খানের একটি প্রতিকৃতি (চিত্র ২.১১) দেখে অনুমান করা যায়, তিনি খুব সম্ভবত মুর্শিদাবাদের দরবারের শিল্পী ছিলেন। ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে মীর কাসিমেরও তিনটি প্রতিকৃতি আছে[১০৮] যেগুলোতে স্বাক্ষর না থাকলেও দীপ চাঁদের অংকন পদ্ধতির সঙ্গে

[১০৭] Malini Roy, 'White Mughal' William Fullerton of Rosemount', http://blogs.bl.uk/asian-and-african/2015/04/white-mughal-william-fullerton-of-rosemount.html accessed February 15, 2017

[১০৮] মিউজিয়াম নম্বর D.1178-1903, IS.241-1955 এবং IS.67-2006.

দারুণ মিল রয়েছে। এছাড়া ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহশালায় রক্ষিত দুটি ছবিতে মুঘল সম্রাট আহমেদ শাহের সৎভাই আশরাফ আলি খান ও তাঁর স্ত্রী মুতুবি'র প্রতিকৃতি অংকিত হয়েছে, যেগুলোকেও দীপ চাঁদের আঁকা বলেই মনে করা হয় (চিত্র ৩.৩ ও ৩.৪)।[১০৯] কোম্পানি চিত্রকলার মুর্শিদাবাদপর্বের চরিত্র বুঝতে আদর্শ উদাহরণ হিসেবে এই ছবিগুলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে। দীপ চাঁদের স্বাক্ষরিত ছবিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবিটিতে মুঘল অভিজাতদের ভঙ্গীতে দেখা যাচ্ছে একজন ইংরেজ সাহেবকে। কার্পেটের ওপরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে তিনি হুঁকো খাচ্ছেন। পোশাকে-আশাকে তাঁকে ইংরেজ হিসেবে চিনে নেওয়া যায়, তবে তাঁর সামনে পেছনের পরিচারকদের পোশাক মুঘল ধরনের। এই ছবিটি খুব সম্ভবত ফুলারটনের নিজেরই প্রতিকৃতি (চিত্র ৩.১)। এছাড়াও ফুলারটনের পরিবারের সদস্য, এমনকি তাঁর কর্মচারিদেরও ছবি এঁকেছেন দীপ চাঁদ। এ রকম একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, খালি গায়ে লাল রঙের লুঙ্গি বা ধুতি পরিহিত একজন ভারতীয় ব্যক্তি একটি চেয়ারে বসে হুক্কা খাচ্ছে। তার হাতের হুক্কাটি কিন্তু ফুলারটনের হাতের মতো গড়গড়ি বা প্যাঁচানো নলবিশিষ্ট হুক্কা নয়, লম্বা সোজা নলবিশিষ্ট সাধারণ হুক্কা। এছাড়া লোকটি একহাতে একটি 'লোটা' ধরে আছে, আর তার হাতের ফাঁকে গোঁজা আছে একটি তলোয়ার চিত্র (৩.২)।[১১০] অনুমান করা অসঙ্গত হবে না যে এই ছবিগুলো ফুলারটনের নির্দেশে তাঁর জন্যই এঁকেছিলেন দীপচাঁদ। মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা যে এ সময় নতুন পৃষ্ঠপোষকের সন্ধান পেয়েছিলেন, এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই নতুন পৃষ্ঠপোষকদের রুচিবোধের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে শুধু মোটিফ বা বিষয়বস্তুতেই নয়, এই সময়ের ছবিতে অংকন কৌশলেও ধীরে ধীরে

---

[১০৯] Malini Roy, 'White Mughal'

[১১০] ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামের মিউজিয়াম নম্বর D.1182-1903.

ইউরোপীয় প্রভাব ফুটে উঠতে শুরু করে। ঘন জলরংয়ের পরিবর্তে স্বচ্ছ জলরং বা ওয়াটার কালারের ব্যবহার শুরু হয়, মুঘল ছবির দ্বিমাত্রিকতা ছাড়িয়ে আলো-ছায়া আর পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহারে ত্রিমাত্রিকতার আবহও ছড়াতে শুরু করে। ফুলারটন সিরিজেরই একটি ছবিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।[১১১] জলরংয়ে আঁকা এ ছবিতে চন্দ্রালোকিত নিসর্গকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে শিল্পী চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন পরিপ্রেক্ষিত।

কোম্পানি চিত্রকলার এই প্রথম পর্যায় অবশ্য খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কারণটি সহজেই বোধগম্য। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই বাংলার রাজধানী হিসেবে মুর্শিদাবাদের বিকাশের পর্ব স্তব্ধ হয়ে যায়। এ সময় একদিকে যেমন চলছিল নগর হিসেবে মুর্শিদাবাদের ক্ষয়িষ্ণুতা, অন্য দিকে সমান তালে চলছিল নগর কলকাতার বিকাশ। ১৭৬৫ সাল নাগাদ মুর্শিদাবাদ একেবারেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে, বাংলার নতুন রাজধানী হয়ে ওঠে ইংরেজদের শহর কলকাতা। আর সেই সঙ্গে মুর্শিদাবাদের শিল্পীদেরও নতুন ঠিকানা হয়ে ওঠে কলকাতা।

কলকাতা পর্ব

ফুলারটনের মতো যে সব ইংরেজ সাহেবরা চিত্রকরদের দিয়ে নিজেদের প্রতিকৃতি আঁকিয়েছেন, তাঁদের ও তাঁদের আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে বাংলায় চিত্রকলা চর্চার খবর পৌঁছে গিয়েছিল ইংল্যান্ডেও। সেখানে তখন চিত্রকরদের বড় দুর্দিন চলছিল। তাই জীবিকার সন্ধানে অনেক পেশাদার ইংরেজ চিত্রকর এ সময় ভারতবর্ষে আসতে শুরু করেন। ভারতবর্ষে এ সময় কলকাতাই ছিল ব্রিটিশদের শাসনকেন্দ্র, তাই এ সব চিত্রকরদেরও বেশিরভাগ তাঁদের চিত্রকলা

[১১১] 'Moonlit Landscape'; দ্রষ্টব্য, Robert Skelton, 'Murshidabad Painting', p. 19.

চর্চা করেছেন কলকাতাকে ঘিরে। আবার এ সময় ব্রিটিশ অভিজাতবর্গ এবং তাঁদের অনুকরণে এদেশীয় বাবুরা নিজেদের আবাসস্থলকে সাজাতে শুরু করলেন ব্রিটিশ স্টাইলে। বাড়ির নকশায় যোগ হতে শুরু করল ফায়ারপ্লেস, ম্যান্টলপিস সমৃদ্ধ ড্রয়িংরুম, আর সেই ড্রয়িং রুম সাজাতে প্রয়োজন হলো সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো পেইন্টিং। ঘন, স্বচ্ছ জলরংয়ের ছবির পাশাপাশি তাই প্রচলন হতে শুরু করল তেলরংয়ের ছবিও। নগর কলকাতার বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে তাই অনেকখানি জড়িত কোম্পানি আমলে বাংলার চিত্রকলার বিকাশের ইতিহাসও।

ভারতবর্ষে আসা পেশাদার ইংরেজ শিল্পীদের মধ্যে সবার আগে এসেছিলেন টিলি কেটল।[১১২] ১৭৬৯ সালে মাদ্রাজে (এখনকার চেন্নাই) এসে পৌঁছেছিলেন তিনি, কলকাতায় পৌঁছেছিলেন আরো দু বছর পর। তখন থেকে শুরু করে পরবর্তী অর্ধশত বছরে প্রায় ষাটজন ব্রিটিশ শিল্পীর নাম জানা যায়, যাঁরা কলকাতায় এসে চিত্রচর্চা করেছিলেন। কেটলের দেখানো পথ ধরে পরবর্তীতে যাঁরা কলকাতায় এসেছেন, তাঁদের অনেকেই ছিলেন পেশাদার শিল্পী, আবার কেউ কেউ ছবি এঁকেছেন নিতান্তই শখের বশে। তাদের কাজ নিয়ে বেশ কিছু গবেষণাও হয়েছে। ১৯৩০ সালে ওয়ালপোল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত উইলিয়াম ফস্টারের 'ব্রিটিশ আর্টিস্ট ইন ইন্ডিয়া ১৭৬০-১৮২০'[১১৩] এর পথিকৃৎ। কলকাতা ও লন্ডনে রক্ষিত বিভিন্ন নথি ও পত্র-পত্রিকার তথ্য বিশ্লেষণ করে উক্ত গ্রন্থে তিনি আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতকের

[১১২] Martin Postle, 'Tilly Kettle', in H.C.G. Matthew, and Brian Harrison, eds. *The Oxford Dictionary of National Biography*. vol. 31, London: OUP, 2004, pp. 460-462

[১১৩] William Foster, 'BRITISH ARTISTS IN INDIA 1760–1820', *The Volume of the Walpole Society*, Vol. 19 (1930-1931), pp. 1-88

প্রথম দুই দশক পর্যন্ত ভারতবর্ষে আগত মোট ষাটজন ব্রিটিশ চিত্রকরের একটি তালিকা দিয়েছেন। এরা হলেন:

১. জন অ্যালেফাউন্ডার

২. স্যামুয়েল অ্যান্ড্রুস

৩. উইলিয়াম বেইলি

৪. জোসেফ ব্যাটল

৫. মিসেস ব্যাক্সটার

৬. [ ] ব্রিগস

৭. রিচার্ড ব্রিট্রিজ

৮. জন ব্রাউন

৯. জর্জ কার্টার

১০. জর্জ চিনারি

১১. নীল করম্যাক

১২. টমাস ড্যানিয়েল

১৩. উইলিয়াম ড্যানিয়েল

১৪. জে. ডিন

১৫. আর্থার উইলিয়াম ডেভিস

১৬. জর্জ ফ্যারিংটন

১৭. ক্যালেব জন গারব্র্যান্ড

১৮. স্যামুয়েল গোল্ড

১৯. ব্যারন গ্রাহাম

২০. উইলিয়াম হ্যাভেল

২১. টমাস হিকি

২২. মিসেস ডায়ানা হিল

২৩. উইলিয়াম হজেস

২৪. রবার্ট হোম

২৫. জন ক্যামিলাস হোন

২৬. হেনরি হাডসন

২৭. উইলিয়াম জে এল হাডসন

২৮. ওজিয়াস হামফ্রে

২৯. মার্থা আইজ্যাকস

৩০. টিলি কেটল

৩১. হেনরি লিক

৩২. জেমস লক

৩৩. টমাস লংক্রফট

৩৪. রবার্ট মেবন

৩৫. উইলিয়াম মেলভিল

৩৬. জন মিডলটন

৩৭. রিচার্ড মিলার

৩৮. জেমস মোফাট

৩৯. টমাস মরিস

৪০. জশুয়া মোজেলি

৪১. এডওয়ার্ড ন্যাশ

৪২. জন প্যাক্সটন

৪৩. জর্জ প্লেস

৪৪. ক্যাথেরিন রিড

৪৫. ফ্রান্সিস রেনাল্ডি

৪৬. ওয়াল্টার রবার্টসন

৪৭. হেনরি সল্ট

৪৮. জন টমাস সেটন

৪৯. চার্লস শিরেফ

৫০. জন স্মার্ট

৫১. জন স্মার্ট জুনিয়র

৫২. চার্লস স্মিথ

৫৩. আলেকজান্ডার টেলর

৫৪. অ্যারন আপজন

৫৫. জেমস ওয়েলস

৫৬. টমাস ওয়াটলিং

৫৭. উইলিয়াম ওয়েস্টাল

৫৮. জন গডউইন উইলিয়ামস

৫৯. জর্জ উইলিসন

৬০. জন জোফানি

পরবর্তীতে এ নিয়ে লিখেছেন জর্জ রেইনল্ডস, মিলড্রেড আর্চারসহ অনেকেই। প্রদ্যোৎ গুহের *কোম্পানি আমলে বিদেশি চিত্রকর* বাংলা ভাষায়ও এ বিষয়ে আলোকপাত করেছে। এই সকল সূত্র ধরে সমকালীন বাংলা ও ভারতবর্ষে কাজের সন্ধানে আসা আরো অনেক চিত্রকরের নাম জানা যায়। আর তা থেকে ইঙ্গিত মেলে, চিত্রকরদের জন্য বেশ আকর্ষণীয় জায়গা ছিল। লন্ডন থেকে অনেক চিত্রকরই এদেশে আসতে চাইতেন। তবে তাদের আসার প্রক্রিয়াটি খুব সহজ ছিল না। কারণ সে সময় ব্রিটেনবাসী কেউ ভারতে আসতে চাইলে তাকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে অনুমতি চাইতে হতো। শিল্পীদের এদেশে আসা কোম্পানি পছন্দ করতো না বলে এই অনুমতি পাওয়া

বেশ কঠিন ছিল।[১১৪] অনুমতি পেলেও সবাই আসতে পারতেন না। কারণ, কোম্পানি অনেক সময় নানা রকম অদ্ভুত শর্ত আরোপ করতো। যেমন, পরবর্তীতে ভারতে এসে ছবি এঁকে বিখ্যাত হওয়া জন জোফানি এবং চার্লস স্মিথ নামে অন্য এক চিত্রকরকে কোম্পানি এই শর্তে অনুমতি দিয়েছিল, যে তাঁরা ভারতযাত্রায় কোম্পানির জাহাজে উঠতে পারবেন না! খেয়ালী জোফানি ছদ্মনামে কোম্পানির জাহাজেই চাকরি জুটিয়ে লুকিয়ে এসেছিলেন শেষ পর্যন্ত।

ভারতবর্ষে বসে ছবি এঁকে খ্যাতি পাওয়া সকলে আবার পেশাদার চিত্রকরও ছিলেন না। অনেকেই কোম্পানির কর্মকর্তা হিসেবে এ দেশে এসে নিতান্তই শখের বশে ছবি এঁকেছেন এবং এঁকে রীতিমতো বিখ্যাতও হয়েছেন। যেমন রবার্ট ক্রেইটন এবং চার্লস ড'য়লি; তাঁদের আঁকা ছবি শুধু সমকালের শিল্পধারারই নিদর্শন নয়, বরং ইতিহাসের অমূল্য দলিল হয়ে রয়েছে।

যাঁরা পেশাদার শিল্পী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন আসলে সস্তাদরের শিল্পী, ইংল্যান্ডে সুবিধা করতে না পেরেই তাঁরা জীবিকার সন্ধানে এসেছিলেন এ দেশে। তবে কয়েকজন খুবই উঁচু মানের শিল্পীও ছিলেন। কেটল নিজে তাঁদের মধ্যে একজন। প্রদ্যোৎ গুহ এই শিল্পীদের তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।[১১৫] প্রথম ভাগে কেটল, জোফানি, ডেভিস প্রমুখ; যাঁরা নিজেদের দেশেই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ দেশে এসে তাঁরা মূলত আঁকতেন পোর্ট্রেইট, কোম্পানির কর্মকর্তা কিংবা স্থানীয় রাজ-রাজড়াদের সে সব ছবি আঁকা হতো ইউরোপীয় ধারায়, তেলরঙে।

---

[১১৪] প্রদ্যোৎ ঘোষ, *কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর*, পৃ. ৩৫

[১১৫] প্রদ্যোৎ গুহ, *কোম্পানি আমলে বিদেশি চিত্রকর*, কলকাতা: অয়ন, ১৯৭৮, পৃ. ১৪-১৫।

দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছিলেন স্মার্ট, হামফ্রে, অ্যান্ড্রুজ, চিনারি প্রমুখ। মিনিয়েচার পোর্ট্রেইট আঁকায় পারদর্শী ছিলেন এঁরা, অনেক সময় ছবি আঁকতেন হাতির দাঁতের ওপর। কাগজের ওপরও এঁকেছেন তাঁরা।

আর তৃতীয় ও সর্বশেষ শ্রেণির শিল্পীদের দক্ষতা ছিল জল রঙে। এরা মূলত আঁকতেন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি; সমকালের ব্রিটেনের দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যা। এই সব ছবিকে আবার পরে এনগ্রেভিং, অ্যাকোয়াটিন্ট বা লিথোগ্রাফির মাধ্যমে ছাপা কপি তৈরি করা হতো। কখনো লন্ডন বা ডাবলিনের খ্যাতিমান এনগ্রেভার-লিথোগ্রাফার দিয়ে এ সব কাজ করানো হতো, কখনো বা চিত্রকররা নিজেরা, ভারতবর্ষেই নিজস্ব প্রিন্ট-মেকিং প্রেস বসিয়ে ছাপা কপি তৈরি করতেন। এই দলে ছিলেন উইলিয়ম হজেস এবং চাচা-ভাইপো টমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়েলদের মতো শিল্পীরা। বেশ ভালো দামেই বিক্রি হতো সে সব কপি। উদাহরণস্বরূপ, ১৭৯৪ সালে উইলিয়ম বেইলির করা কলকাতা শহরের নানা দৃশ্যের এনগ্রেভিং সেট প্রকাশিত হয়। ১৫ ইঞ্চি ×১১ ইঞ্চি মাপের একেকটি ছাপাই ছবির দাম নির্ধারণ করা হয়েছিল ২৫ টাকা, নয়টি ছবির একটি সেটের দাম ধরা হয়েছিল ৮০ টাকা। পরের বছর প্রকাশিতব্য ড্যানিয়েলদের ২৪টি ছবির একটি সেটের সম্ভাব্য দাম নির্ধারিত হয়েছিল ২০০ টাকা আর প্যারিস থেকে প্রকাশিত ফ্রাঁসোয়া বালথাজার্ড সলভিনসের ২৫০টি ছবির সেটের দাম ছিল ২৫০ টাকা।[১১৬]

বিনয় ঘোষ দেখিয়েছেন, সমকালীন কলকাতার খবরের কাগজে প্রকাশিত বিচিত্র ধরনের বিজ্ঞাপন থেকেও চিত্রকলার বাজার সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়। যেমন, ক্যাপ্টেন ফ্রান্সিস সোয়েন ওয়ার্ড নামে একজন শিল্পীর পক্ষে ১৭৮৪ সালের ৪ মার্চ ক্যালকাটা গেজেট পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দাবি

[১১৬] W.H. Carey, The Good Old Days of Honourable John Company, Calcutta: R Cambray & Co., 1907, p. 186.

করা হয়েছিল, তিনি হিন্দু স্থাপত্যের একজন কুশলী চিত্রকর, তাঁর করা একটি ছবির সংকলন বের করা হবে কিন্তু সেটি ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ায় অগ্রিম চাঁদা তুলে কাজটি করতে চান।[১১৭] পরবর্তীতে কর্নেল পর্যন্ত পদোন্নতি পাওয়া সোয়েন ওয়ার্ড এক সময় (১৭৭১-৭২ মেয়াদে) ব্রিটেনের পেশাদার শিল্পী সংস্থার সেক্রেটারি ছিলেন, কাজেই তার এই দাবি অমূলক ছিল না। তাঁর মতো খ্যাতিমান শিল্পীরা তো বটেই, এমনকি অখ্যাত শিল্পীরাও এমন বিজ্ঞাপন দিতেন। ১৭৮৫ সালের অন্য একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যাচ্ছে উইলিয়ম হোন নামে একজন 'ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের' ছবি আঁকা শেখাতে চান। কোম্পানির চাকরি নিয়ে আসা 'ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা'দের অনেকেই যে ছবি আঁকা শিখতে চাইতেন, তার অকাট্য প্রমাণ হয়ে আছে ঢাকার কালেক্টর ড'য়লির প্রশিক্ষক হিসেবে খ্যাতিমান চিত্রকর জর্জ চিনারির কাজ করার গল্প। ড'য়লির বিখ্যাত লিথোগ্রাফি সংকলন *অ্যান্টিকুইটিজ অফ ঢাকার* কয়েকটি লিথোগ্রাফ আসলে চিনারির ড্রইং অবলম্বনে করা হয়েছিল। চিনারির মতো শিল্পীরা যে এ সব কাজ থেকে অনেক টাকা আয় করতেন, সে সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায় ১৭৯৮ সালের ৫ এপ্রিল তারিখে কলকাতা গেজেট পত্রিকায় ছাপা হওয়া আরেকটি বিজ্ঞাপন থেকে। তাতে 'মিস্টার মরিস' নামের এক অখ্যাত চিত্রকর আগ্রহী ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের পোর্ট্রেট এঁকে দিতে চান বলে জানিয়েছেন কোন ধরনের ছবি আঁকতে কত টাকা নেবেন। সেই মূল্যতালিকা অনুসারে শুধু মুখম-লের ছবি আঁকার পারিশ্রমিক তিনি হেঁকেছিলেন ১৫ স্বর্ণমুদ্রা, পুরো শরীরের একটি পোর্ট্রেট করাতে চাইলে ৮০ স্বর্ণমুদ্রা।[১১৮]

---

[১১৭] বিনয় ঘোষ, 'শিল্পসহর কলকাতা', *সুন্দরম*, বর্ষ ১, সংখ্যা ১, ১৩৬৩ বাংলা সন; উদ্ধৃত, প্রদ্যোৎ ঘোষ, *কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর*, পৃ. ১২।

[১১৮] প্রদ্যোৎ ঘোষ, *কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর*, পৃ. ১৩-১৪।

এই বিজ্ঞাপনগুলি থেকে অন্তত একটি বিষয় পরিষ্কার- বিকাশমান কলকাতা শহরের অভিজাত মহলে পোর্ট্রেট আঁকানোর চল ছিল, এবং সে জন্য তারা বেশ ভালো টাকা খরচ করতেন। কেটলের মতো শিল্পীরা এর পুর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন।

লন্ডনের একটি দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া কেটলের পিতাও পেশায় চিত্রকর ছিলেন, তবে ব্রিটিশদের চোখে তিনি ঠিক 'শিল্পী' ছিলেন বলা যাবে না; তিনি কাজ করতেন কোচ পেইন্টারের, ঘোড়ার গাড়ির গায়ে নকশা আঁকতেন। বাবার কাছেই ছবি আঁকায় হাতে খড়ি, তবে কেটল পেশাদারি ছবি আঁকারও দীক্ষা নিয়েছিলেন। রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টসের প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম শিপলির কাছে প্রশিক্ষণ নেয়ার পর ১৭৫০ সালেই তিনি পেশাদারী ভিত্তিতে ছবি আঁকার কাজ শুরু করেছিলেন। লন্ডনে ছবি এঁকে বেশ খ্যাতিও পেয়েছিলেন, তবে আরো স্বচ্ছলতা ও খ্যাতি অর্জনের আশায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিতে যোগ ১৭৬৮ সালে তিনি ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ১৭৬৯ সালে মাদ্রাজে উপস্থিত হওয়ার পর বছর দুয়েক সেখানে থেকে ১৭৭১ সালে তিনি কলকাতায় পৌঁছান। পাঁচ বছর কলকাতায় অবস্থানকালে তিনি স্থানীয় এক নারীর প্রেমে পড়েছিলেন, তাঁর গর্ভে তাঁর দুটি কন্যা সন্তানেরও জন্ম হয়। ১৭৭৬ সালে তিনি লন্ডনে ফিরে যান, এবং মেরি নামে একজনকে বিয়ে করেন। কিন্তু ভারতবর্ষে যেমন স্বচ্ছলতা অর্জন করেছিলেন, লন্ডনে সে রকম খ্যাতি বা স্বচ্ছলতা কোনোটাই পাননি, উল্টো দেনায় ডুবতে বসেছিলেন। এ রকম অবস্থায় ১৭৮৬ সালে তিনি পুনরায় ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তবে এবার সমূদ্রপথে নয়, স্থলপথে আসার ইচ্ছে ছিল খেয়ালী এই শিল্পীর, কিন্তু সেই ইচ্ছে শেষ পর্যন্ত পুরণ হয়নি। ভারতবর্ষ আসার পথেই কোনো এক অজ্ঞাত স্থানে তাঁর জীবনাবসান হয়। ১৭৮৬ সালে

বর্তমান সিরিয়ার আলেপ্পো শহরে আঁকা একটি ছবিই এখন পর্যন্ত আবিস্কৃত কেটলের আঁকা সর্বশেষ ছবি ।

কেটলের জীবনকাহিনী আঠারো-উনিশ শতকে ভাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে আশা ব্রিটিশ চিত্রকরদের সম্পর্কে একটি ধারণা গ্রহণের জন্য আদর্শ বিবেচিত হতে পারে । তাঁর অনুগামী হয়ে অন্য যে সব শিল্পীরা এ দেশে এসেছিলেন, তাঁদের বেশিরভাগের জীবনকাহিনীও এগিয়েছে একই পথে । বাংলায় এসে কেটল কিন্তু নিজের দেশে শেখা তাঁর চিত্রবিদ্যার অনুসরণের পাশাপাশি বাংলার পূর্বতন রীতি আত্মস্থ করেও ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন । তাঁর আঁকা অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার বেশ অন্তত দুটি প্রতিকৃতি রয়েছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালা (চিত্র ৩.৫) এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল সেন্টার অফ ব্রিটিশ আর্ট-এ (চিত্র ৩.৬) । দুটিই তেলরঙে আঁকা । কলকাতার ছবিটিতে সুজাউদ্দৌলা তাঁর চার পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে দেখা করছেন জেনারেল বেকার নামে একজন ব্রিটিশ অফিসারের সঙ্গে । এই ছবির মধ্যমণি হয়ে থাকা নবাবের দাঁড়ানোর ভঙ্গির হুবহু প্রতিফলন রয়েছে ইয়েলের ছবিটিতে । সেখানে অবশ্য তিনি একা, দাঁড়িয়ে আছেন একটি বারান্দার রেলিং ঘেঁষে, পেছনে খোলা আকাশের নিচে প্রাসাদের চত্বরে দাঁড়ানো কর্মীদের দেখা যাচ্ছে । তেলরঙে করা হলেও ছবিটির কম্পোজিশনে মুঘল শৈলীর সুস্পষ্ট ছাপ রয়েছে, বিশেষ করে রৈখিক ও বায়বীয় পরিপ্রেক্ষিতের মিশেলে । মজার ব্যাপার হচ্ছে, স্যান ফ্রান্সিসকোর ফাইন আর্টস মিউজিয়ামে ১৭৮০ সালেই আঁকা সুজাউদ্দৌলার অন্য একটি পোর্ট্রেট আছে, ইয়েলের ছবিটি অনুসরণ করে অন্য কোনো একজন শিল্পী পুরোপুরি মুঘল রীতিতে কাগজের ওপর ঘন জলরঙে এঁকেছেন সেটি । ছবিতে মুঘল শৈলীর মতো করেই হাশিয়ার ব্যবহারও লক্ষ্যণীয়, যদিও নবাবের মুখাবয়বে খানিকটা ইউরোপীয় ভাব ফুটে উঠেছে

আর তাঁর প্রতিকৃতির পেছনের মেঘে ঢাকা আকাশ হুবহু ইয়েলের কপিটির মতো (চিত্র ৩.৭) ।

কেটলকে অনুসরণ করে যাঁরা কলকাতায় এসেছিলেন, তাদের মধ্যে জার্মান বংশোদ্ভুত জন জোফানিও ছিলেন উঁচুমানের পেশাদার চিত্রকর । তিনি ১৭৮৩ থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন । লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টসে প্রশিক্ষণ নেয়া জোফানির ক্যারিয়ারের বেশিরভাগ সময় অবশ্য কেটেছে লন্ডনেই । ভারতবর্ষে এসে তিনিও এঁকেছেন মূলত পোর্ট্রেট । তবে কেটলের চেয়েও বেশি করে তিনি আত্মস্থ করেছিলেন মুঘল রীতি । তাঁর আঁকা মেজর উইলিয়াম পালমার নামে একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তার একটি পারিবারিক ছবি সংরক্ষিত আছে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে । [১১৯] বেঙ্গল আর্টিলারির মেজর পালমার ভারতে এসে বিয়ে করেছিলেন এক মুঘল রাজকন্যাকে, ছবিতে সেই ফয়েজুন্নেসা বেগম, তাঁর বোন নূর বেগম এবং তাঁদের দুই পুত্র উইলিয়াম ও হেস্টিংসের সঙ্গে দুইজন ভারতীয় পরিচারিকাকেও দেখা যাচ্ছে (চিত্র ৩.৮) । ছবির পুরুষদের পোশাক ব্রিটিশ ধরনের হলেও মহিলাদের পরনের পোশাক একেবারেই মুঘল ঘরানার, ছবি আঁকার কৌশলও মুঘল । লক্ষ্ণৌতে বসে জোফানির আঁকা কর্নেল পলিয়ারের বাইজি নাচ উপভোগের দৃশ্যটিতে তো খোদ কর্নেল পলিয়ারকেও মনে হয় এক মুঘল রাজপুরুষ!

এ রকম ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি আঁকা মুঘল দরবারি রীতির একটি অতি পরিচিত বিষয় ছিল, আর সেই ছবিগুলো সমকালীন ইতিহাসের অনন্য দলিল হয়ে আছে । জোফানি এ রকম অনেক ছবি এঁকেছেন । তার মধ্যে দুটি ছবি রয়েছে কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালায় । এর মধ্যে একটিতে আঁকা হয়েছে একটি খ্যাপা হাতির ছবি । ১৭৮৭ সালে লখনৌ থেকে আসফউদ্দৌলার উজির হায়দার বেগের সঙ্গে জোফানি কলকাতায় এসেছিলেন,

[১১৯] British Library Collection No. F597.

আসার পথে পাটনায় ঘটে যাওয়া একটি ঘটনার ছবি এটি, যেখানে হঠাৎ খেপে ওঠা একটি হাতি তার পিঠ থেকে মাহুতকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে (চিত্র ৩.৯)।[১২০] ছবিটির পশ্চাদপটে পাটনার বিখ্যাত ধর্মগোলা'র অবস্থান দেখে বোঝা যায় ঘটনাস্থল কোথায়, তাছাড়াও লক্ষ্যণীয় যে ছবিটিতে ঘোড়সওয়ার অবস্থায় নিজেকেও এঁকেছেন জোফানি। এটি তাঁর ছবির একটি লক্ষ্যণীয় প্রবণতা, প্রায়ই বিভিন্ন ঘটনার ছবি আঁকতে গিয়ে নিজেকে আঁকতেন তিনি। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেই সংরক্ষিত অন্য ছবিটিতে কর্নেল পলিয়ের, বন্ধু ক্লদ মার্টিন আর তাঁর নিজের প্রতিকৃতি আছে (চিত্র ৩.১০)। মুঘল দরবারি রীতিতে সমকালীন ঘটনাবলীর ছবি এভাবে আঁকিয়ে রাখা হতো, যেগুলো সমকালীন ইতিহাসের দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি ছবি জোফানির জীবন ও কর্মকে নতুন করে বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা তৈরি করেছে। ব্রিটেনের গ্লস্টারশায়ারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাবেক গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের উত্তরসূরীদের মালিকাধানীন ডেইলসফোর্ড হাউজের সংগ্রহশালায় রক্ষিত কয়েকটি শিল্পকর্মে ঢাকার পুরাকীর্তির ছবি আছে। এর মধ্যে তেলরঙে আঁকা লালবাগ-এর দক্ষিণ প্রবেশদ্বারের একটি ছবিকে (চিত্র ৩.১১) চার্লস ক্রেইগ জোফানির আঁকা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।[১২১] ছবিটি লন্ডনের বেল এলউইস নামে একটি এজেন্সির মাধ্যমে কিনেছেন তাঁরা। তবে এই ছবিটিরই হুবহু একটি কপি ২০১১ সালে নিলামে তুলেছিল বিখ্যাত নিলামকারী সংস্থা সদবি'জ।[১২২] তাদের ক্যাটালগে ছবিটিকে রবার্ট হোমের আঁকা বলে বর্ণনা করা হয়েছিল।

---

[১২০] ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালা, কলকাতা সংগ্রহ নং R1740-C985-113.

[১২১] Waqar A. Khan, 'The Dhaka Masterpiece Paintings' in *The Daily Star,* Dhaka, September 17, 2016.

[১২২] Old Master and British Paintings Day Sale, London, 08 December 2011, Lot No. 280; দ্রষ্টব্য, http://www.sothebys.com/en/auctions/ecatalogue/2011/old-master-and-british-paintings-day sale/lot.280.html accessed on September 15, 2018

নিলামে অবিক্রিত রয়ে যাওয়া ছবিটি সদবি'জের হাতে এসেছে মহারাজা প্রদ্যোৎ কুমার ঠাকুরের সংগ্রহশালা থেকে ।

জোফানি কখনো ঢাকায় এসেছিলেন, এমন তথ্য জানা যায় না । ভারতবর্ষে তিনি সাত বছর ছিলেন, তার মধ্যে কলকাতা ছাড়া কিছুকাল তিনি লখনৌতে বসবাস করেছেন । ভারতের গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে করে ১৭৮৪ সালে তিনি লখনৌ যান এবং অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলার দরবারে তিন বছর অবস্থান করেন ।[১২৩] সেখান থেকে কলকাতায় ফেরার পথেই পূর্বোক্ত খ্যাপা হাতির ছবিটি এঁকেছিলেন তিনি । লালবাগের ছবিটিও ১৭৮৭ সালে আঁকা, ওই সময়ে অন্তত তাঁর ঢাকায় থাকার কথা নয় । তবে জোফানি শোনা ঘটনা অবলম্বনেও নানা ঘটনার ছবি এঁকেছেন, লন্ডনে ফিরে যাওয়ার পর আঁকা তাঁর লর্ড কর্নওয়ালিশ কর্তৃক টিপু সুলতানের পুত্রকে জামিন হিসেবে গ্রহণের ছবিটি তার উদাহরণ । ১৭৯২ সালের এই ঘটনা তাঁর দেখার কথা নয় কারণ ১৭৮৯ সালেই তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে যান । ছবিটিতে একটি তথ্যগত ভ্রান্তিও আছে, কর্নওয়ালিশ টিপু সুলতানের দুই পুত্রকে জামিন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু ছবিতে শুধু এক পুত্রকে দেখানো হয়েছে ।[১২৪]

অন্য দিকে হোম ঢাকায় এসেছিলেন, এটি নানা সূত্র থেকে জানা যায় । তাঁর নিজেরই একটি খেরোখাতায় উল্লেখ আছে তিনি ঢাকার নবাব নুসরাত জংয়ের আমন্ত্রণে ১৭৯৯ সালে ঢাকায় এসেছিলেন । নুসরাত জং চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন, তাঁর দরবারে বসেই আলম মুসাব্বির নামে একজন শিল্পী তাঁর শিষ্যদের নিয়ে নবাবদের বিভিন্ন উৎসব উদযাপনের অনেকগুলো ছবি এঁকেছিলেন । কাজেই তাঁর পক্ষে হোমের মতো শিল্পীকে আমন্ত্রণ জানানো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল । সদবি'জের ক্যাটালগে

[১২৩] প্রদ্যোৎ ঘোষ, *কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর*, পৃ. ২৭-২৯ ।
[১২৪] প্রদ্যোৎ ঘোষ, *কোম্পানি আমলে বিদেশী চিত্রকর*, পৃ. ৩০ ।

ছবিটিকে ১৭৯৯ সালে আঁকা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই বর্ণনা অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে।

জোফানির মতোই রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টসে প্রশিক্ষিত আরো কয়েকজন শিল্পী এসেছিলেন বাংলায়। এদের মধ্যে আর্থার ডেভিস ১৭৮৩ সালে খুবই অল্প বয়সে ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছিলেন কোম্পানির জাহাজ অ্যান্টিলোপ-এ ড্রাফটসম্যানের চাকরি নিয়ে, কিন্তু নানা ঝামেলায় তিনি শেষ পর্যন্ত কলকাতায় উপস্থিত হতে সক্ষম হন ১৭৮৫ সালে। বছর দশেক পর ফিরে যাওয়ার পথেও আরেক জাহাজ এইচএমএস ভিক্টরি'তে কাজ করেছেন পেশাদার ড্রাফটসম্যান হিসেবে। রয়্যাল একাডেমী অফ আর্টসে প্রশিক্ষণ নেয়া অন্য এক শিল্পী জর্জ ফ্যারিংটন ১৭৮৩ সালে কলকাতায় এসে উপস্থিত হন, ১৭৮৮ সালে বাংলায়ই তাঁর মৃত্যু হয়।

আয়ারল্যান্ডে জন্ম নেয়া টমাস হিকিরও জীবনাবসান ঘটেছে ভারতবর্ষেই, তবে বাংলায় নয়, মাদ্রাজে। সেটি অবশ্য ছিল ভারতে তাঁর দ্বিতীয় সফর। প্রথমবার ১৭৮২ সালে কলকাতায় এসে তিনি অবস্থান করেছেন ১৭৯১ সাল অবধি; দেশে ফেরার আগে গিয়েছিলেন সুদূর চীনে পর্যন্ত। এছাড়াও আরো যে সব শিল্পী এ সময় ব্রিটেন থেকে বাংলায় এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ফ্রান্সেসকো রেনাল্ডি (১৭৮৬-৯৬), টমাস ও উইলিয়ম ড্যানিয়েল (১৭৮৬-৯৪), উইলিয়ম হজেস (১৭৮০-৮৩), জর্জ চিনারি (১৮০২-২৫), জেমস মোফাট (১৭৮৯-১৮১৫) ও রবার্ট হোম (১৭৯১-১৮৩৪) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের পাশাপাশি কোম্পানির কর্মকর্তা হিসেবে এদেশে আসা কয়েকজন সৌখিন চিত্রকরের নামও স্মরণযোগ্য, যাঁদের মধ্যে

ছিলেন চার্লস ড'য়লি, রবার্ট ক্রেইটন, জোসেফ স্কট ফিলিপস, আলেকজান্ডার ডি ফ্যাবেক প্রমুখ।[১২৫]

শুধু ইংল্যান্ড থেকেই নয়, উনিশ শতকে অন্যান্য দেশ থেকেও চিত্রকররা এসেছেন বাংলায়। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত বেলজিয়ান শিল্পী ফ্রাঁসোয়াঁ বালথাজার্ড সলভিনস (১৭৯১-১৮০৪)। তুলনামূলক কম আলোচিত হলে দুজন রুশ শিল্পীর ওপর আলোকপাত করেছেন প্রদ্যোৎ গুহ- এঁরা হলেন অ্যালেক্সি সালতিকভ ও ভ্যাসিলি ভেরেশ্চাগিন। সালতিকভ ১৮৪১-৪৩ এবং ১৮৪৫-৪৬ সালে দুবার কলকাতায় এসেছিলেন, ভেরেশ্চাগিনও এসেছেন দু দফায়, ১৮৭৪ এবং ১৮৮২ সালে।

পেশাদার ইউরোপীয় শিল্পীদের অনেকেই তেলরঙে ছবি এঁকেছেন। এসব ছবির মধ্যে রেনাল্ডির আঁকা 'মুসলিম লেডি রিক্লাইনিং' (১৭৮৯) ছবিটি নানা কারণে বিখ্যাত। তেলরঙে চিত্রায়িত ছবিটি শিল্পী সম্ভবত ঢাকায় বসে এঁকেছিলেন (চিত্র ৩.১২)।[১২৬] ছবিতে একজন ইউরোপীয় অভিজাতের ভারতীয় স্ত্রীকে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তাঁর পরনে স্বচ্ছ মসলিনের পোশাক, পায়ের কাছে রাখা পানের বাটা। ছবির চরিত্র এ দেশীয় হলেও অংকন রীতি পুরোপুরি ইউরোপীয়। এ রকম অন্যান্য ছবিগুলোর বেশিরভাগে অবশ্য চরিত্রও মূলত ইউরোপীয় কর্মকর্তারাই। হিকির আঁকা কর্নেল ম্যাকেঞ্জি[১২৭], জোফানির ইমপে পরিবার[১২৮] প্রভৃতি ছবিকে

---

[১২৫] বিস্তারিত তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য, William Foster, 'BRITISH ARTISTS IN INDIA 1760–1820', pp. 1-88

[১২৬] শামীম আমিনুর রহমান, 'ঢাকার অদেখা ছবি', *প্রথম আলো ঈদসংখ্যা ২০১০*, ঢাকা, আগস্ট ২০১০, পৃ. ৪১৯। ছবিটি বর্তমানে কানেকটিকাটের ইয়েল সেন্টার অফ ব্রিটিশ আর্ট-এর পল মেলন কালেকশনে সংরক্ষিত রয়েছে। দ্রষ্টব্য, The Yale Center for British Art, *The Long Gallery Guide*, Bay E North, Artwork 2.

[১২৭] ছবিটি বর্তমানে ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত। সংগ্রহ নং এফ ৭৬৭।

[১২৮] ছবিটি বর্তমানে মাদ্রিদের Museo Nacional Thyssen-Bornemisza-এ সংরক্ষিত রয়েছে, Inv. no. 445 (1986.11).

উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যেতে পারে। প্রথম ছবিটিতে কর্নেল ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় ভৃত্য ও মুন্সিদেরও দেখা যাচ্ছে (চিত্র ৩.১৩), আর দ্বিতীয়টিতে ইমপে পরিবারকে গান শোনাচ্ছেন আরব পোশাক পরা একটি গানের দল, আর তাঁদের পায়ের কাছে বসে আছে দুই ভারতীয় পরিচারিকা, যাদের একজনের কোলে এই পরিবারের একটি শিশু (চিত্র ৩.১৪)।

কলকাতায় চিত্রকলা চর্চায় এই ইমপে পরিবারের বিরাট ভূমিকা ছিল। কোম্পানি আমলের একেবারে শুরুর দিকে যাঁরা চিত্রকলায় পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইমপে এবং তাঁর পরিবার এ ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছিল। স্যার ইমপে ১৭৭৪ সালে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৭৮৩ সালে যুক্তরাজ্যে ফিরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি কলকাতায় অবস্থান করেন। স্যার ইমপে নিজেও চিত্রকলার সমঝদার ছিলেন, তবে তাঁর স্ত্রী লেডি মেরি ইমপের উদ্যোগ বাংলার চিত্রকলার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় অধ্যায় যোগ করেছিল। লেডি ইমপে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে ফুল, পাখি ও বিভিন্ন প্রাণীর এক বিশাল সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, পাটনা থেকে আগত তিনজন দেশীয় চিত্রকর জৈনুদ্দিন, রাম দাস ও ভবানী দাসকে দিয়ে তিনি তাঁর সংগ্রহশালার ফুল-ফল, পাখি এবং অন্যান্য প্রাণীর অসংখ্য ছবি আঁকিয়েছিলেন। প্রাকৃতিক ইতিহাস বিষয়ক বিখ্যাত সংগ্রহশালা লিনিয়ান সোসাইটি ১৮৫৫ সালে লেডি ইমপের জন্য আঁকা ৬৮টি ছবি সংগ্রহ করেছিল। এগুলো পরবর্তীতে ১৯৬৩ সালে সদবি'জ নিলামে তোলে, ফলে ছবিগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সংগ্রহশালায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাডক্লিফ সায়েন্স লাইব্রেরি কর্তৃক সংগৃহিত লেডি ইমপে সংগ্রহশালার আঠারোটি ছবি বর্তমানে অক্সফোর্ডের অ্যাশমোলিয়ান

মিউজিয়ামে রয়েছে।[১২৯] এছাড়া লন্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, ওয়েলকাম ইনস্টিটিউট ও ব্রিটিশ লাইব্রেরির ইন্ডিয়া অফিস সংগ্রহশালা, স্যান ডিয়েগো মিউজিয়াম অফ আর্ট এবং নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্টেও মেরি ইমপের সংগ্রহশালার কিছু ছবি রয়েছে।[১৩০] ব্রিটিশ আমলের ভারতীয় চিত্রকলার ইতিহাস এবং বিজ্ঞানচর্চা বিষয়ক একাধিক বিখ্যাত পুস্তকেও এ সংগ্রহশালার বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করা হয়েছে।[১৩১] অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে ইউরোপিয় প্রভাবে বাংলার চিত্রকলার আঙ্গিক ও রীতিতে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, এ সিরিজের ছবিগুলো তারই সাক্ষী হয়ে আছে।

লেডি মেরি ইমপে এবং তাঁর শিল্পীরা

অক্সফোর্ডশায়ারের বাসিন্দা স্যার জন রিডের কন্যা অ্যানা মারিয়ার জন্ম ১৭৪৯ সালে। ১৭৬৮ সালে ১৯ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয় এলিজা ইমপের সঙ্গে এবং স্বামীর সঙ্গে ১৭৭৪ সালে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। ফোর্ট উইলিয়াম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে ইমপে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে একটি বিশাল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত বাংলোতে থাকতেন। অষ্টাদশ শতকে উদ্ভিদ ও প্রাণীর সংগ্রহশালা গড়া ব্রিটিশ অভিজাতদের কাছে

---

[১২৯] অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়াম সম্প্রতি এ ছবিগুলো নিয়ে *Lady Impey's Bird Paintings* শিরোনামে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। ২০১২ সালের ১৬ অক্টোবর শুরু হওয়া এ প্রদর্শনীটি শেষ হয় ২০১৩ সালের ১৪ এপ্রিল। দ্রষ্টব্য, http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/6980/10198, retrieved on 2 October, 2013.

[১৩০] http://www.sothebys.com/en/ecat.pdf.L11220.html/f/255/L11220-255.pdf, retrieved on 2 February, 2013.

[১৩১] দ্রষ্টব্য, M. and W. G. Archer, *Indian Painting for the British*, Oxford, 1955, plate nos.6-9; T. Falk and G. Hayter, *Birds in an Indian Garden*, London, 1984; S. C. Welch, *India. Art and Culture 1300-1900*, New York, 1985, plate no. 281; B. N. Goswamy and E. Fischer, *Wonders of a Golden Age*, Zurich, 1987, plate no.109.

আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। কলকাতার বাড়িতে ইমপে পরিবার সে রকম একটি সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিল। তবে শুধুমাত্র বাগান আর খুদে চিড়িয়াখানা গড়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না এই বিদ্বান-বিদুষী দম্পতি, তাঁরা তাঁদের সংগ্রহশালার উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের যথাযথ ডকুমেন্টেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।[১৩২] এ উদ্দেশে ১৭৭৭ সালে লেডি ইমপে প্রথম একজন শিল্পীকে নিয়োগ দেন। পাটনা থেকে আগত এই শিল্পী ছিলেন মুসলিম, নাম শেখ জৈনুদ্দিন। লেডি ইমপের চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগেই তিনি শিল্পী হিসেবে মোটামুটি পরিচিতি পেয়েছিলেন, অংকন শিখেছিলেন পাটনাতেই। অবধারিতভাবেই সেই শিক্ষা ছিল মুঘল ঘরানার। প্রায় তিন বছর লেডি ইমপে সংগ্রহশালার জন্য তিনি একাই ছবি এঁকেছেন। তিন বছর পর তিনি দুজন সহযোগী পান। ভবানী দাস ও রাম দাস নামের এ দুই সহযোগী ছিলেন হিন্দু, কিন্তু তাঁরাও এসেছিলেন পাটনা থেকে এবং পাটনার স্থানীয় রীতিতেই প্রশিক্ষিত হয়ে। ততদিনে ভারতবর্ষ, তথা বাংলায় পেশাদার ও সৌখিন অনেক ইউরোপিয় চিত্রকরদের আগমণ ঘটেছিল, এবং তারা এখানে ইউরোপিয় ঘরানার শিল্পচর্চা শুরু করেছিলেন। মুঘল ঘরানার ছবিগুলো স্থানীয় কারিগরদের হাতে তৈরি বিশেষ ধরনের কাগজের ওপর গাঢ় জলরঙ বা গুয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা হতো। মানুষের প্রতিকৃতি অংকনের ক্ষেত্রে মুঘল ঘরানার শিল্পীরা এক ধরনের কল্পনামিশ্রিত বাস্তবতার প্রয়োগ ঘটাতেন, কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমল থেকেই বিশেষ করে পশু-পাখি ও ফুল-লতা-পাতা অংকনের ক্ষেত্রে মুঘল শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। জাহাঙ্গীরের দরবারের চিত্রকর ওস্তাদ মনসুরকে এ ক্ষেত্রে দিকপাল বিবেচনা

[১৩২] Kalikinkar K. Datta, *Survey of India's Social Life and Economic Condition in the 18th Century*, Calcutta: Munshiram Manoharlal, 2nd. rev. ed., 1978, p 134.

করা যেতে পারে।[১৩৩] চিত্রকলার অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক জাহাঙ্গীর যেখানেই যেতেন, মনসুর কিংবা কোনো না কোনো চিত্রকরকে সঙ্গে নিতেন এবং নতুন কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হলে সেগুলোর ছবি আঁকিয়ে রাখতেন। এরই ধারাবাহিকতায় মুঘল ঘরানায় প্রকৃতির রূপায়নে ফটোগ্রাফিক বাস্তবতা প্রকাশের রীতি গড়ে উঠেছিল। জৈনুদ্দিন, ভবানী দাস ও রাম দাস এই ঘরানাতেই প্রশিক্ষিত ছিলেন। তবে ইমপে সংগ্রহশালার ছবিগুলো তাঁরা এঁকেছিলেন ইউরোপে তৈরি দুধসাদা হোয়াটম্যান কাগজের ওপর, কখনো মুঘল রীতির গুয়াশ পদ্ধতিতে, কখনো বা ব্রিটিশ রীতির স্বচ্ছ জলরংয়ে। কিন্তু এমনকি জলরংয়ে আঁকা ছবিগুলোতেও বিশেষ করে রেখাঙ্কনে মুঘল রীতির ছাপ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

১৭৮৩ সালে স্যার এলিজা ইমপেকে ইমপিচ করে লন্ডনে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলে এই প্রকল্পের অকাল সমাপ্তি ঘটে, তিন সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে ইমপে দম্পতি ফিরে যান ব্রিটেনে। তবে তত দিনে ইমপে সংগ্রহশালার অংশ হিসেবে এই তিন শিল্পী এঁকেছিলেন ৩২৬টি ছবি।[১৩৪] এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি, ১৯৭টি ছবিতে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। মেরি ইমপের পাখিপ্রেম শেষ পর্যন্ত অমর হয়ে থেকেছে ভারতীয় একটি প্রজাতির পাখির নামকরণ তাঁর নামে করার মধ্য দিয়ে।[১৩৫]

ইমপে সংগ্রহশালায় সবচেয়ে বেশি সময় ধরে কাজ করেছেন শেখ জৈনুদ্দিন, এ সংগ্রহশালার বেশিরভাগ ছবিও তাঁরই আঁকা। অক্সফোর্ডের র‍্যাডক্লিফ সাইন্স লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত তাঁর আঁকা ১৪টি পাখির ছবির সবগুলোই

---

[১৩৩] Asok Kumar Das, *Mughal Painting During Jahangirs Time*, Calcutta: Asiatic Society of Bengal, 1978, pp, 148-49.

[১৩৪] http://www.sothebys.com/en/ecat.pdf.L11220.html/f/255/L11220-255.pdf, retrieved on 2 February, 2013

[১৩৫] হিমালয়ান মোনাল নামে পরিচিত এ পাখিটির ইংরেজি নাম ইমপেইয়ান মোনাল ফিজ্যান্ট।

হোয়াইটম্যান কাগজের ওপর গুয়াশ পদ্ধতিতে, গাঢ় জলরংয়ে আঁকা। এ ছবিগুলোর বেশিরভাগেরই বিষয়বস্তু বিভিন্ন প্রজাতির সারস পাখি। এর মধ্যে হাড়গিলা (ইংরেজি নাম Adjutant Stork, বৈজ্ঞানিক নাম *Leptoptilos dubius*) [১৩৬] এবং শিঙওয়াল (Pied Hornbill, *Anthracoceros malabaricus*)[১৩৭] পাখির ছবিদুটি (চিত্র ৩.১৫) মনে করিয়ে দেয় ওস্তাদ মনসুরের আঁকা বিখ্যাত তুর্কি মোরগের ছবিটির কথা । তবে শেষোক্ত ছবিটির নিচে শিল্পী যেভাবে গাছের ছায়া এঁকেছেন, তাতে আছে ইউরোপিয় ঘরানারই ছাপ। আবার চক্রবাক (Grey Heron, *Ardeacinerea*)[১৩৮] ও ফ্ল্যামিঙ্গো (Greater Flamingo, *Phoenicopteros ruber*)[১৩৯] পাখির ছবিগুলো গুয়াশ পদ্ধতিতে আঁকা হলেও রঙের ছোপ এতই হাল্কা হয়ে এসেছে যে তা প্রায় ইউরোপিয় ধারার স্বচ্ছ জলরংকেই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের একটি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত শিল্পী রাম দাসের আঁকা পেলিক্যানের (Spot-billed Pelican, *Pelecanus philippensis*)[১৪০] ছবিতে মুঘল রীতির প্রভাব আরো স্পষ্ট। মনসুরের তুর্কি মোরগের সঙ্গে পার্থক্য শুধু এখানে, যে এ পাখিটিকে আঁকা হয়েছে একেবারে ফাঁকা সাদা পৃষ্ঠার ওপর– মুঘল শিল্পীরা যেটা কখনোই করতেন না। তাঁদের আঁকা যে কোনো ছবির বিষয়বস্তুর পশ্চাদপটে অবশ্যই থাকতো সংশ্লিষ্ট ভূমিদৃশ্যের আভাস।[১৪১]

---

[১৩৬] র‍্যাডক্লিফ সায়েন্স লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড, সংগ্রহ নং LI901.1

[১৩৭] র‍্যাডক্লিফ সায়েন্স লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড, সংগ্রহ নং LI901.7

[১৩৮] র‍্যাডক্লিফ সায়েন্স লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড, সংগ্রহ নং LI901.13

[১৩৯] র‍্যাডক্লিফ সায়েন্স লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড, সংগ্রহ নং LI901.18

[১৪০] গ্রাহাম অ্যারেডার সংগ্রহ, নিউইয়র্ক।

[১৪১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, *দরবারী শিল্পের স্বরূপ মুঘল চিত্রকলা*, পৃ. ৬৮

ডেনমার্কের ডেভিডস কালেকশন সংগ্রহশালায় রক্ষিত জৈনুদ্দিনের আঁকা ঘুঘু পাখির ছবিতে[১৪২] (চিত্র ৩.১৬.ক) এ দুই রীতিকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে এক সঙ্গে—একটি বৃক্ষশাখায় বসে থাকা পাখিটির অংকনশৈলি মুঘল ঘরানার, মুঘল রীতিতেই পশ্চাদপটের ভূমিদৃশ্যের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয়েছে পাখিটিকে। কিন্তু সেই দৃশ্যপট, সবুজ পাতাসহ বৃক্ষশাখাটি আবার এমন রঙে আঁকা, যা ইউরোপিয় জলরংয়ের খুব কাছাকাছি। জৈনুদ্দিন স্বচ্ছ জলরং ব্যবহার করেননি, এঁকেছেন তাঁর অভ্যস্ত গাঢ় জলরঙেই, কিন্তু সেই রঙের ব্যবহারটা তাঁর পৃষ্ঠপোষকের রুচির সঙ্গে মেলাতে গিয়ে করে তুলেছেন প্রায় ইউরোপিয় ঘরানারই। ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত ভবানী দাসের আঁকা আমগাছের শাখা[১৪৩] (চিত্র ৩.১৬.খ) ছবিতেও ঠিক একই রকম করে ব্যবহৃত হয়েছে হালকা টোনের গুয়াশ রং।

নিউ ইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্টে রক্ষিত এই শিল্পীর আঁকা বাদুড়ের [১৪৪] (চিত্র ৩.১৬.গ) ছবিটি আবার পুরো ইউরোপিয় ঘরানার প্রেক্ষাপটে আঁকা, যেখানে কোনো পশ্চাদপট নেই। কিন্তু এতে রঙের ব্যবহার আবার মোটেই ইউরোপিয় ঘরানার নয়, মুঘল ঘরানার গাঢ় জলরঙকে খুঁজে নিতে কোনো কষ্ট হয় না।

স্যার এলিজা ইমপে এবং লেডি মেরি ইমপে চিত্রকলার সমঝদার ছিলেন। তাঁদের সংগ্রহে অনেক চিত্রিত ফারসি পাণ্ডুলিপিও ছিল। তবে ইমপে সংগ্রহশালার ছবিগুলো চিত্রকলার সমঝদার হিসেবে আঁকাননি মেরি ইমপে। ছবিগুলোর উল্টোপিঠে তাঁদের পরিবারের পক্ষ থেকে যে পরিচয় লেখা হয়েছে, সেগুলো ছবির পরিচয় নয়, ছবির বিষয়বস্তুর– অর্থাৎ তাদের সাধের উদ্ভিদ

[১৪২] ডেভিডস কালেকশন, কোপেনহেগেন, সংগ্রহ নং ৩৮/২০০৮

[১৪৩] ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম, লন্ডন, সংগ্রহ নং ওঝ.৫২-১৯৬৩

[১৪৪] মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অফ আর্ট, সংগ্রহ নং ২০০৮.৩১২

উদ্যান ও চিড়িয়াখানার উদ্ভিদ ও প্রাণীর পরিচয়।[১৪৫] কিন্তু তাঁদের অজান্তেই ইমপে পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় আঁকা এই ছবিগুলো হয়ে উঠেছে বাংলা চিত্রকলায় যুগান্তরের স্বাক্ষী। আঠারো শতক থেকে কোম্পানির কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা চিত্রকলার চিরায়ত মুঘল শৈলিকে ছাপিয়ে যে ধীরে ধীরে জায়গা করে নিচ্ছিল ইউরোপীয় শৈলি, এই ছবিগুলোতে সেই পরিবর্তনের ছাপ সুস্পষ্ট। বাংলার চিত্রকলার ইতিহাসে এই ছবিগুলোর গুরুত্ব তাই অসামান্য।

কোম্পানি আমলের শুরুর দিকে চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাম ওয়ারেন হেস্টিংস। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের দরবারে চিত্রকরদের সমাবেশ ছিল। বিভিন্ন সময়ে কলকাতা থেকে আশে-পাশের শহরে বেড়াতে যাওয়ার সময় তিনি তাঁদের সঙ্গেও নিয়ে গেছেন। হেস্টিংসের দেখাদেখি মিসেস এডওয়ার্ড হুইলার, নাথানিয়েল মিডলটন ও এমিলি ইডেনের মতো তাঁর পারিষদবর্গ ও তাঁদের পরিবারের অনেকেই চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

ঠিক এই সময়ে বিশ্ব জুড়ে দরবারি ছবির পরিবর্তে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল নিসর্গ চিত্রের ধারা। কোম্পানি আমলের শিল্পীরাও এ স্রোতের বাইরে ছিলেন না। হজেস, টমাস ও উইলিয়ম ড্যানিয়েল, মোফাট ও বালথাজারের মতো শিল্পীদের আকর্ষণের বিষয় ছিল ভারতবর্ষের মানুষজন, প্রকৃতি ও পুরাকীর্তিসমূহ। এ ধারার ছবি অংকনের ক্ষেত্রে পুরোধা ছিলেন হজেস। ১৭৮০ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন তিনি, এ সময়ে কলকাতা

[১৪৫] উদাহরণস্বরূপ, র‍্যাডক্লিফ সায়েন্স লাইব্রেরি, অক্সফোর্ড, সংগ্রহ নং এলআই ৯০১.৭ ছবিটির পেছনে সংযোজিত নোট থেকে জানা যায় *Anthracoceros malabaricus* বৈজ্ঞানিক নামের পাখি শিঙওয়াল সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা। কিন্তু চিত্রকর সম্পর্কে কোনো বর্ণনা পেছনের ওই লেখায় নেই, কেবল এক বাক্যে লেখা পাটনার বাসিন্দা জৈনুদ্দিন ছবিটি এঁকেছেন। দ্রষ্টব্য, http://jameelcentre.ashmolean.org/collection/8/per_page/25/offset/0/sort_by/date/object/12930, accessed on 2 October, 2013.

ছাড়াও বারানসী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আগ্রা প্রভৃতি শহর ভ্রমণ করে তিনি যে সব ছবি এঁকেছিলেন, সেগুলো নিয়ে দেশে ফিরে ১৭৮৩ সালে তিনি প্রকাশ করেন *'সিলেক্ট ভিউস অফ ইন্ডিয়া'* শিরোনামের একটি অ্যালবাম। মূল ছবিগুলো জলরংয়ে আঁকা হলেও এ বইগুলো ছাপা হয়েছিল এনগ্রেভিং পদ্ধতিতে। চাচা-ভাইপো দুই ড্যানিয়েলের আঁকা এ রকম দৃশ্যাবলীর এনগ্রেভিং নিয়ে বেরিয়েছিল *টুয়েলভ ভিউস অফ ক্যালকাটা* (১৭৮৬-৮৮), *ওরিয়েন্টাল সিনারি* (১৭৯৫-১৮০৮) ও *পিকচারেস্ক ভয়েজ অফ ইন্ডিয়া* (১৮১০) নামে তিনটি সিরিজ। মোফাটের *ভিউস অফ ক্যালকাটা, বেহরামপুর, মঙ্গির অ্যান্ড বেনারস* (১৮০৫) এবং সলভিন্সের *ম্যানার্স, কাস্টমস অ্যান্ড ড্রেসেজ অফ ইন্ডিয়া*'র (১৭৯৯) দুইশত পঞ্চাশটি এনগ্রেভিংয়ে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যই নয়, এর সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ভারতের হাট-বাজার, মানুষজন, তাঁদের পোশাক-আশাক ও দৈনন্দিন জীবনাচরণের ছবি।[১৪৬] বলা বাহুল্য, এরা সবাই এঁকেছেন ইউরোপীয় শৈলীতে, স্বচ্ছ জলরংয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন জীবন-ঘনিষ্ঠ বাস্তবতাকে। বিশেষ করে ড্যানিয়েলদের ছবি এত জীবন্ত ছিল, যে তাঁদের আঁকা চুনার দুর্গের ছবির ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে বাংলা সরকার এ দুর্গটির সংস্কার করেছিল।[১৪৭]

পেশাদার শিল্পীদের মধ্যে চিনারি প্রতিকৃতি আর প্রাকৃতিক দৃশ্য, উভয় ক্ষেত্রে দারুণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি কলকাতায় আর্ট স্কুল খুলে বসেছিলেন যেখানে স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি চিত্রকলা চর্চায় প্রশিক্ষণ নিয়েছেন কোম্পানির সিভিলিয়ান কর্মকর্তারাও। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন

---

[১৪৬] Robert L. Hardgrave, Jr, 'A Portrait of Black Town: Baltazard Solvyns in Calcutta, 1791-1804.' In *Changing Visions, Lasting Images: Calcutta Through 300 Years,* edited by Pratapaditya Pal, 31-46. Bombay: Marg, 1990.

[১৪৭] John Garvey, *William Daniell's Isle of Skye & Raasay,* London: Matador UK, 2009, p. 29.

চার্লস ড'য়লি । ঢাকার কালেক্টর ড'য়লির আমন্ত্রণে চিনারি ঢাকায় এসেছিলেন, দুজনে মিলে উনিশ শতকের ঢাকার অনেক ছবি এঁকেছেন । ড'য়লির ছবিগুলো নিয়ে পরে বেরিয়েছে তাঁর বহুল আলোচিত *'অ্যান্টিকুইটিজ অফ ঢাকা'*, সেই বইয়ের এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া ২০টি লিথোগ্রাফের মধ্যে অন্তত তিনটি চিনারির আঁকা ছবি অবলম্বনে খোদাই করেছিলেন লন্ডনের বিখ্যাত লিথোগ্রাফার জন ল্যান্ডসিয়ার ।

ড'য়লির মতোই আরেকজন সৌখিন ক্রেইটন গভীর দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন বাংলার বিভিন্ন প্রত্নসম্পদকে । ড'য়লির *ভিউজ অফ ক্যালকাটা* আর *অ্যান্টিকুইটিজ অফ ঢাকা* সিরিজের ছবিগুলো যেমন দুটি শহরের সমকালীন ইতিহাসের অমূল্য দলিল, ক্রেইটনের আঁকা গৌড়ের ছবিগুলোও তা-ই । ক্রেইটন, ড'য়লির মতো শিল্প সমঝদার সিভিলিয়ানরা কেবল নিজেরাই ছবি আঁকেননি, এমন ছবি আঁকার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন স্থানীয় শিল্পীদেরও । তাছাড়া কোম্পানির বিভিন্ন কাজেও, বিশেষ করে ড্রাফটসম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল অনেক স্থানীয় শিল্পীকে । যে কোনো ছবির অনুকৃতি তৈরিতে স্থানীয় শিল্পীদের দক্ষতার প্রশংসা করেছেন অনেক ইউরোপীয় চিত্রকলাবিদরাই, কিন্তু আধুনিক কৌশল, বিশেষত পরিপ্রেক্ষিত ও আলো-ছায়ার ব্যবহারে তাদের দক্ষতা নিয়ে সংশয় ছিল তাদের ইউরোপীয় পৃষ্ঠপোষকদের । সে দুর্বলতা দূর করতে ইউরোপীয় শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল স্থানীয় শিল্পীদের । বিশেষ করে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতার নিকটবর্তী বারাকপুরে 'ইনস্টিটিউট ফর প্রোমোটিং ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া' এবং শিবপুরের 'বোটানিক গার্ডেন' নামের প্রতিষ্ঠান দুটি গড়ে তোলার পর সেখানকার পশুপাখি ও গাছপালার ছবি আঁকার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয় । ন্যাচারাল হিস্ট্রি ইনস্টিটিউটের জন্য রবার্ট হোম যে সব ছবি

এঁকেছিলেন, তার মধ্য থেকে ২১৫টি নিয়ে দুখ-র একটি অ্যালবাম ছাপা হয়েছিল। ভারতীয় যে সব শিল্পী এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ছবি এঁকেছিলেন, তাঁদের ছবিতেও হোমের প্রভাব সুস্পষ্ট। সীতা রাম, ইসি দাস ও শেখ মোহাম্মদ আমিরের মতো শিল্পীরা কেবল এই পশুপাখি আর গাছপালার ছবিই আঁকেননি, একই সঙ্গে তাঁরা ইউরোপীয় শিল্পীদের মতোই এঁকেছেন বিভিন্ন নৈসর্গিক দৃশ্যও। স্বচ্ছ জলরংয়ে আঁকা সে সব ছবি যেন একেবারে ফটোগ্রাফিক বাস্তবতায় ফুটিয়ে তুলেছে প্রকৃতি, জীবজন্তু আর প্রত্নবস্তুকে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলায় চিত্রকলা চর্চার ইতিহাসের বিশ্লেষণ থেকে একটা বিষয় পরিস্কার বোঝা যায়, বাংলায় চিত্রকলা চর্চার হাজার বছরের ঐতিহ্যে এ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছিল। বাংলার চিত্রকলা মধ্যযুগ ছাড়িয়ে প্রবেশ করছিল আধুনিক যুগে। তাতে ওই সময় ইউরোপ থেকে আসা পেশাদার-অপেশাদার শিল্পীদের প্রভাব অবশ্যই ছিল। তাদেরই প্রভাবে মুঘল শৈলীর রং ও অংকন রীতি বদলে স্থান করে নিচ্ছিল ইউরোপীয় ধারার রীতিকৌশল। তবে এ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নিয়ামক ছিল খুব সম্ভব পৃষ্ঠপোষকদের রুচিবোধ ও চাহিদা। এরই প্রভাবে মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার দরবারি চরিত্র বদলে ধীরে ধীরে স্থান করে নিচ্ছিল আধুনিকতা। দরবারের ঘটনাবলী বা অভিজাতদের প্রতিকৃতির স্থান দখল করে নিচ্ছিল নিসর্গচিত্র কিংবা ফটোগ্রাফিক আদলে আঁকা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি। আর এ নতুন ভাবনার বিকাশে স্থানীয় শিল্পীদের অবদানও কোনো অংশে কম ছিল না। কখনো ইউরোপীয় ধারায় প্রশিক্ষণ নিয়ে, কখনো বা অনুকৃতি তৈরিতে সহজাত দক্ষতার গুণেই তাঁরা আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন এ নতুন কৌশল, আর তার সঙ্গে নিজেদের ভাবনা ও চিত্রকল্পের সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছিল বাংলা চিত্রকলার কোম্পানি শৈলী।

চিত্র: ৩.১ উইলিয়ম ফুলারটনের প্রতিকৃতি; শিল্পী: দীপ চাঁদ
ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএম ৩৩-১৯১২

চিত্র ৩.২ ফুলারটনের নেটিভ কর্মচারী
শিল্পী: দীপ চাঁদ, ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম
সংগ্রহ নং ১১৮২-১৯০৩

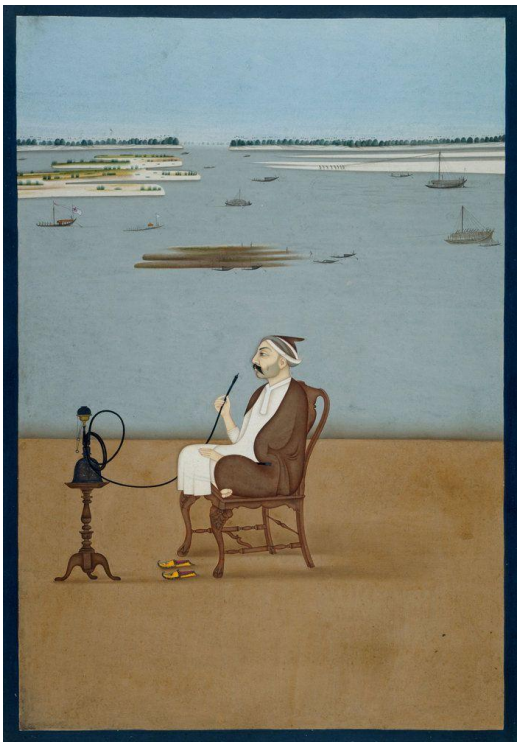

চিত্র ৩.৩ আশরাফ আলী খানের প্রতিকৃতি
শিল্পী: দীপ চাঁদ
(ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ নং ৭৬৩)

চিত্র ৩.৪ আশরাফ আলী খানের স্ত্রী মুতুবির প্রতিকৃতি
শিল্পী: দীপ চাঁদ
(ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ নং ৭৩৫)

চিত্র ৩.৫ এবং ৩.৬ নবাব সুজাউদ্দৌলার পোর্ট্রেট, শিল্পী: টিলি কেটল, ক্যানভাসে তেল রঙ
(বাঁয়ের ছবিটি কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে রক্ষিত, ডানেরটি ইয়েল সেন্টার ফর ব্রিটিশ আর্ট, কানেকটিকাটে)

চিত্র ৩.৭ : নবাব সুজাউদ্দৌলার পোর্ট্রেট, টিলি কেটলের পোর্ট্রেট অবলম্বনে, শিল্পী অজ্ঞাত, কাগজে ঘন জলরঙ
(ফাইন আর্টস মিউজিয়াম স্যানফ্রান্সিসকো, সংগ্রহ নং: ১৯৮২.২.৭০.১)

চিত্র ৩.৮ : মেজর পালমারের পরিবার, শিল্পী : জন জোফানি
(ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ নং এফ ৫৯৭)

চিত্র ৩.৯ : মির্জা হায়দার বেগের দৌত্য, শিল্পী: জন জোফানি
(ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালা, কলকাতা, সংগ্রহ নং : R1740-C985-1131)

চিত্র ৩.১০ : কর্নেল পলিয়ের ও বন্ধুগণ, শিল্পী: জন জোফানি
(ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সংগ্রহশালা, কলকাতা; সংগ্রহ নং: R1740-C985-1132)

চিত্র ৩.১১ : লালবাগের দক্ষিণ তোরণ, শিল্পী রবার্ট হোম
(ডেইলসফোর্ড হাউজ সংগ্রহশালা, গ্লস্টারশায়ার, যুক্তরাষ্ট্র)

চিত্র ৩.১২ : তাকিয়ায় বসা মুসলিম মহিলা, শিল্পী ফ্রান্সিসকো রেনাল্ডি
(ইয়েল সেন্টার ফর ব্রিটিশ আর্ট, যুক্তরাষ্ট্র)

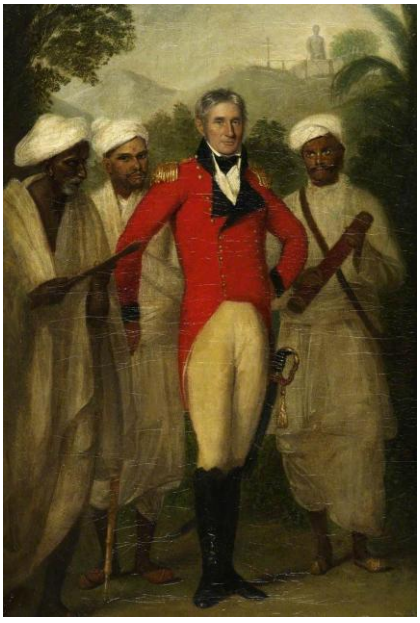

চিত্র ৩.১৩ কর্নেল ম্যাকেঞ্জি
শিল্পী: টমাস হিকি
(ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ)

চিত্র ৩.১৪ ইমপে পরিবার, শিল্পী: জোহান জোফানি,
[মিউজিও ন্যাসিওনাল, মাদ্রিদ; সংগ্রহ নং ৪৪৫ (১৯৮৬.১১)]

চিত্র ৩.১৬.ক : ঘুঘুপাখি,
শিল্পী : শেখ জৈনুদ্দিন;
(ডেভিডস কালেকশন, ডেনমার্ক)

চিত্র ৩.১৬.খ : আমগাছের শাখা
শিল্পী : ভবানী দাস
(ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট
মিউজিয়াম, লন্ডন)

চিত্র ৩.১৬.গ : বাদুড়
শিল্পী : ভবানী দাস
(মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম, নিউইয়র্ক)

চিত্র ৩.১৭ : পাগলা পুল, মূল ড্রইং: চার্লস ড'য়লি, লিথোগ্রাফ এনগ্রেভিং: জন ল্যান্ডসিয়ার
(*অ্যান্টিকুইটিজ অফ ঢাকা* গ্রন্থ থেকে)

চিত্র ৩.১৮ : দাখিল দরওয়াজা, মূল ড্রইং: হেনরি ক্রেইটন, একুয়াটিন্ট এনগ্রেভিং: জেমস মোফাট
(ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ নং ৩৪৮৮২)

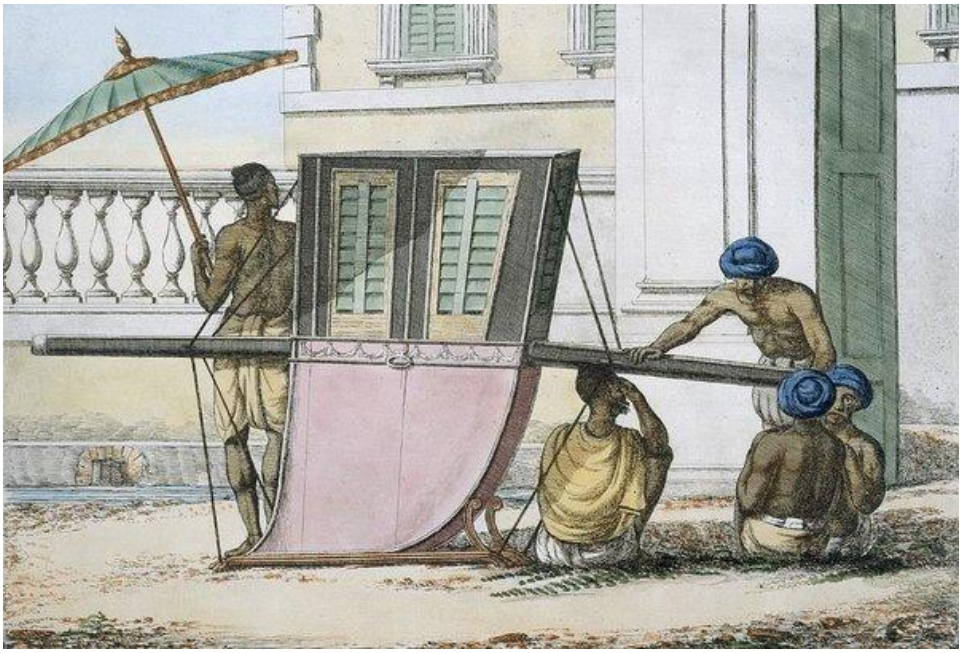

চিত্র ৩.১৯: পালকি তৈরি; শিল্পী: ফ্রাঁসোয়া বালথাজার্ড সলভিনস; জলরঙে আঁকা ছবির একুয়াটিন্ট প্রিন্ট
(ম্যানার্স, কাস্টমস অ্যান্ড ড্রেসেজ অফ ইন্ডিয়া, ১৭৯৯ গ্রন্থে মুদ্রিত)

চিত্র ৩.২০ : কাপড় ইস্ত্রি করছে ধোপা, শিল্পী: শেখ মোহাম্মদ আমির
(ন্যাশনাল গ্যালারি অফ অস্ট্রেলিয়া সংগ্রহ)

চিত্র ৩.২১ : দুটি কুকুর, শিল্পী: শেখ মোহাম্মদ আমির, ঘন জলরঙ
(ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ৬-১৯৫৭)

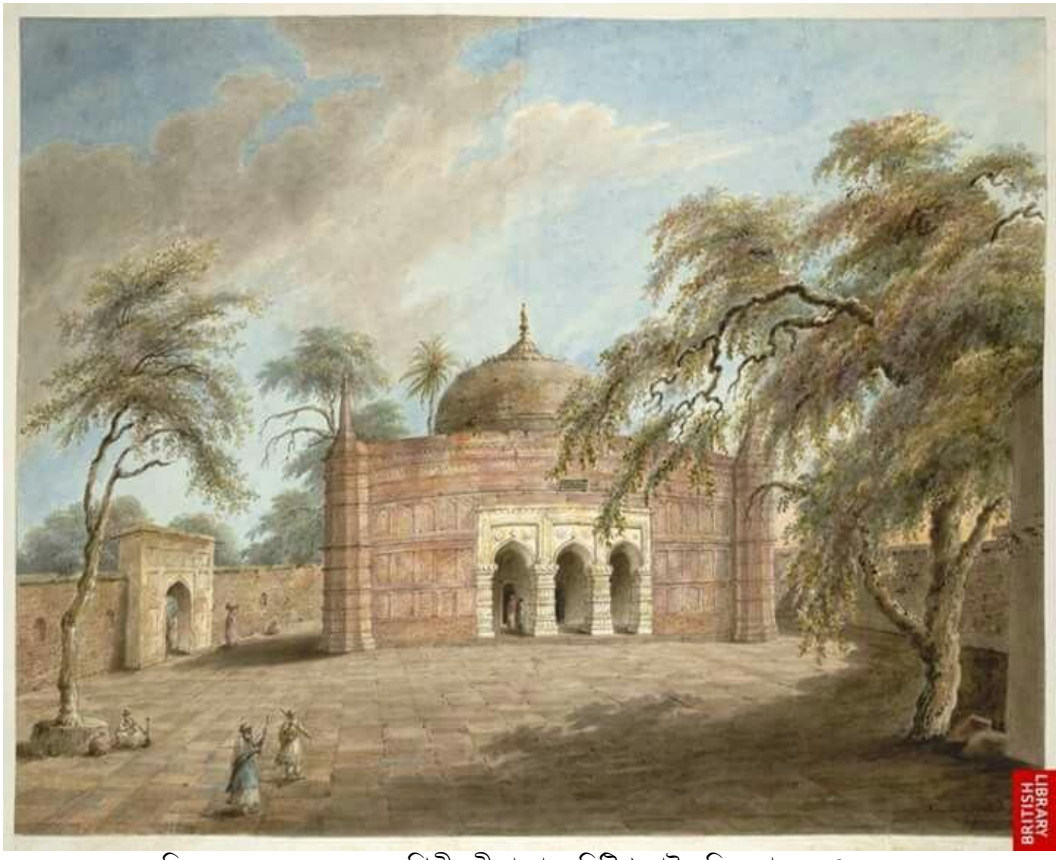

চিত্র ৩.২২ : কদম রসুল, শিল্পী: সীতা রাম, ব্রিটিশ লাইব্রেরি সংগ্রহ নং ৪৮৮৬

চতুর্থ অধ্যায়

গণমানুষের চিত্রকলা

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে আঠারো ও উনিশ শতকে বাংলার অভিজাত সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত চিত্রকলার রূপ-প্রকৃতি আলোচিত হয়েছে। এর বাইরেও বহু প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় চিত্রচর্চার একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক ধারা বিদ্যমান ছিল। রাজণ্যবর্গ এবং অভিজাত শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতার বাইরের এ ধারাটি ছিল একান্তই লোকায়ত, যার পৃষ্ঠপোষক ও ভোক্তা শ্রেণি ছিল বাংলার সাধারণ মানুষ, যাদের বেশিরভাগ ছিল গ্রামবাসী। এই ধারার শিল্পীরাও ছিলেন গণমানুষের দলে এবং তাঁরা ব্যবহার করতেন এমন সব উপকরণ যেগুলো তুলনামূলক সহজলভ্য ও মানের দিক থেকে খানিকটা নিম্নস্তরের। বিহার কিংবা রাজার দরবারে পুঁথিচিত্র ও অন্যান্য পাণ্ডুলিপি যে বিশেষ যত্ন ও সম্মানের সঙ্গে সংরক্ষিত হতো এ সমস্ত চিত্র সেই সুবিধাও পেত না। পৃষ্ঠপোষক বা ভোক্তাদের বাড়িঘরগুলোও সে রকম স্থায়ী উপকরণ দিয়ে তৈরি হতো না বলে আসলে এই ধরনের চিত্রকলার সংরক্ষণও হয়নি সেভাবে। এ কথা প্রণিধানযোগ্য যে, প্রাচীন আমলের বাংলার লোকায়ত চিত্রের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে নানা সূত্র থেকে পাওয়া বর্ণনা থেকে অনুমান করে নেয়া যায়, সেই পুঁথিচিত্রের যুগ থেকে কিংবা হয়তো তারও আগে থেকে বাংলার গ্রামে গ্রামে চিত্রচর্চার একটি জনপ্রিয় ধারা ছিল পটচিত্র। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে

গ্রামশিল্পী এবং রাজশিল্পী, এ দুই বর্গের কথা উল্লেখ করেছেন।[১৪৮] পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উল্লেখ রয়েছে যে গ্রামশিল্পীরা পথের ধারে লোকজনকে হাতে আঁকা পটের সাহায্যে *কংসবধ পালা* দেখাচ্ছেন।[১৪৯]

পট এঁকে তার সাহায্যে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষকে নানা রকম ধর্মকথা শোনাতেন বলে এই লোকশিল্পীদের পরিচয় ছিল পটুয়া নামে। পটুয়ারা যেসব কাহিনী অবলম্বন করে তাঁদের ছবি আঁকতেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলো ছিল মূলত নানা রকমের ধর্মীয় ও লৌকিক কাহিনী: বিভিন্ন দেব-দেবীদের ঘিরে রচিত পৌরাণিক আখ্যান, কিংবা মুনি-ঋষি বা পীর-দরবেশদের অলৌকিক কীর্তি-কলাপভিত্তিক লোককাহিনী।

তবে মনে রাখা দরকার, ধর্মীয় আবেগ যুক্ত থাকলেও পটচিত্র কিন্তু ধর্মপ্রচারের উদ্দেশে নয়, বরং বিকশিত হয়েছিল শিল্পীদের জীবিকার মাধ্যম হিসেবে। সন্দেহ নেই, বাংলার লৌকিক চিত্রকলার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম ছিল পটচিত্র। তবে এ ছাড়াও নানা ধর্মীয়-সামাজিক প্রয়োজনে বাংলার শিল্পীরা আলপনা, মনসাঘট, লক্ষ্মীর সরা, মঙ্গলঘট ইত্যাদি লৌকিক শিল্পকর্মের চর্চা করে আসছেন প্রাচীনকাল থেকেই। উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক ধারার শিল্প-ইতিহাস বিকাশের যুগ থেকে এ সব লৌকিক শিল্পকে সাধারণত কারুশিল্প হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়ে আসছে, তবে সখের হাঁড়ি, মনসাঘট, লক্ষ্মীর সরা ইত্যাদি কেবলই স্বকীয়তা-বিবর্জিত সাধারণ তৈজসপত্র নয়। মাটির তৈরী সাধারণ হাঁড়ির গায়ে রঙ-তুলি দিয়ে মাছ, পাতা কিংবা রেখা দিয়ে নকশা এঁকে শিল্পীতভাবে সাজানো হলে তবেই তা সখের

---

[১৪৮] Panini, *The Ashtadhyayi,* Translated into English by Srisa Chandra Vasu, Benares : Sindhu Charan Bose, The Panini Office, 1897, Vol. VI, Chap 2, Sloka 82.

[১৪৯] Surendranath Dasgupta, *The Mahābhāsya of Patañjali with annotation (Ahnikas I–IV),* Delhi: Indian Council of Philosophical Research, 1991.

হাঁড়ির মর্যাদা পায়; মনসাঘট বা লক্ষীর সরাও বাঙালি শিল্পীর তুলিতে হয়ে ওঠে অনন্য শিল্পকর্ম। মোটিফের ক্ষেত্রে বৈচিত্রের অভাব বা পৌনপুণিকতার দোষেই এগুলোকে চারুশিল্পের মর্যাদা দিতে চাননি ব্রিটিশ শিল্প-সমালোচকরা। একই কথা খাটে নকশি পাটির বুননশিল্পের ক্ষেত্রে– এতে রঙ-বেরঙের বেত দিয়ে বুনন কৌশলে গাছ, পাখি, মসজিদ ইত্যাদির ছবি ফুটিয়ে তোলেন কারিগররা। এ সব ছবির শিল্পমূল্য অনস্বীকার্য।

আলোচ্য সময়ে বাংলার চিত্রকলায় যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ধারা চলছিল, লোকায়ত শিল্পকলায়ও তার ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। এর সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় উদাহরণ কালিঘাটের পট। আলোচ্য সময়ের চিত্রকলায় দেশজ এবং ইউরোপীয় রীতির সংঘাত ও সংশ্লেষণের প্রক্রিয়ার এক অনবদ্য উদাহরণ এই পটচিত্র। কাগজে দেবদেবীর মূর্তির পাশাপাশি সমকালীন সমাজের নানা দিক নিয়ে ব্যঙ্গচিত্রও আঁকতেন কালিঘাটের শিল্পীরা, কালী মন্দিরের তীর্থযাত্রীদের কাছে স্মারক হিসেবে তা বিক্রি করা হতো এক পয়সা থেকে চার পয়সায়। দামে যত সস্তাই হোক, এই পটের মধ্য দিয়েই আধুনিকায়নের পর্বে বাংলা চিত্রকলায় যুক্ত হয়েছিল লৌকিক ধারার প্রভাব। তবে এ নিয়ে আলোচনার পূর্বে বাংলায় পটচিত্র ধারা বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা প্রয়োজন।

পটচিত্রের পূর্ব ইতিহাস

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সংস্কৃত ‘পট্ট’ (কাপড়) শব্দ থেকে ‘পট’ শব্দের উৎপত্তি। এই পটে অঙ্কিত চিত্রই হচ্ছে পটচিত্র। পঞ্চদশ শতকেই মূলত বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত বিষয়বস্তুকে ঘিরে পটচিত্রের ধারা অত্যন্ত বেগবান হয়েছিল। পাল আমলের পর বাংলা চিত্রকলায় যে সাময়িক অবক্ষয়ের সূচনা ঘটেছিল, বলা যায় এর মধ্য দিয়ে সেটির অবসান ঘটেছিল। পটচিত্রের ধারায় অঙ্কিত ছবির প্রাচীনতম যে নিদর্শন সংরক্ষিত হয়েছে সেটি ১৪২১ শকাব্দ বা ১৪৯৯

সালের একটি বিষ্ণুপুরাণ পাণ্ডুলিপি, বর্তমানে কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত।[১৫০]

পট প্রধানত দু প্রকার দীর্ঘ জড়ানো পট ও ক্ষুদ্রাকার চৌকা পট। জড়ানো পট ১৫-৩০ ফুট লম্বা ও ২-৩ ফুট চওড়া হয়। আর চৌকা পট হয় ছোট আকারের। কাপড়ের উপর কাদা, গোবর ও আঠার প্রলেপ দিয়ে প্রথমে জমিন তৈরি করা হয়। তারপর সেই জমিনে পটুয়ারা তুলি দিয়ে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করেন। পটে নানা ধরনের দেশজ রং ব্যবহৃত হয়। ইঁটের গুঁড়া, কাজল, লাল সিঁদুর, সাদা খড়ি, আলতা, কাঠ-কয়লা ইত্যাদিও রঙের কাজে ব্যবহার করা হয়। পটটিকে সাধারণত কয়েকটি অংশে ভাগ করে তার উপর লাল, নীল, হলুদ, গোলাপি, বাদামি, সাদা ও কালো রং লাগিয়ে ছবি আঁকা হয়। তুলি হিসেবে ব্যবহৃত হয় কঞ্চির ডগায় পশুর লোম বা পাখির পালক।

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে আজও একটি বিশেষ চিত্রকর সম্প্রদায় এক আখ্যানধর্মী লোকচিত্রকলার পেশায় নিয়োজিত। 'পটুয়া' নামে পরিচিত এ সম্প্রদায়ের উদ্ভবের ইতিহাস নিয়ে প্রচলিত পৌরাণিককাহিনী পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণীত হয়েছে। উক্ত কাহিনী অনুসারে হিন্দু সমাজে পটুয়াদের সামাজিক উত্তরণ অসম্ভব ছিল বলে এক পর্যায়ে তারা একযোগে ইসলাম গ্রহণ করে। তবে তাঁদের পেশার প্রতি মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গিও খুব ইতিবাচক ছিল না। উপরন্তু, ইসলাম গ্রহণের পরও পেশাগত ঐতিহ্যের অংশ হিসেবে তাদের মধ্যে নানা রকম লৌকিক আচার প্রচলিথ থাকায় মুসলিম জনসমাজের মূলধারায় তারা মিশতে বা আত্মীকৃত হতে পারেনি কখনোই। সে কারণে লোকেরা অনেক ক্ষেত্রেই দ্বৈত পরিচয়ে পরিচিত হয়। এমনকি তাদের দুই রকমও নামও রাখা হয়; নিজ সমাজের মধ্যে তারা তাদের মুসলিম নামে পরিচিত আবার হিন্দু গ্রাহকদের কাছে তাদের পরিচয় দেওয়া হয় হিন্দু

[১৫০] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পৃ. ৪৯।

নামেই । তবে নামের সঙ্গে অবধারিতভাবেই তারা 'পটুয়া' উপাধিটি ব্যবহার করে থাকে, যা তাদের পেশাকে নির্দেশ করে ।

পটুয়াদের চিত্রকর্ম পটচিত্র অবশ্য বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়, তাদের বংশানুক্রমিক পেশা রক্ষার উপায় । এ শিল্পশৈলীর উত্তরাধিকার এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষে বর্তায় । পটুয়া, পটিদার ও পট- এ সব নামে একজন চিত্রকর সাধারণত পরিচিত । চিত্রকর একাধারে কবি, গায়ক ও চিত্রশিল্পী । চিত্রকর হিন্দু অতিকথার আখ্যান কাহিনীকে ছড়ার আকার দেয় । আর তাতে একটা নীতি শিক্ষার বিষয়ও থাকে । জড়ানো পটে ধারাবাহিক কয়েকটি কাঠামো বা ফ্রেমে আখ্যানকাহিনীর ধারাচিত্রগুলি আঁকে পটচিত্রকর । গ্রাহকের কাছে সে তার জড়ানো পটের ধারাবাহিক ছবিগুলো একের পর এক খুলে ধরে বর্ণনা করে যেতে থাকে । আর তার মাঝে যে নীতি শিক্ষার বিষয় তুলে ধরা হয় তাতে জীবনের নানা পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে শ্রোতারা সজাগ হয়ে ওঠে ।

প্রাচীন আমল থেকে বাংলায় প্রচলিত পটের বিষয়বস্তু ছিল সাধারণত ধর্মীয়, সামাজিক ও কাল্পনিক । বৌদ্ধ ভিক্ষুরা অষ্টম শতাব্দী থেকে বুদ্ধদেবের জীবনী-সংক্রান্ত জাতকের গল্পসম্বলিত 'মস্করী' নামক পট প্রদর্শন করতেন । পরবর্তী সময়ে হিন্দুধর্ম ও পুরাণ হয় পটের প্রধান বিষয় । হিন্দুদের বিভিন্ন দেবদেবী, যেমন: দুর্গা, কালী, মনসা, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, যম, চ-ী, দশ-অবতার প্রভৃতি; পৌরাণিক কাহিনী, যেমন: রামলীলা, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদি, এমনকি কৈলাস, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ইত্যাদি পবিত্র স্থানসমূহও এতে মূর্ত হয়ে ওঠে । এছাড়া জাদু, গাজী এবং হিতোপদেশমূলক চিত্রপটও অঙ্কিত হতে দেখা যায় । হিন্দুধর্মের শিব-পার্বতীলীলা, মনসামঙ্গল, চন্ডীমঙ্গল, বৈষ্ণবধর্মের শ্রীগৌরাঙ্গলীলা ইত্যাদি পটের আকর্ষণীয় বিষয় । রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী, যেমন: রামের বনবাস, সীতাহরণ, রাবণবধ, কৃষ্ণলীলা ইত্যাদিও পটে অঙ্কিত হয় ।

হিন্দু ধর্মভিত্তিক এ সব বিষয়বস্তুর পাশাপাশি সাধারণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্যও আলাদা এক ধরনের পটের বিকাশ ঘটে। এ সব পটের বিষয়বস্তু মুসলিম সুফি-সাধক বা সমরবিজেতাদের কাহিনী। 'গাজীর পট' নামে পরিচিত এই পটের একটি অতি পরিচিত বিষয়বস্তু ছিল গাজীকালু-চম্পাবতীর কাহিনী। এ ধরনের পটচিত্রের কাহিনী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে স্থান পেয়েছে মানিকপীর, মাদারপীর, সত্যপীর, কালু ফকির, বনবিবি প্রভৃতি সম্পর্কে নানা অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম। কখনও কখনও প্যাঁচা, বানর, গরু, বাঘ, সাপ, কুমির এবং গাছপালাও স্থান পায়। লোকধর্মে বিশ্বাসী সাধারণ মানুষ অনেক সময় পটুয়া এবং পটচিত্রকে ঝাড়ফুঁকের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে। অনেকে গৃহে পটচিত্র সংরক্ষণ করাকে কল্যাণ এবং দৈব-দুর্বিপাক থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বলেও মনে করে।

বারো-তেরো থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত বাংলার পটুয়ারা এ শিল্পকর্ম নির্মাণে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিলেন। বাংলাদেশের ঢাকা, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ ও রাজশাহী জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি ও মেদিনীপুর ছিল এ শিল্পের প্রধান ক্ষেত্র।

কলকাতার কালীঘাট ও পটচিত্রের নবজীবন

আমাদের আলোচ্য সময়ে পটচিত্রের ধারাটি বিকশিত হয়েছিল কলকাতার বিখ্যাত কালীঘাটকে কেন্দ্র করে। এই চিত্রধারার সূচনা যে ইমারতটিকে ঘিরে, সেই কালীমন্দির সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত। তবে ঐতিহাসিক ইমারত এবং নাগরিক কেন্দ্র হিসেবে এর বিকাশের শুরু ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে, স্থানীয় জমিদার সন্তোষ রায় চৌধুরী কর্তৃক মন্দিরের বর্তমান কাঠামোটি নির্মাণের মধ্য দিয়ে। কলকাতা তখন ব্রিটিশ ভারতের নতুন রাজধানী হিসেবে গড়ে উঠছে। বিকাশমান এই নগরীতে পরিষ্কার দুটি ধারা বিদ্যমান ছিল- মূল

রাজধানী এলাকাটিকে চিহ্নিত করা হয় 'হোয়াইট টাউন' বা শ্বেত নগর হিসেবে, যেখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তাসহ ব্রিটেন থেকে আসা শাসক গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা ইউরোপীয় স্টাইলে গড়ছিলেন তাদের বিশাল বিশাল ম্যানসনগুলো। এই কেন্দ্রকে ঘিরে চতুর্দিকেই বেড়ে উঠছিল 'ব্ল্যাক টাউন' বা নেটিভদের এলাকা। দক্ষিণ কলকাতার কালিঘাট এলাকা এই ব্ল্যাক টাউনেরও একেবারে শেষ প্রান্তে ছিল। কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিন নানা কাজে কলকাতা নগরীতে বেড়াতে আসা বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে একই সঙ্গে দর্শনীয় এবং তীর্থস্থান হিসেবে খুব দ্রুতই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল কালীঘাটের মন্দিরটি। প্রতিদিন যে বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থী এখানে বেড়াতে আসতেন, তারা চাইতেন সঙ্গে করে কোনো একটি স্মারক নিয়ে যেতে। তাদের এই চাহিদাই ভাগ্যের সন্ধানে মেদেনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও হুগলির মতো এলাকা থেকে কলকাতায় পা রাখা পটুয়াদের সামনে খুলে দিয়েছিল সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত।

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে মুর্শিদাবাদের নবাবী প্রতিষ্ঠার পর থেকেই বাংলায় এক নতুন অভিজাত শ্রেণির যাত্রা শুরু হয়েছিল, নিজেদের আভিজাত্য প্রকাশের অন্যতম উপায় হিসেবে যারা চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। নবাবী শাসন পতনের পরও এই ধারা অব্যাহত ছিল, কোম্পানির শাসনামলেও বাংলায় ভূ-অভিজাত বা সামন্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটেছে। এই শ্রেণির প্রতিনিধি, রাজধানীর বাইরের ছোটখাটো জমিদাররাও চিত্রকরদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে খ্যাত ১৭৭০ সালের মহা দুর্ভিক্ষ এই জমিদারদেরকেও প্রায় নিঃস্ব করে ফেলেছিল। জনসেবা বা বিলাস-ব্যসনে যথেষ্ট ব্যয় করার মতো সামর্থ্য তাদের আর অবশিষ্ট ছিল না। ফলে গ্রামবাংলার যে সব চিত্রশিল্পী তাদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে আসছিলেন, তাদেরকেও মুখোমুখি হতে হয়েছিল অস্তিত্বের সংকটের। ঠিক এই সময়ে

আবার নতুন রাজধানী হিসেবে কলকাতা নগরের বিকাশ ঘটছিল, সেখানে গড়ে উঠছিল এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি আর তাদের 'বাজার'। সেই বাজারে ভাগ্য গড়তে অন্য অনেকের সঙ্গে কলকাতায় পা রেখেছিলেন আশপাশের জেলা বিশেষ করে মেদেনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও হুগলি এলাকার পটুয়ারাও।

কাপড়ে কিংবা সরার ওপর দেব-দেবীদের ছবি আঁকতে আগে থেকেই অভ্যস্ত ছিলেন তাঁরা। কলকাতার বাজার, বিশেষ করে কালীঘাট তাদের সামনে খুলে দিয়েছিল সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। কালীঘাটের তীর্থযাত্রীদের বেশিরভাগই ছিলেন সমাজের একেবারে নিচের স্তরের মানুষ, তাদের কাছে স্মারক হিসেবে দেব-দেবীদের ছবির একটা চাহিদা ছিল। সম্ভাব্য ভোক্তাদের সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করেই কালীঘাটের শিল্পীরা বদলে ফেলেন উপকরণ, এমনকি ছবি আঁকার কৌশলও। সস্তা কাগজে, নিজেদের বানানো তুলি আর সহজলভ্য জলরঙ ব্যবহার করে এমন ছবি আঁকতে শুরু করেন যেগুলো মাত্র এক পয়সা থেকে শুরু করে এক আনা বা চার পয়সায় বিক্রি করা সম্ভব। জড়ানো পটে আঁকা ধারাবাহিক গল্পের স্থান সংকুলান হওয়া সম্ভব ছিল না এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে, তাই চৌকো পটের রীতিকেই বেছে নিয়েছিলেন তারা। ফোলিও আকারের কাগজে এঁকেছেন একেকজন দেব-দেবী কিংবা একটি ঘটনার ছবি। যদিও অনেক ক্ষেত্রেই এই একক ঘটনার অনেকগুলো ছবির সিরিজে লুকিয়ে থাকতো কোনো একটা গল্প।

তাঁদের আঁকা সব পটচিত্রই যে এমন ছিল তা অবশ্য নয়, আসলে কালীঘাটে দুই ধরনের পট বিক্রি হতো।[১৫১] সাধারণ গ্রাহকদের উপযোগী 'রাশি পট', সস্তা কাগজে খুব কম রঙ ব্যবহার করে, অল্প সময়ের মধ্যে অনেক সংখ্যায়

[১৫১] B.N. Mukherjee, *Kalighat Patas (Paintings and Drawings of the Kalighat Style)*, a catalogue of the collections in the Indian Museum, Calcutta, 1987, pp 4-5.

তৈরি করা এই সব পট আঁকা হতো হাতে কিংবা কারখানায় তৈরি পাতলা কাগজে, এগুলোর আকার ছিল ৪২-৪৬ সে.মি.×২৭-২৮ সে.মি. অথবা ৩৬-৩৭ সে.মি.×২৭-২৮ সে.মি. । আবহমান কাল ধরে বাংলার গ্রামে গ্রামে চিত্রকলার চর্চা করে আসা পটুয়ারা নিজেরাই রঙ তৈরি করতেন নানা রকম খনিজ ও উদ্ভিজ্জ উপকরণ থেকে । সেই সব রঙ এ দেশের আবহাওয়া উপযোগী ছিল, কিন্তু খরচ কমানো আর সময় বাঁচানোর তাগিদে অচিরেই তাঁরা নিজেদের বানানো এই রঙ ছেড়ে ব্যবহার করতে শুরু করেন বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এমন রঙ । ততদিনে কলকাতার বাজারে এসে গেছে ইউরোপের কারখানায় তৈরি জলরঙের উপকরণ, সেগুলো ব্যবহার করতে শুরু করেন তাঁরা । কিন্তু ইউরোপীয় কেতায় কলমের সাহায্যে আউটলাইন করার সময় ছিল না 'রাশি রাশি' পট আঁকিয়ে শিল্পীদের, তাই এমনকি প্রাথমিক ড্রইংটাও তারা করতেন তুলির আঁচড়ে । আর সেই আঁচড় কাটতে গিয়েও সময় নষ্ট করতেন না মোটেই । প্রদ্যোৎ ঘোষের ভাষায় এই ছবি আঁকা হতো,

> ... with one bold sweep of the brush in wich not the faintest suspicion of even a momentary indecission; not the slightest tremor can be detected. Often the line takes the whole figure in such a way that it defies you to say where the artist's brush first touched the paper or where it finished its work. [152]

অন্য দিকে তুলনামূলক স্বচ্ছল গ্রাহকদের জন্য আঁকা হতো 'রাজা পট', উন্নত মানের মোটা কাগজে পছন্দমতো আকৃতির এই সব পটের ছবিতে রঙেও ছিল বৈচিত্র । স্বভাবতই এগুলোর দাম ছিল তুলনামূলক বেশি ।

---

[১৫২] B.N. Mukherjee, *Kalighat Patas,* pp 4-5.

কালীঘাটে যে পটুয়ারা এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তাদের পরিচয় সম্পর্কে এখানে খানিকটা আলোকপাত করা প্রয়োজন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে গ্রাম বাংলায় পটুয়া সমাজের অস্তিত্বের কথা নানা সূত্র থেকে জানা গেলেও তাদের আঁকা ছবির ধরন-প্রকরণ নিয়ে আলোচনা উনিশ শতকের আগে খুঁজে পাওয়া যায় না। কোম্পানি আমলে কলকাতায় চিত্রচর্চা করা নামী শিল্পী ফ্রাঁসোয়া বালথাজার্ড সলভিনসের লেখা থেকেই প্রথম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায়। ১৮০৮ সালে প্রকাশিত সলভিনসের *Les Hindous* গ্রন্থে কলকাতার অধিবাসী হিন্দু সমাজের নানা শ্রেণি- পেশার মানুষদের প্রতিকৃতি এবং তাদের সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে। এই পটুয়াদের সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন ছিল, যে নিজেরা যাযাবর জীবন-যাপন করলেও তাদের অন্তত জীবিকার অভাব কখনোই ছিল না।[১৫৩] কারণ, তারা যে ছবি আঁকতো, তার বেশ কদর ছিল। এই পটুয়া সমাজেরও আবার নানা শ্রেণি ছিল, যারা ভিন্ন ভিন্ন ধারায় দক্ষ ছিল। তিনি জানাচ্ছেন, 'এমনও পটুয়া ছিল, যারা শুধুই ছবি আঁকতো, বা ড্রইং করতো, কিন্তু সব সময় আঁকতো একই বিষয় নিয়ে।' [১৫৪] বাংলার পটুয়াদের জীবন-চরণ সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে তারা ছবি এঁকে সেই ছবি দেখিয়ে গল্প শুনিয়ে বেড়াতো। সেই বিবেচনায় সলভিনস তাদের যাযাবর (Pariah) হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তবে সব পটুয়ারাই যে তাদের ছবি দেখিয়ে গল্প শুনিয়ে বেড়াতো না, কেউ কেউ শুধুই ছবি আঁকতো (এবং অবধারিতভাবেই সেই ছবি বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতো) এই বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায়। সলভিনস পটুয়াদের অঙ্কন কৌশলের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন, লিখেছেন যে তাদের তৈরি রঙ ইউরোপে সহজলভ্য

[১৫৩] F.B. Solvyns, *Les Hindous,* Paris, 1808, Tome 1, plate V.

[১৫৪] *Les Hindous,* Tome 1, plate V.

বার্নিশের চেয়ে অনেক উন্নতমানের এবং স্থানীয় আবহাওয়া উপযোগী ছিল, কিন্তু একই সঙ্গে তাঁদের ছবিতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র ছিল না বলে সমালোচনাও করেছেন। এর কারণও, ব্যাখ্যা করেছেন তিনি- জানিয়েছেন পটুয়ারা যে দেব-দেবীদের ছবি আঁকতেন, ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা সেগুলোর অঙ্কনরীতিতে কোনো পরিবর্তন অনুমোদন করতো না। ফলে, তাদের মধ্যে অনেকেই যে কোনো ছবির দারুণ নকল তৈরি করতে পারতেন, কিন্তু 'তাদের শৈল্পিক দক্ষতা ছিল ওইটুকুই। ভারতবর্ষে সত্যিকারের শিল্পী খুঁজতে চাইলে তাই খোঁজ করতে হতো মুসলমানদের মধ্যে।'[১৫৫]

উনিশ শতকের ভারতে এই শিল্পী সমাজকে কিন্তু সমকালীন সমাজ-গবেষকদের লেখায় খুঁজে পাওয়া যায় না। ডাল্টনের *Descriptive Ethnology of Bengal* [১৫৬] কিংবা হান্টারের *Annals of Rural Bengal* [১৫৭] এবং *Statistical Account of Bengal* [১৫৮] -এর বর্ণনায় পেশাজীবি হিসেবে পটুয়া বা চিত্রকর সম্প্রদায়কে খুঁজে পাওয়া যায় না। তাহলে কী উনিশ শতকের বাংলায় আর পেশাজীবি হিসেবে পটুয়া সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল না? চিত্রকর সলভিনসের বর্ণনায় খুঁজে পাওয়া এই সম্প্রদায়কে নিকটবর্তী সময়ের সমাজ-গবেষকদের গবেষণায় খুঁজে না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন বিনয় ভট্টাচার্য। তাঁর মতে, যাযাবর এই শিল্পী সম্প্রদায়কে খুঁজতে হবে ডাল্টন-হান্টারদের গবেষণায় বর্ণীত বাদিয়া বা মল সম্প্রদায়ের

---

[১৫৫] F.B. Solvyns, *Les Hindous,* Paris, 1808, Tome 1, plate V.

[১৫৬] E.T. Dalton, *Descriptive Ethnology of Bengal,* Calcutta: Government of Bengal, 1872.

[১৫৭] W.W. Hunter, *The Annals of Rural Bengal*, New York: Leypoldt and Holt, 1868.

[১৫৮] W.W. Hunter, *Statistical Account of Bengal*, London: Tru□bner & Co., 1876.

তালিকায়।[১৫৯] পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলার পটুয়ারা মূলত তাঁদের আঁকা ছবি দেখিয়ে গল্প শুনিয়ে বেড়াতো। তাদের সেই ছবি আঁকা হতো মূলত জড়ানো পটে, যা ধীরে ধীরে খোলা হতো এবং গল্পের সঙ্গে সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে দৃশ্যমান হতো পটে আঁকা ছবিগুলো। কিন্তু সেই সঙ্গে মূলত দেব-দেবীদের একক ছবিও যে আঁকতেন তাদের কেউ কেউ, সলভিনসের বর্ণনা থেকে সেটা জানা যায়। কালীঘাটের মন্দিরকে ঘিরে বাজার বসার আগে থেকেই মাটির তৈরি সরা কিংবা হাতে তৈরি তুলোট কাগজের ওপর এই ধরনের ছবি আঁকা হতো, এবং সেগুলো আঁকার ক্ষেত্রে এক ধরনের ব্রাহ্মণ্যবাদী কর্তৃত্ব মেনে চলতে হতো শিল্পীদের। উইলিয়াম আর্চারের মতে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে সরার ওপর যে ছবি আঁকতেন গ্রামবাংলার পটুয়ারা, সেই ধারারই ছবি কালীঘাটের শিল্পীরা আঁকতেন কাগজের ওপর। কালীঘাটের ছবির কম্পোজিশনে, তুলির আঁচড়ে যে বর্তুল ভাব খুঁজে পাওয়া যায়, সেটার কারণও এই পরম্পরা বলেই মনে করেন তিনি।[১৬০]

কালীঘাটের ছবির ঐতিহাসিক বিকাশধারায় তিনটি পর্বকে চিহ্নিত করেছেন আর্চার।[১৬১] তাঁর মতে প্রথম পর্বটি বিস্তৃত ছিল ১৮৩০ থেকে ১৮৭০ পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্বটি ১৮৭০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত আর তৃতীয় পর্বটি বিস্তৃত ছিল মোটামুটি ১৯৩০ সাল পর্যন্ত। বিশ্বের বিভিন্ন জাদুঘর ও সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত কালীঘাটের ছবির নিদর্শনসমূহের তারিখ এবং এগুলোর অঙ্কনরীতি ও বিষয়বস্তুতে পরিবর্তনের ধারা বিবেচনা করেই এই বিভাজন করেছেন আর্চার। তবে তাঁর দেয়া এই কালক্রম প্রশ্নসাপেক্ষ। প্রথমত, তিনি ১৮৩০

---

[১৫৯] Binoy Bhattacharjee, *Cultural Oscillation: A Study on Patua Culture*, Calcutta: Naya Prokash, 1980, p 10.

[১৬০] W.G. Archer, *Kalighat Drawings,* Bombay, 1962, p 5.

[১৬১] W.G. Archer, *Kalighat Drawings from the Basanta Kumar Birla Collection*, Birla Series of Indian Art, Bombay: Marg Publications, 1962, pp 9-11.

সালকে কালীঘাটের ছবির সূচনাকাল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। এর পেছনের কারণ সম্ভবত তাঁর গবেষণার মূল উপকরণ ছিল লন্ডনের ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত কালীঘাটের পটচিত্র নিদর্শনসমূহ। ১৯১৭ সালে রুডইয়ার্ড কিপলিং ভারতবর্ষ থেকে এই ছবিগুলো সংগ্রহ করে লন্ডনের জাদুঘরটিতে দান করেন। মূলত এর পর থেকেই ব্রিটিশ শিল্পবোদ্ধাদের মধ্যে কালীঘাটের ছবিকে নিয়ে আগ্রহ ব্যাপকতা লাভ করে যদিও এ নিয়ে প্রথম শিল্প সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন টি এন মুখার্জি।[১৬২] কিপলিংয়ের সংগ্রহ করা পটচিত্রের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো ছবিগুলোর তারিখ ১৮৩০, তাই আর্চার এই তারিখকেই কালীঘাটের ছবির সূচনাপর্ব বলে বর্ণনা করেছেন। তবে কালীঘাটের ছবির যে বৈশিষ্ট্যসমূহ তিনি এবং তাঁর পরবর্তীকালের অন্যান্য গবেষকরা চিহ্নিত করেছেন, সেই বৈশিষ্ট্যসমূহ খুব সম্ভবত আরো আগে থেকেই বাংলায় প্রচলিত ছিল। শুধু তা-ই নয়, সলভিনসের বর্ণনা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এ ধরনের ছবির চাহিদাও ছিল।

সাধারণ্যে যে কাগজে আঁকা দেব-দেবীর প্রতিকৃতির কদর ছিল, ১৮৩২ সালে মিসেস বেলনোস নামে এক ব্রিটিশ নারী চিত্রকরের আঁকা একটি ছবি থেকেও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'ইন্টেরিয়র অফ এ নেটিভ হাট' বা একটি স্থানীয় কুঁড়েঘরের অভ্যন্তরদৃশ্য নামের এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে সাধারণ একটি গ্রাম্য কুঁড়ের দেয়ালে ঝুলছে কাগজে আঁকা একটি শিবমূর্তি (চিত্র ৪.১)।[১৬৩]

দেব-দেবীদের প্রতিকৃতি আঁকা বংশ পরম্পরায় পটুয়াদের ঐতিহ্য ছিল; কালীঘাটের তীর্থযাত্রীদের কাছেও দেবমূর্তির ছবিই ছিল সব দিক থেকে উপযুক্ত স্মারক। তাই শুরুর দিকে বিভিন্ন দেব-দেবী ও পৌরাণিক চরিত্র,

---

[১৬২] T.N. Mukerjee, 'Art Industries of Bengal', in *Journal of Indian Art,* Calcutta, 1886.

[১৬৩] Mrs. S C Belnos, *Twenty-four plates illustrative of Hindoo and European Manners in Bengal,* Paris and London, 1832, plate 14.

বিশেষ করে কালী, শিব ও পার্বতী, দুর্গা, স্বরস্বতী এবং রাম-সীতা-লক্ষ্মণ-হনুমানদের প্রতিকৃতিই বেশি আঁকতেন কালীঘাটের শিল্পীরা। কিন্তু সেই সঙ্গে আঁকতেন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন ছবিও। তাদের বংশ পরম্পরার ঐতিহ্য ছিল ছবি এঁকে গল্প বলা, কালীঘাটের ছবিতে সেই সুযোগ ছিল না। তবু তাঁরা সেই গল্পেরই খ-চিত্র আঁকতেন। শিবের বুকে পা তুলে দিয়ে কালির জিভে কামড় দেয়ার দৃশ্যটি কালীঘাটের শিল্পী ও গ্রাহক, উভয়ের কাছেই বেশ জনপ্রিয় ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেনসিলভেনিয়া ইউনিভার্সিটি মিউজিয়াম অফ আর্কিওলজি এন্ড অ্যানথ্রোপলজির সংগ্রহে রক্ষিত এ রকম একটি রাশি পটে শিবকে আঁকা হয়েছে যেন দোলনায় শুয়ে থাকা শিশুর মতো করে (চিত্র ৪.২)।

লালচে তুলোট কাগজে আঁকা ছবিটিতে আউটলাইন আঁকা হয়েছে সাদা রঙের রেখায়। একই সংগ্রহশালার অন্য একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে হনুমান তার বুক চিরে দেখাচ্ছে ভেতরে রক্ষিত রাম ও সীতার ছবি (চিত্র ৫.৩)। দুটি ছবিতেই অংকন দক্ষতা ছাপিয়ে ফুটে উঠেছে শিল্পীর গল্প বলার দক্ষতা।

এই গল্প বলার ছলে প্রথম দিকে কালীঘাটের শিল্পীরা আঁকতেন লোককাহিনী বা প্রবাদভিত্তিক ছবি, তবে এগুলোর চাহিদা ছিল কম। রঙের প্রশংসা করলেও সলভিনস পটুয়াদের ছবির তীব্র সমালোচনা করেছেন এর বিষয়বস্তুতে বৈচিত্রের অভাব লক্ষ্য করে। বিষয়বস্তুর পৌনপুনিকতার কারণেই অন্যান্য ইউরোপীয় শিল্পবোদ্ধার মতো তিনিও বাংলার লৌকিক ছবিকে কারুশিল্প হিসেবেই বিবেচনা করতেন।

তবে কালীঘাটের চিত্রকরদের ছবি গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে তাঁদের এই অভিযোগ খ-ন করার মতো উদাহরণ পাওয়া সম্ভব। গল্প বলার পূর্বোক্ত প্রবণতা থেকেই ধীরে ধীরে কালীঘাটের পটুয়ারা সলভিনস কথিত সেই একঘেঁয়েমী থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তারা এক সময়

পুরাণের কাল্পনিক জগত ছেড়ে নেমে এসেছিলেন বাস্তবের কলকাতায়। বিকাশমান এই নগরীর তথাকথিত বাবু সংস্কৃতিকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করে আঁকতে শুরু করেছিলেন ঘটনা-বর্ণনের ছবি।

আর্চারের মতে এই পরিবর্তনের ধারাটা শুরু হয়েছিল ১৮৭০ সালের পর থেকে, আর এটাকেই তিনি বর্ণনা করেছেন কালীঘাটের ছবির দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে।[১৬৪] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন এটা শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৮৪০ সালেই।[১৬৫] বিভিন্ন সংগ্রহশালার ছবির পাশাপাশি ঐতিহাসিক বাস্তবতা বিবেচনায় নিলে ১৮৪০ সালের সময়ক্রমটিকেই অধিকতর যৌক্তিক বলে বিবেচনা করতে হয়। সলভিনস এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেননি, কেননা তিনি ১৮৩৪ সালে কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন। এই সময়টাই ছিল প্রকৃতপক্ষে কালীঘাটের ছবির স্বর্ণযুগ। কারণ এই সময়ে কালীঘাটে দর্শনার্থীদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল নানা কারণে। বিশেষ করে ১৮৫৪ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে কলকাতা নগরী ব্রিটিশ ভারতের রেলওয়ে নেটওয়ার্কের অংশ হয়ে ওঠায় যোগাযোগ ব্যবস্থার যে উন্নতি হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে সারা ভারত থেকেই দর্শনার্থীরা আসতে শুরু করেছিল এই মন্দিরে, তাই স্মারকের চাহিদাও গিয়েছিল বেড়ে। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিতে পেরে উঠছিলেন না শিল্পীরা। আবার ঠিক এই সময়েই কলকাতায় এসে পৌঁছেছিল নতুন চিত্রনির্মাণ কৌশল, লিথোগ্রাফি বা ছাপাই ছবি। কালীঘাটের শিল্পীদের সামনে এক নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভুত হয়েছিল কাঠ, পাথর ও জিংকের ব্লকে ছাপা সস্তা দরের প্রিন্ট কপি।

---

[১৬৪] W.G. Archer, *Kalighat Drawings from the Basanta Kumar Birla Collection*, p 10.

[১৬৫] Ratnabali Chatterjee, *From Karkhana to the Studio A study of Changing Social Role of Patron and Artist in Bengal*, New Delhi: Books & Books, 1990, p 51.

অন্য দিকে ঠিক এই সময়েই কলকাতার জনসমাজেও চলছিল নির্মাণ-বিনির্মাণের পালা। কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করে কিংবা কোম্পানির প্রশাসন ব্যবস্থার ফাঁক-ফোকর গলে এই সময়েই নগর কলকাতায় গড়ে উঠছিল এক নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণি। বিশ শতকের শুরুর দিকে কলকাতার 'ভদ্রলোক' সমাজ কেমন ছিল, তার একটি বর্ণনা দিয়েছেন ফয়েজুর রসুল নামে ব্রিটেনে অভিবাসী এক বাঙালি,

> Far from drinking, we lived severly austere lives. Anything gaudy or even fashionable was frowned upon. Even our hair-cut had a way of its own. We had to have cropped hair, all of the same length, and it had not to be oiled or parted. The man with a hair-cut with short back and sides and wearing it parted was regarded as morally lax. This type of hair-cut was called the the 'Albert' cut. ..... Yet in the contagious atmosphere of the market, I was picking up a bit of these new hair-does and ways of dressing up...'[১৬৬]

অর্থাৎ, উনিশ ও বিশ শতকের বিকাশমান ঔপনিবেশিক শহরটিতে বেড়ে উঠছিল এমন একটি উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যাদের ধ্যান-জ্ঞান ছিল কলকাতার ব্রিটিশ প্রভুদের জীবনাচরণ অনুসরণ। বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে ব্রিটিশদের অনুগামী হওয়ার একটা সহজ উপায় ছিল তাদের সামনে, মদ-সুরা ও নারীতে ডুবে থাকা। কালীঘাটের ছবিবিষয়ে খ্যাতিমান গবেষক জ্যোতিন্দ্র জৈন এদের সংস্কৃতিকে তুলে ধরেছেন চমৎকারভাবে,

> In an imitation of the ruling British masters, administrators and the bosses of large trading

[১৬৬] F. Rasul, *Bengal to Birmingham,* London: Harper Collins Distribution Services1967, p. 13.

> companies, the rich, western educated Bengali gentry began to adopt the lifestyle of the former. Adaptation western and colonial manners in all walks of life become the symbol of superior status and model for upward social mobility for the nouveau riche Bengali grandee. [১৬৭]

কালীঘাটের শিল্পীরা এই বাবুদের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলেছেন ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে। কালীঘাটের দর্শনার্থীদের মধ্যেও এই বাবু সংস্কৃতির প্রতি বিরাগ ছিল প্রবল, তাই এই ধরনের ছবির চাহিদাও বাড়তে শুরু করেছিল।

প্রদ্যোৎ ঘোষ কালীঘাটের ছবির বিষয়বস্তুতে পাঁচটি ভিন্ন ধারা চিহ্নিত করেছেন। ধর্মীয় চিত্র ছিল তার মধ্যে একটি, বাকি চারটি ধারাই মূলত ফুটিয়ে তুলেছে ধর্ম-সম্পর্কিত নয় এ রকম ছবি।[১৬৮] এগুলো হলো:

ক. পৌরাণিক কাহিনী

খ. প্রকৃতি ও স্থিরচিত্র

গ. ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

ঘ. দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী

এবং ঙ. ক্যারিকেচার

এখানে লক্ষ্যণীয় যে তিনি কালীঘাট চিত্রকলার বিষয়বস্তুর পাঁচটি ধারার অন্যতম হিসেবে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলীকে চিহ্নিত করেছেন, তবে তাঁর শ্রেণিবিন্যাসের অন্য দুটি ধারা- ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও ক্যারিকেচারেরও বড় অংশ জুড়ে আসলে ছিল দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী। বিশেষ করে পূর্বোক্ত বাবু সংস্কৃতিই ছিল ক্যারিকেচারের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপকরণ। শুধু 'বাবু'রাই

---

[১৬৭] J. Jain, *Kalighat Painting Images from a Changing World,* Ahmedabad : Mapin Publications India Ltd, p 98.

[১৬৮] Prodyot Gosh, *Kalighat Pats: Annals and Apprisal,* Calcutta: Shilpayon Artists Society, 1967, p 19.

নন, কালীঘাটের শিল্পীদের ছবিতে জায়গা পেয়েছেন তাদের 'বিবি'রাও। কখনো বাবুকে আঁকা হয়েছে বিবির আঁচলে বাঁধা পড়ে থাকা ভেড়া হিসেবে (চিত্র ৪.৪), কখনো বা বাবু রীতিমতো পা চাটছেন বিবির (চিত্র ৪.৫)।

ছাপাই ছবির সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে না পেরে বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই কালিঘাটের পট হারিয়ে যেতে শুরু করে। কালীঘাটের সর্বশেষ নামী শিল্পী নিবারণ চন্দ্র ঘোষ ও কালীচরণ ঘোষের মৃত্যুর পর কাগজে আঁকা পটচিত্রের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তাদের উত্তরসুরীরা জীবিকার প্রয়োজনে পটচিত্র এঁকেছেন মূলত মাটির তৈরি সরার ওপর। কিন্তু তাতে কালীঘাটের ছবির সুনির্দিষ্ট রীতি আর টিকে থাকেনি।

ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহশালারই দুটি ছবির তুলনা করলে এটি পরিষ্কার বোঝা যায়। প্রথম ছবিটির বিষয়বস্তু পৌরাণিক, যশোদা শিশু কৃষ্ণকে স্তন্যপান করাচ্ছেন। অন্য ছবিটি কালীঘাটের শেষ প্রজন্মের বিখ্যাত চিত্রকর নিবারণ চন্দ্র ঘোষের আঁকা সেতার বাদনরতা রমণী। দুটি ছবিতে যে দুজন নারীকে চিত্রিত করা হয়েছে তাঁদের পরিচয় থেকে শুরু করে ছবির দৃশ্যপটে তাদের ভূমিকা পর্যন্ত সব কিছুতেই বিস্তর ফারাক, কিন্তু খুব কাছে থেকে দেখলে তাদের মুখের আদল, বিশেষ করে চোখ ও ভ্রু আঁকার কৌশলে অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় (চিত্র ৫.৬)। এই পটলচেরা চোখের আদল কালীঘাটের ট্রেডমার্ক। পুরুষ চরিত্রে তেমনি ট্রেডমার্ক ফয়েজুর রহমানের বর্ণনার সেই 'অ্যালবার্ট হেয়ার কাট', যদিও এ ক্ষেত্রে প্রভাবটা উল্টো পথে এগিয়েছে। সমকালীন কলকাতার বাবু'র চুলের ছাঁট জায়গা করে নিয়েছে মহাভারতের চরিত্র দুর্যোধনের কপালে (চিত্র ৫.৭)।

সমকালকে প্রকাশের এই প্রচেষ্টা সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে মূর্ত হয়েছে এলোকেশী আখ্যানকে ঘিরে আঁকা ছবিগুলোয়। ১৮৭০-এর দশকে কলকাতার এক আলোচিত ঘটনা স্বামী নবীনচন্দ্রের হাতে এলোকেশী নামে এক তরুণী বধুর

হত্যাকা- । স্ত্রীকে হত্যা করেও নবীনচন্দ্র জনগণের কাছে রীতিমতো নায়ক হয়ে উঠেছিলেন, যখন প্রচারিত হয়েছিল যে তারকেশ্বরের মন্দিরের জনৈক মোহান্তের সঙ্গে অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়েছিলেন এলোকেশী । নবীনের বিচারসভায় হাজার মানুষের ভীড় জমে, জনতার চাপে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়ে যান তিনি, ব্যভিচারের দায়ে শাস্তি হয় মোহান্তের । এই ঘটনা-কেন্দ্রিক আলোচনা এমনই জনপ্রিয় হয়েছিল, যে এ নিয়ে রীতিমতো পুস্তিকা ছেপে বিক্রি করা হতো । কালীঘাটের শিল্পীরাও সুযোগটা ছাড়েননি, গল্প বলার উপকরণ পেয়ে যেন ফিরে গেছেন জড়ানো পটের যুগে । নবীনের বাড়িতে মোহান্তের আগমণ থেকে শুরু করে এলোকেশীর হত্যা, নবীনের বিচার এবং শেষে জেলখানায় মোহান্তের সশ্রম কারাবাস পর্যন্ত নানা দৃশ্য চিত্রায়িত করেছেন তারা (চিত্র ৫.৮) । সেগুলোকে এক সূত্রে গাঁথতে পারলে জড়ানো পটের একটি পালা রচনা করা যেত নিঃসন্দেহে ।

কালিঘাটের শিল্পীদের আরেকটি প্রিয় বিষয় ছিল বাবু এবং বিবিদের আলস্যবিলাস । বিবির আঁচলে বাঁধা পড়ে ভেড়া হয়ে যাওয়া বাবুর ছবি তো আলোচিত হয়েছে পূর্বেই, তবে কেন তাঁরা এমনভাবে বাঁধা পড়তেন সেটাও খুঁজে পাওয়া যায় শিল্পীর তুলিতে । বাবু-বিবির রোমান্টিকতা আর সুন্দরী বিবিদের সৌন্দর্যচর্চার ছবি ঘুরে-ফিরে এসেছে কালীঘাটের পটে (চিত্র ৫.৯) । সমকালের দৃশ্যপটের সূত্র ধরে পুরুষদের চুলের যে বিশেষ ছাঁট এঁকেছেন কালীঘাটের চিত্রকররা, তাতে ইউরোপীয় কেতা অনুকরণের আভাস আছে । কিন্তু এই অনুকরণ যতোটা না শিল্পীর, তারচেয়ে অনেক বেশী করে কলকাতার বাবু সমাজের । কিন্তু বাবুদের ছবি আঁকতে আঁকতে অভ্যস্ততাবশত এমন অনেক কিছুই আত্মস্থ করে ফেলেছিলেন কালীঘাটের শিল্পীরা । তাই দেখা যায় তাদের তুলিতে আঁকা দেবতা কার্তিকের মাথায় সাহেবী হ্যাট,

ডমরু-ত্রিশুল হাতে শিবকে আঁকতে গিয়েও শিল্পী পরিয়ে দিয়েছেন কলকাতার সাহেবদের মতো পোশাক (চিত্র ৫.১০) ।

তবে কালীঘাটের ছবিতে বহির্দেশীয় অভিঘাত মোটিফের চেয়ে অনেক বেশি দৃশ্যমান অঙ্কনকৌশল আর রঙের ব্যবহারে । সলভিনসের পূর্বোক্ত বর্ণনা থেকে জানা যায় বাংলার পটুয়ারা নিজস্ব পদ্ধতিতে রঙ তৈরি করতে জানতেন । আর সেই রঙ ইউরোপীয় বার্নিশের চেয়ে উন্নত এবং এদেশের আবহাওয়া-উপযোগী ছিল । কালীঘাটের পটুয়ারা সেই রঙ ব্যবহার করেছেন সব সময় । তবে সেই রঙ তৈরির প্রক্রিয়া ছিল সময়-সাপেক্ষ, কালীঘাটের ছবির ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে তাই এক সময় ওই রঙ ছেড়ে বাজারে কিনতে পাওয়া যায় এমন ধরনের রঙ ব্যবহার করতে শুরু করেন শিল্পীরা । প্রাচ্য শিল্পের ঐতিহ্য অনুসারে ভারতের শিল্পীরা ঘরে তৈরি রঙ ব্যবহার করতেন প্রধানত গুয়াশ বা ঘন জলরঙের রীতিতে, যেখানে ছবি আঁকার আগেই জমিনটা তৈরি করে নিতে হতো । কিন্তু কালীঘাটের শিল্পীদের হাতে সেই সময় ছিল না, তাই তারা ইউরোপীয় ঘরানার জলরঙ পদ্ধতিকে আত্মস্থ করে নিয়েছেন, অনেক ক্ষেত্রেই নিজেদের ঘরে ভুষোর কালি থেকে তৈরি কালো রঙ দিয়ে হাতে তৈরি তুলির সাবলীল আঁচড়ে আঁকা রেখাকে রাঙিয়েছেন ইউরোপ থেকে আমদানি করা উজ্জ্বল রাসায়নিক রঙে । আর্চার তো মনে করেন কালীঘাটের ছবিতে আলো-ছায়ার যে কারুকাজ, সেটাও ইউরোপীয় ছবি থেকে ধার করা ।[১৬৯] তবে তাঁর এই মত গ্রহণযোগ্য নয় । অশোক ভট্টাচার্য যথার্থই মন্তব্য করেছেন যে কালীঘাটের ছবির আলোছায়ার কারুকাজ একেবারেই প্রাচ্যদেশীয় রীতির, ইউরোপীয় একাডেমিক রীতির মতো কোনো নির্দিষ্ট উৎস থেকে বিচ্ছুরিত আলোর সাপেক্ষে ফুটিয়ে তোলা

[১৬৯] W.G. Archer, *Kalighat Drawings from the Basanta Kumar Birla Collection*, p 13.

নয়।[১৭০] এখানে মনে রাখা দরকার, কালীঘাটের ছবির বিকাশ ও পতনের সময়কালের মধ্যেই বাংলাসহ ভারতবর্ষে ইউরোপীয় একাডেমিক রীতির চর্চা শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু কালীঘাটের শিল্পীরা সেই শিক্ষা লাভের সুযোগ পাননি। তাঁরা শিখেছেন বংশ পরম্পরার ঐতিহ্য অনুসারে পিতা কিংবা গুরুর কাছেই। তাই ইউরোপীয় ধারার চিয়ারস্কিউরো অনুশীলন করার অবকাশ ছিল না তাদের। এমনকি স্বচ্ছ জলরঙের ব্যবহারটাও তারা শেখেননি, আত্মস্থ করেছেন নিতান্তই প্রয়োজনের নিরীখে।

বটতলার ছাপাই ছবি

কালীঘাটের ছবির যখন সবচেয়ে রমরমা অবস্থা, পটুয়ারা এঁকে কুলিয়ে উঠতে পারছেন না, ঠিক সেই সময়েই বাংলার চিত্রকলার দিগন্তে বইতে শুরু করেছিল অন্য এক পরিবর্তনের বাতাস। ইউরোপীয়দের হাত ধরে এসে পৌঁছাতে শুরু করেছিল ছাপচিত্রের কৌশল। ভারতবর্ষে ছাপচিত্রের যাত্রা ঠিক কখন থেকে শুরু, তা নিশ্চিত করে বলার মতো উপাত্ত হাতে নেই। তবে ছাপাই ছবির সঙ্গে বাংলার পরিচয় ঘটে আঠারো শতকেই। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে যে কোম্পানি আমলে ইউরোপীয় চিত্রকরদের আঁকা নিসর্গচিত্রের ছাপানো সংস্করণ প্রকাশ করা ফ্যাশনে পরিণত হয়েছিল। এই ধারার পুরোধা ছিলেন উইলিয়ম হজেস[১৭১], তাঁর *সিলেক্ট ভিউজ অফ ইন্ডিয়া* শিরোনামের অ্যালবামটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৭৮৩ সালে। এই অ্যালবামের লিথোগ্রাফিক এনগ্রেভিংগুলো অবশ্য ছাপা হয়েছিল লন্ডন থেকে। তবে ১৭৮৬-৮৮ সালে প্রকাশিত *টুয়েলভ ভিউজ অফ ক্যালকাটা*'র শিল্পী টমাস ও উইলিয়াম ড্যানিয়েলের মধ্যে টমাস ড্যানিয়েল দাবি করেছেন তিনি ভারতবর্ষে

[১৭০] অশোক ভট্টাচার্য, বাংলার চিত্রকলা, পৃ. ১০১।

[১৭১] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পৃ. ৭৩।

বসে, ‘কারো সাহায্য ছাড়াই’ এ সব ছবি ছেপেছেন।[১৭২] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন ‘কারো সাহায্য ছাড়াই’ বলতে তিনি সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন কোনো ইউরোপীয় সহযোগীর সাহায্য ছাড়াই।[১৭৩] এ থেকে অনুমান করা যায়, আঠারো শতকের শেষ দিকেই বাংলার শিল্পীরা লিথোগ্রাফের কৌশল শিখে ফেলেছিলেন। লিথোগ্রাফ তৈরি করা হতো পাথরের ওপর ছবির উল্টো ছাপ ফেলে, খোদাইকর্মের মাধ্যমে ব্লক তৈরি করে। এই কৌশলটি সাধারণত ব্যবহার করে শিল্পীরা নিজেদের ছবির ইচ্ছেমতো প্রিন্ট তৈরি করতে পারতেন। তবে উনিশ শতকে বাংলার শিল্পীদের কাছে পাথর খোদাই নয়, জনপ্রিয়তা পেয়েছিল কাঠখোদাই করে তৈরি ব্লক দিয়ে ছাপার কৌশল। বিশেষ করে কালীঘাটের পটের বিকল্প হয়ে ওঠা বটতলার ছবিগুলো ছাপা হতো কলকাতায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত প্রিন্টিং প্রেস থেকে, ঘটনাক্রমে যে সব প্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরবর্তীতে বিখ্যাত হয়ে ওঠা কলকাতার বটতলাকে ঘিরে।

বাংলা ভাষায় মুদ্রণ যন্ত্রের প্রচলনও ব্রিটিশদেরই কীর্তি। নাথানিয়েল হ্যালহেডের বিখ্যাত ব্যকরণ গ্রন্থ ছাপার জন্য বাংলা টাইপের ছাঁচ তৈরি করে দিয়েছিলেন স্যার চার্লস উইলকিনস। সেই ছাঁচ দিয়ে হুগলির প্রেস থেকে বইটি ছাপা হয়েছিল ১৭৭৮ সালে। এরপর থেকেই কলকাতায় কোম্পানির তত্ত্বাবধানে, এবং অন্যান্য বিদেশি ব্যবসায়ীদের উদ্যোগেও ছাপাখানা

---

[১৭২] Pranab Ranjan Roy, 'Printmaking by Woodblock upto 1901' in Ashit Paul (ed), *Woodcut Prints of Calcutta,* Calcutta, 1983, p. 86.

[১৭৩] Ratnabali Chatterjee, *From the Karkhana to the Studio,* p. 57। লক্ষ্যণীয় যে, কোম্পানি আমলে প্রকাশিত ছবির অ্যালবামগুলোর লিথোগ্রাফি সাধারণত ‘লন্ডনের বিখ্যাত খোদাইকারদের’ দিয়ে করিয়ে করিয়ে নেয়াই রীতি ছিল। হজেসের সিলেক্ট ভিউজ অফ ইন্ডিয়া কিংবা ড’য়লি’র অ্যান্টিকুইটিজ অফ ঢাকা’র এনগ্রেভিংগুলো যাঁরা করেছেন, তাঁদের নাম ছাপা হয়েছে; কলকাতার পত্রিকায় সোয়েইন ওয়ার্ডের অ্যালবাম প্রকাশের জন্য চাঁদা তোলার বিজ্ঞাপনেও উল্লেখ ছিল, ছবিগুলো ছাপানো হবে ‘লন্ডনের বিখ্যাত এনগ্রেভার’দের দিয়ে। দ্রষ্টব্য, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ. ...

প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তবে বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের ইতিহাস আসলে বদলে দিয়েছিল উইলিয়ম কেরির ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস। এই প্রেসের মূল উদ্দেশ্য ছিল খ্রিস্টধর্মের প্রচার। বাইবেলের গসপেল দিয়ে শুরু করলেও কেরি অচিরেই প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন নানা ধরনের বাংলা বই। এমনকি রামায়ণ-মহাভারতের বাংলা সংস্করণও প্রকাশ করেছিলেন তিনি; ১৮১৮ সালে এই প্রেস থেকেই বেরিয়েছিল প্রথম বাংলা সংবাদপত্র *সমাচার দর্পণ*। এর আগেই, ১৮১৬ সালে কলকাতার ফেরিস কোম্পানির প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল ছাপাই ছবিযুক্ত প্রথম বাংলা বই *'অন্নদামঙ্গল'*। এই বইয়ে ছাপা হওয়া ছয়টি কাঠখোদাই ছবি বটতলার ছাপাই ছবির বিদ্যমান প্রাচীনতম উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে গ্রাহাম শ দেখিয়েছেন, বাংলা ছাপাখানার বিকাশেরও আগে কলকাতার ইংরেজি ছাপাখানাতেই ব্লক তৈরি করে ছবি ছাপার কৌশল বিকশিত হয়েছিল। তিনি এ রকম অন্তত ৪০ জন শিল্পীর একটি তালিকা তৈরি করেছেন, যাঁরা কলকাতার ১৭টি প্রেস থেকে নানা রকম ছবি ছাপার কাজের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[১৭৪] মূলত কোম্পানির কর্মকর্তাদের জন্য নানা ধরনের অ্যালমানাক, ম্যাপের বই, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি ছাপা হতো এই সব প্রেস থেকে।

কলকাতায় বাঙালিদের মালিকাধীন প্রথম প্রেস প্রতিষ্ঠার ইতিহাসও এখন পর্যন্ত অস্পষ্ট; তবে উত্তর কলকাতার বটতলা এলাকায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম যে প্রেসের কথা জানা যায়, সেটির মালিক ছিলেন বিশ্বনাথ দেব।[১৭৫] ঠিক কবে তাঁর প্রেসটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই, তবে ১৮১৭ সালেই তাঁর প্রেস থেকে ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল কাব্য*'র একটি

---

[১৭৪] Graham Shaw, *Printing in Calcutta to 1800*, London: Bibliographical Society, 1981, p. 32.

[১৭৫] সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, কলকাতা: আনন্দ প্রকাশন, ১৯৮৪; চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৫, পৃ. ২৬।

সংস্করণ ছাপা হয়েছিল । এর পর থেকে খুব দ্রুত ওই অঞ্চলে ছাপাখানার ব্যবসা বাড়তে শুরু করে । ১৮২২ সালে খ্রিস্টান মিশনারীদের পত্রিকা ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়াতে ছাপা হওয়া একটি প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে,

> I am glad to perceive, that everyday the natives are increasing their sales of native books: there are now in an near the city of Moorshedabaad no less than four walking booksellers that I know of. In speaking to one last week, he informed me that upon an average he sold to the amount of 30 Rupees per month. [১৭৬]

এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে তাদের বিক্রি করা বইগুলো খুবই নিম্নমানের ছিল, কিন্তু এই বর্ণনা থেকে একটি ধারণা পাওয়া যায় যে এই বইগুলো ভোক্তা কারা ছিল । এই ভ্রাম্যমান বই বিক্রেতা বা হকারদের মাধ্যমে বটতলার প্রকাশকরা বাংলার সাধারণ মানুষের মধ্যে পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন, আর তাদের সেই প্রচেষ্টা বেশ সফলও হয়েছিল । ১৮৫৪ সালে লেখা একটি চিঠিতে রেভারেন্ড জেমস লং জানাচ্ছেন, পূর্ববর্তী দশ বছরে অন্তত ২০ লাখ বই ছাপা হয়েছিল বাংলায় ।[১৭৭] ফ্রেন্ডস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদক উল্লেখ করেছিলেন যে ওই ভ্রাম্যমাণ বইবিক্রেতার বিক্রিত বইগুলোর বেশিরভাগই ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের, তবে তিনি মন্তব্য করেছেন ভালো কিছুর সঙ্গী হয়ে এ রকম 'উপজাত' উৎপাদন অস্বাভাবিক কিছু নয় ।[১৭৮]

---

[১৭৬] *Friend of India,* monthly series no 5, Calcutta:1822, p. 86.

[১৭৭] কলকাতার চিফ ম্যাজিস্ট্রেট জি ই ককবার্নকে লেখা লংয়ের চিঠি, তারিখ ২৩ জুন, ১৮৫৪ । উদ্ধৃত, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, *বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থাদির তালিকাম ১৭৪৩-১৮৫২*, কলকাতা: এ মুখার্জি, ১৯৯০, পৃ. ১৬১

[১৭৮] *Friend of India,* monthly series no 5, Calcutta:1822, p. 86

এই সব ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত পুস্তকের কদর এমন দ্রুত বেড়ে যাওয়ার পেছনে ওই হকারদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই সঙ্গে এর আরেকটি অনুসঙ্গী ছিল বইগুলোতে ছাপা হওয়া ছবি। বাংলায় পাণ্ডুলিপির অংশ হিসেবে অলঙ্করণের ব্যবহার প্রাচীনকাল থেকেই অতি সাধারণ রীতি ছিল। তারই ধারাবাহিকতায় এই সমস্ত পুস্তকে অলঙ্করণ সংযোজন করা হয়েছিল। অনিন্দিতা ঘোষের ভাষায়,

> The images followed traditional patterns of iconography, and often were faithful replicas of manuscript illustrations. Pictorial rhetoric was deployed to convey simple moralistic messages and religious instructions, or to force a familiar storyline.[১৭৯]

লক্ষ্যণীয় যে, এই অলঙ্করণের মূল কৌশলটি ব্রিটিশদের কাছ থেকে শেখা হলেও উনিশ শতকের বাঙালি প্রেসে এর প্রয়োগ ঘটানো হয়েছিল একেবারেই দেশীয় পদ্ধতিতে। ইউরোপে প্রচলিত এনগ্রেভিং ব্লক তৈরি করা হতো পাথরের ওপর রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করে ছবি এঁকে; কিন্তু বাংলার শিল্পীরা এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন উল্টো পদ্ধতি, ছবি আঁকার পর কাঠমিস্ত্রি ও স্বর্ণকারদের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে খোদাই করে তৈরী করা হতো ব্লক।[১৮০] উনিশ শতকের কলকাতার ছাপাখানা থেকে ছাপা ছবি ঘেঁটে শ্রীপান্থ ওই সময়ের শিল্পীদের নামের একটি তালিকা তৈরি করেছেন।[১৮১] সেই নামগুলো হচ্ছে:

১. গোবিন্দ চন্দ্র রায়

---

[১৭৯] Anindita Ghosh, 'An Uncertain "Coming of the Book": Early Print Cultures in Colonial India' in, Book History, Vol. 6, Baltimore & London: John Hopkins University Press, 2003, pp. 39

[১৮০] Anindita Ghosh, 'Early Print Cultures in Colonial India', pp. 23-55

[১৮১] শ্রীপান্থ, *বটতলা*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩।

২. গোপীচরণ স্বর্ণকার

৩. হীরালাল কর্মকার

৪. কৃষ্ণচন্দ্র দাস

৫. মাধবচন্দ্র দাস

৬. পঞ্চানন কর্মকার

৭. রামধন স্বর্ণকার

৮. তারিণীচরণ দাস

৯. বীরচন্দ্র দাস

১০. কার্তিকচন্দ্র বসাক

১১. নিত্যলাল দত্ত

১২. কার্তিকচন্দ্র কর্মকার

১৩. গঙ্গানারায়ণ ঘোষ

১৪. বেণীমাধব ভট্টাচার্য

দেখা যাচ্ছে যে এই তালিকার বেশীর ভাগ শিল্পীর উপাধি কর্মকার, স্বর্ণকার কিংবা বসাক, হিন্দু সমাজের প্রচলিত বংশ পরম্পরা অনুসারে যাদের পেশা সোনা-রূপা কিংবা লোহার কারুকাজ করা। কিন্তু শুধু তারাই নন, এদের মধ্যে আবার আছেন দাস উপাধিধারী সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ এবং ভট্টাচার্যের মতো ব্রাহ্মণও। প্রকৃতপক্ষে এই সময় শিল্পীদের চাহিদা এতই বেশি ছিল যে ঐতিহ্যবাহী পটুয়া বা কর্মকার-স্বর্ণকার শ্রেণির বাইরেও অনেকে এই পেশায় ভাগ্য অন্বেষণ করতে আগ্রহী হয়েছেন।

অন্নদামঙ্গল-এর মতো পৌরাণিক কাহিনীভিত্তিক পুস্তক অলঙ্করণ দিয়ে শুরু হয়েছিল, তারপর নানা ধরনের বই ছাপা হয়েছে বটতলায়। তার মধ্যে এমনকি যৌনতায় ঠাসা রগরগে কাহিনীর বইও ছাপা হয়েছে প্রচুর। এতটাই যে বটতলার বইয়ের ভাষারই একটা আলাদা পরিচয় গড়ে উঠেছিল। এই সব

বইতেই ছবি থাকতো, তবে গণ-মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতার বিচারে বট তলার সবচেয়ে জনপ্রিয় পুস্তক ছিল *পঞ্জিকা* । বাংলার ঘরে ঘরে পঞ্জিকার একটা চাহিদা ছিল, বট তলার ছাপাখানাগুলো সেই চাহিদাকে মিটিয়ে একেবারে শেষ করে দিয়েছিল হাতে লেখা পঞ্জিকার বাজার । এই পঞ্জিকাগুলোতেও বিভিন্ন তারিখকে আকর্ষণীয় করে তুলতে সংযোজন করা হতো ছবি । অনিন্দিতা ঘোষ এ রকম একটি ছবি প্রকাশ করেছেন (চিত্র ৪.১১), যেখানে দেখা কার্তিকের প্রতিকৃতি আঁকা হয়েছে, নিচে লেখা রয়েছে '৩০ কার্ত্তিক বুধবার । শ্রীশ্রীকার্ত্তিক পুজো'; সঙ্গে খোদাইকারের নাম, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকারেরকৃত, সাং শ্রীরামপুর ।'[১৮২] ছবিটি বাংলা ১২৪৯ সালের (১৮৪২-৪৩ খ্রি.) পঞ্জিকা থেকে নেয়া । তবে ওই একই ব্লক ব্যবহার করে, নিচের লেখায় সামান্য পরিবর্তনসহ একাধিকবার সালের পঞ্জিকা ছাপা হয়েছে । কাঠ খোদাই করে ছাপানো ছবিটিতে কার্তিকের পোশাকে দেখা যায় ইউরোপিয়ান হ্যাট, ঠিক কালীঘাটের ছবিতে যেভাবে আঁকা হতো ।

এই প্রভাব আরো বেশি করে দৃশ্যমান বট তলা থেকে ছাপা পোস্টারে, এগুলো যেন ছিল কালীঘাটের পটেরই ছাপাই সংস্করণ । কালীঘাটের তখন স্বর্ণযুগ, নগর কলকাতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হু হু করে বাড়ছে পর্যটক-দর্শনার্থীদের সংখ্যা, শিল্পীরা কুলিয়ে উঠতে পারছেন না স্মারকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে । তাই কালীঘাটের পটের বিকল্প হিসেবে সদ্য বিকশিত প্রিন্টিং টেকনোলজির ব্যবহার করে দেব-দেবীর প্রতিকৃতি ছাপানো শুরু হয়ে যায় অচিরেই । ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি কালীঘাটের পট আর যুক্তরাষ্ট্রের মার্ক ব্যারন ও এলিজে বোসাঁ সংগ্রহশালায় রক্ষিত বট তলার ছাপাই ছবিতে পাশাপাশি রেখে দেখলে এই সাদৃশ্য পরিষ্কার বোঝা

[১৮২] Anindita Ghosh, 'Early Print Cultures in Colonial India', Figure 1, p. 41.

যায় (চিত্র ৪.১২)। বটতলার ছবিটি যেন কালীঘাটের ছবিটিরই হুবহু প্রতিলিপি, কেবল ছাপাই ছবিটিতে বটতলার রঙীন আবহ নেই, শুধু কালো আর লাল রঙে ছাপা হয়েছে সেটি ।

বটতলার ছাপাই ছবির সঙ্গে একটা অর্থনৈতিক লড়াই ছিল বটে, কিন্তু কালীঘাটের শিল্পের বিচারে শিল্পী আর বটতলার শিল্পীরা ঠিক পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভুত হননি। দুই ধারার শিল্পীরাই গণমানুষের অভিন্ন চাহিদা মিটিয়েছেন, তাঁদের আঁকা ছবির বিষয়বস্তুতে তো বটেই, অঙ্কনরীতিতেও অনেক ক্ষেত্রেই ছিল অভিন্নতা। তাঁরা আসলে দুটি ভিন্ন মাধ্যমে কাজ করেছেন পরস্পরের পরিপুরক হিসেবেই। দামটা সাধারণ্যের হাতের নাগালে রাখলে বটতলার প্রেসে ছাপার কাজে ব্যবহার করা হতো নিম্নমানের কাগজ ও কালি, ছাপানো হতো বিপুল সংখ্যায়। ফলে ছাপার মান ততোটা ভালো ছিল না। উনিশ শতকেরই শেষ দিকে কলকাতার স্টুডিও আর্টিস্টরা এই বাজারে নাম লেখাতে শুরু করলে কালীঘাটের পটের পাশাপাশি বিলুপ্ত হতে শুরু করে গণ-মানুষের ছবির এই দুটি ধারাই। তার জায়গা দখল করে নিতে শুরু করে কলকাতার উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির পছন্দের 'মানসম্মত' বিষয় ও ছবি, স্টুডিও আর্ট।

'ভদ্রলোকের ছবি': একাডেমিক আর্ট

বাংলার শিল্পীরা যে রীতি ও কৌশলে ছবি আঁকতেন, ভারতের নতুন শাসক গোষ্ঠীর ঠিক পছন্দ ছিল না সেটি। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচিত হয়েছে যে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় শিল্প-শিক্ষার ঐতিহ্যে দুটি ধারা বিদ্যমান ছিল। সবচেয়ে জোরালো ধারাটি ছিল দরবারকেন্দ্রিক, শাসক গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় যেখানে ওস্তাদ শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে কাজ করতে করতে শিখতেন নবীন শিল্পীরা। এর বাইরে ছিল তথাকথিত 'বাজারি' শিল্পকলা,

গ্রামবাংলার লোকশিল্পীরা যা আঁকতেন সাধারণ মানুষের জন্য। সমাজে প্রচলিত জাতিভেদ প্রথায় পটুয়া হিসেবে পরিচিত এই শিল্পীকুলের অবস্থান মোটেই সম্মানজনক ছিল না, তাঁরা বিবেচিত হতেন সমাজের একেবারে নিম্নতম শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে। দিল্লীর বাদশাহ আকবরই প্রথম এই শ্রেণিভেদ প্রথার উর্ধে উঠে মেধার ভিত্তিতে কাজ করার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সুযোগ আসলে ছিল খুবই সীমিত, তাই আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও বাংলায় শিল্পীসমাজের সামাজিক অবস্থানের তেমন কোনো উন্নতি হয়নি। এমনিতেই 'নেটিভ'দের সম্পর্কে এক ধরনের উন্নাসিকতা ছিল ব্রিটিশদের, শিল্পীদের ক্ষেত্রে সেটা আরো জোরালো হয়েছিল নিজেদের সমাজেই তাদের নিম্ন অবস্থানের কারণে। আঠারো শতকেই ইংল্যান্ডে শুরু হয়ে গিয়েছিল একাডেমিক আর্টের বিপ্লব। লন্ডনের বিখ্যাত সাউথ কেনসিংটন স্কুলকে ঘিরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে, চোখে যা দেখা যায় তার হুবহু প্রতিচ্ছবি অংকনের রীতি 'একাডেমিক রিয়েলিজম' পরিচয়ে পৌঁছেছিল গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত পর্যায়ে। বাংলার শিল্পীরা এই ধারায় অভ্যস্ত ছিলেন না। সেটা যে কতটা অপছন্দ ছিল ব্রিটিশদের, তার খানিকটা ধারণা পাওয়া যায় ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ জেমস মিলের কথায়। ১৮১৭ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত *হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া* গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, ভারতবর্ষের শিল্পকলা ছিল 'আদিম পর্যায়ের',

> ..they are entirely without a knowledge of perspective and by consequence of all those finer and nobler parts of the art of painting which have perspective for their respective basis.[১৮৩]

[১৮৩] J.S. Mill, *The History of British India,* 6 vols, London: Baldwin, Cradock and Joy, 1817. Reprint, New York: Cambridge University Press, 2010, vol. 1, p 356.

তিনি অবশ্য একই সঙ্গে এ কথাও স্বীকার করেছেন যে বয়ন শিল্পের মতো কারুকর্মে ভারতীয়রা অত্যন্ত দক্ষ। চারুকলা বা Fine Art ও কারু শিল্প বা Craft-এর মধ্যে একটি বিভক্তির রেখা টেনে দিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন, চারু শিল্পের চর্চার জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার প্রয়োজন, ভারতীয়দের মধ্যে সেটির অভাব রয়েছে, কিন্তু কারুশিল্প সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা বা skill -এর কোনো অভাব নেই তাদের। এর পেছনের কারণটাকে তিনি চিহ্নিত করেছেন বিজ্ঞানসম্মত শিল্পভাষা শিক্ষার অভাবকে, সে কারণেই ভারতের শিল্পীরা প্রকৃতিকে সঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন না।

কিন্তু প্রশিক্ষণ পেলে যে ভারতীয় শিল্পীরাও সেটা করতে পারতেন, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে উল্লেখিত শিল্পী সীতা রামের অঙ্কিত চিত্রকর্মসমূহ প্রমাণ করে যে, মিলের এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করার আগেই ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে অন্তত কেউ কেউ একাডেমিক রিয়েলিজমের ব্যবহার শিখে ফেলেছিলেন। তবে সীতা রাম ঠিক কি ভাবে তা শিখেছিলেন, তার পরিপুর্ণ ইতিহাস জানা যায়নি।

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের পরিকল্পক লর্ড মেকলের ভাবনাতেও ছিল মিলের এই ধারণারই প্রতিচ্ছবি। ১৯৩৫ সালের বিখ্যাত মেকলে মিনিটস-এ তিনি ভারতবর্ষের নেটিভদের ব্রিটিশ কায়দায় শিক্ষা দিয়ে ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের অনুগত এবং সরকারের কাজে সাহায্য করতে পারবেন এমন একটি শ্রেণি সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছেন।[১৮৪]

মিল-মেকলেদের এই চূড়ান্ত ঔপনিবেশিক ভাবনার ফসল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ একাডেমিক রীতির শিল্পশিক্ষার প্রসার। এ লক্ষ্যে প্রথম পদক্ষেপটি নেয়া হয়েছিল ১৮৩৯ সালে। ওই বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে *ইন্ডিয়া রিভিউ* মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ফ্রেডারিক করবিনের উদ্যোগে সংগঠিত একদল

[১৮৪] দ্রষ্টব্য, Thomas Babington Macaulay, *Minutes on Indian Education*, February 1835.

শিল্পরসিকের পৃষ্ঠপোষকতায় মেকানিক্যাল ইনস্টিটিউট নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। এ উদ্দেশে গঠিত কমিটিতে ব্রিটিশদের পাশাপাশি ছিলেন স্থানীয় 'ভদ্রলোক' সমাজের প্রতিনিধিরাও।[১৮৫] পিটার গ্র্যান্ট ছিলেন এই কমিটির সভাপতি, খ্যাতিমান শিল্পী কোলসওয়ার্দি গ্র্যান্ট অন্যতম যুগ্মসচিব আর সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক তারাচাঁদ চক্রবর্তী। 'এদেশীয়দিগকে শ্রমজাত শিল্প' শিক্ষা প্রদান ছিল এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।[১৮৬] বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এই স্কুল অবশ্য বেশিদিন স্থায়ী হয়নি, তবে মেকলের পরামর্শের সূত্র ধরে ১৮৫৪ সালে কলকাতায় সরকারি উদ্যোগে 'কলকাতা স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই ধারা বেগবান হতে থাকে। পরবর্তী এক যুগের মধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট শেখানোর মোট ২২টি স্কুল স্থাপিত হয়। এর মধ্যে কলকাতারটি ছাড়াও দুটি বড় স্কুল ছিল মুম্বাই (তখনকার বম্বে) এবং চেন্নাই (তখনার মাদ্রাজ) শহরে। ১৮৭৮ সাল নাগাদ এ রকম আরেকটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় লাহোরে। এই স্কুলগুলি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় মাদ্রাজ স্কুলের সুপারিনটেনডেন্ট আলেকজান্ডার হান্টার এবং মাদ্রাজের ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনস ই.বি. পাওয়েলের পরস্পরকে লেখা কয়েকটি চিঠি থেকে। ১৮৬৭ সালের এই চিঠি-চালাচালি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়। এই চিঠিতে হান্টার ব্রিটিশ সরকারের ড্রাফটসম্যান হিসেবে কাজ করতে পারবে, এ রকম একদল শিল্পী গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি পাঠ্যক্রম প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করেছিলেন।[১৮৭] তবে ব্রিটেনের সিটি অ্যান্ড গিল্ডস সার্টিফিকেট কোর্স এবং সাউথ কেনসিংটনের আদলে গড়া এই পাঠ্যক্রমের

---

[১৮৫] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পৃ. ১০৭।

[১৮৬] শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, কলকাতা: এসকে লাহিড়ী এন্ড কোং, ১৯০৭; পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স লি. ১৯৮৩, পৃ. ১৪৭।

[১৮৭] ডিরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশনস ই বি পাওয়েলকে লেখা আলেকজান্ডার হান্টারের চিঠি, এপ্রিল ১৮৬৭। উদ্ধৃত, Ratnabali Chatterjee, *From the Karkhana to the Studio*, pp. 75-76; fn 4.

সাফল্য নিয়ে আপত্তি ছিল অনেকেরই, এক সময় দাবি উঠেছিল এই স্কুলগুলো বন্ধ করে দিয়ে সাধারণ কারিগরী শিক্ষায় আত্মীকৃত করে নেয়ার। তবে হান্টারের মতো কেউ কেউ আশা ছাড়েননি। অন্য একটি চিঠিতে পাওয়েলকে তিনি লিখেছেন, 'It is our bounden duty to direct and instruct the pupils aright।' [১৮৮] শেষ পর্যন্ত তাঁদের যুক্তিরই জয় হয়েছে, আর্ট স্কুলের জন্য সরকারি স্বীকৃতি ও অর্থায়ন বন্ধ হয়নি।

উল্লেখিত অন্যান্য আর্ট স্কুলের মতো কলকাতার স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট' নামে একটি জন-হিতৈষী সংঘের উদ্যোগে। এই সংঘের সদস্যদের চাঁদার টাকায় বিদ্যালয়ের খরচ কুলিয়ে ওঠা সম্ভব না হলে সরকারের কাছে দেন-দরবার করে মাসিক ছয়শত টাকা মঞ্জুরি আদায় করা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের আগে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের সৌজন্যে পাওয়া এই অনুদান অবশ্য যুদ্ধের পর কমে দাঁড়িয়েছিল মাসিক সাড়ে তিনশত টাকায়।[১৮৯] ১৮৬৪ সালে বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণভাবে অধিগ্রহণ করে সরকার। অধিগ্রহণের শর্ত অনুযায়ী লন্ডনের সাউথ কেনসিংটন মিউজিয়ামের স্কুল অফ ডিজাইনের (সাধারণভাবে কেনসিংটন স্কুল নামে পরিচিত) প্রাক্তন শিক্ষার্থী হেনরি হোভার লককে অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। ১৮৬৪ থেকে ১৮৮২ পর্যন্ত অধ্যক্ষ থাকাকালে লকই মূলত এই স্কুলের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন করেন। এ পাঠ্যক্রমের অংশ ছিল

ক. রেখাঙ্কন

খ. চিত্রাঙ্কন

গ. মডেলিং এবং মৃৎশিল্প

ঘ. কারুধর্মী নকশা (নির্মাতাদের উপযোগী ডিজাইন প্রণয়ন)

---

[১৮৮] *From the Karkhana to the Studio*, pp. 75-76.
[১৮৯] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পৃ. ১০৯।

ঙ. লিথোগ্রাফি

চ. কাঠখোদাই

এবং ছ. ফটোগ্রাফি

'নেটিভ' শিল্পীদের সৃজনশীলতা ছিল না, এই যুক্তিতেই ভারতবর্ষের শিল্পকলাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেয়ার পক্ষে ছিলেন ব্রিটিশ শিল্পবোদ্ধারা; কিন্তু আর্ট স্কুলের উল্লেখিত পাঠ্যক্রমে সেই সৃজনশীলতার বিকাশের কোনো সুযোগ ছিল না। এই পাঠ্যক্রমের বিষয়বস্তুসমূহ এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যেন শিক্ষার্থীরা দৃশ্যমান বস্তুকে যথাযথ অনুকরণ করতে এবং ব্যবহারিক ছবি ও নকশা আঁকতে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে।

ব্রিটিশদের এই ঔপনিবেশিক শিক্ষা নীতির ফল হয়েছিল দুই রকম। প্রথমত, এর ফলে এক দল দক্ষ ড্রাফটসম্যান তৈরি হয়েছিল, সরকারের সার্ভে অফিস আর প্রিন্টিং প্রেসগুলোর শিল্পী হিসেবে কাজ করতে পারতেন যারা। তবে এই পরিবর্তনের চাইতেও বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল শিল্পী মানসের পরিবর্তন। ভারতবর্ষের শিল্পীরা বংশ পরম্পরায়, আর সেই পরম্পরা অনুসারে শিল্পীরা ছিলেন বর্ণাশ্রিত সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ। আধুনিক শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা এই পরম্পরা ভেঙে নতুন এক শিল্পী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেছিল, যারা নিজস্ব স্টুডিও গড়ে স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চা করতে শুরু করেছিলেন। এমন নয় যে সামাজিক স্তরবিন্যাসে খুব বড় ধরনের উল্লম্ফন ঘটেছিল তাদের, ব্রিটিশ সরকারের অধীনে যে সব চাকরি পেতেন তাঁরা সেগুলোও খুব সম্মানজনক ছিল না।[১৯০] কিন্তু নিঃসন্দেহে তাঁদের আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠার একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল এই শিক্ষা।

তাদের এই আত্মবিশ্বাসের নেপথ্যে ছিল ইউরোপীয় ধারার শিল্পকলা চর্চার বিকাশ। ব্রিটেন থেকে আগত কোম্পানির কর্মকর্তাদের মধ্যে তো বটেই,

[১৯০] T. Guha-Thakurta, *The Making of a New Indian Art,* pp. 45-46.

কলকাতার বিত্তশালী 'ভদ্রলোক'দের মধ্যেও এ ধরনের শিল্পকলা পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছিল। এর ধারাবাহিকতায় কলকাতায় শুরু হয়েছিল ইউরোপীয় স্টাইলের চিত্র প্রদর্শনী। ১৮৩১ সালেই এ ধরনের প্রথম প্রদর্শনীটির আয়োজন করা হয়েছিল[১৯১], যদিও সেখানে স্থান পেয়েছিল মূলত কেটল, চিনারি, হজেস, জোফানিদের মতো ব্রিটেন থেকে আগত অতিথি চিত্রকরদের কাজ, সঙ্গে ছিল ইংল্যান্ডের রয়্যাল একাডেমীর খ্যাতিমান চিত্রকর স্যার জশুয়া রেনল্ডস, স্যার হেনরি বোর্ন, বেঞ্জামিন ওয়েস্ট এবং জর্জ মুরল্যান্ডের আঁকা ছবি। পরের বছরও এ রকম আরেকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, কিন্তু এ দুটি প্রদর্শনীর কোনোটিতেই স্থান পায়নি কোনো বাঙালি বা ভারতীয় চিত্রকরের ছবি। কিন্তু প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া বেশ কিছু ছবির স্পনসর হিসেবে ছিলেন বাঙালিরা।

আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার পর ধীরে ধীরে এ রকম প্রদর্শনীতেও জায়গা পেতে শুরু করেন বাঙালি শিল্পীরা। পরবর্তী কালে, ১৮৫৪-৫৫ এবং ১৮৭৪ সালে আয়োজিত দুটি প্রদর্শনীতেই ছিল বাঙালি শিল্পীদের কাজ। বিশেষ করে ১৮৭৪ সালের প্রদর্শনীটিতে তো কলকাতার তিন শিল্পী আনন্দ প্রসাদ বাগচী, হরিশচন্দ্র খান এবং গিরিশ চন্দ্র চ্যাটার্জির আঁকা ছবি বিশেষভাবে মনযোগ আকর্ষণ করেছিল।[১৯২] এই তিনজন ছাড়াও কলকাতা ও বোম্বে আর্ট স্কুলের এদেশীয় ছাত্র-শিক্ষকদের আরো অনেকেরই ছবি স্থান পেয়েছিল এই প্রদর্শনীতে। এগুলোর বেশির ভাগই আসলে ছিল শ্রেণিকক্ষের অনুশীলনমূলক কাজ, যেমন লিথোগ্রাফি বা উড এনগ্রেভিংয়ের সাহায্যে করা ছাপচিত্র এবং বিশেষ করে প্রতিকৃতি। তবে এই কাজগুলো থেকেই ধারণা পাওয়া যায় যে ওই সময়ের আর্ট স্কুলে হাতে-কলমে ঠিক কী ধরনের শিক্ষা দেয়া হতো।

---

[১৯১] কমল সরকার, 'কলকাতার প্রথম চিত্র প্রদর্শনী', *দেশ*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮২।

[১৯২] T. Guha-Thakurta, *The Making of a New Indian Art*, p. 47.

কোম্পানি আমলে ইউরোপ থেকে আসা চিত্রকরদের আঁকা ছবির মতোই এই প্রদর্শনীতে স্থান পাওয়া এদেশীয় শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবিগুলোর মধ্যে ছিল মডেল দেখে আঁকা প্রতিকৃতি, যেগুলোর শিরোনাম ছিল, *পুরোহিত, দারোগা, ঢাকী, চাপরাশি* কিংবা *বাবুর্চি*। অর্থাৎ তাদের মূলত শেখানো হতো বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ঠিক যেমনটা করেছিলেন বালথাজার্ড সলভিনস, মিসেস বেলনোসরা।

নতুন ধারার এই শিল্প শিক্ষা এবং তার সরকারি স্বীকৃতি বাঙালি শিল্পীদের সামাজিক উত্তরণ ঘটাতে না পারলেও তাদের এনে দিয়েছিল এক ধরনের সম্মান। এর প্রতিক্রিয়ায় নব্য ধারায় শিক্ষিত এই শিল্পীকুলের একটি অংশ মননে-মানসে ঔপনিবেশিক রুচিবোধদের ধারণ করতে শুরু করেছিলেন।

গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট এন্ড ক্র্যাফটের প্রথম দিককার ছাত্রদের মধ্যে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী এবং শ্যামাচরণ শ্রীমানীর নাম এখানে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তাঁরা দুজনই লকের খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন এবং লক তাঁদেরকে আর্ট স্কুলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তবে মননে-মানসে তাঁরা দুজন ছিলেন দুই তিমিরে।

অন্নদাপ্রসাদ বাগচী ছিলেন লকের আদর্শ ছাত্র, ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পীসমাজের পুরোধা। আর্ট স্কুলের প্রাক্তন সতীর্থ নবকুমার বিশ্বাস, ফণিভূষণ সেন, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণচন্দ্র পালকে সঙ্গে নিয়ে তিনিই বাংলার প্রথম 'আর্ট স্টুডিও' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত তাঁদের ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিওতে পেশাদারীভিত্তিতে প্রতিকৃতি অঙ্কন এবং গ্রন্থচিত্রনের ব্যবস্থা ছিল। এই ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও থেকে তাঁরা বাংলা ও ইংরেজির বর্ণতালিকা এবং বিশেষ করে বিভিন্ন দেব-দেবীর রঙীন লিথোগ্রাফিক ছবি ছেপে বিক্রি করতেন। শুধু তা-ই নয়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, লেডি বেথুনদের মতো মণিষীদের প্রতিকৃতিও ছেপে বিক্রি করা

হতো এই স্টুডিও থেকে।[১৯৩] উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে চিত্রকলার এ ধরনের পেশাদারিত্বভিত্তিক উদ্যোগ অভাবনীয় ছিল। তবে কালীঘাটের পটুয়াদের কল্যাণে বাংলার গণমানুষের মধ্যে চিত্রকলার একটি বিশাল ভোক্তাশ্রেণির উন্মেষ ঘটেছিল আগেই, পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে সেই চাহিদাকে কাজে লাগানোর পথটা দেখিয়েছিলেন ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিওর উদ্যোক্তারা।

বাংলায় চিত্রকলার বিকাশে শ্রীমানীর অবদান অন্য কারণে স্মরণীয়। বাগচীর মতো তিনিও লকের স্নেহধন্য ছিলেন। তবে আর্ট স্কুলে ইউরোপীয় শিল্প-কৌশল জ্যামিতিক রেখাঙ্কন আর লিথোগ্রাফি-কাঠখোদাই শেখালেও শ্রীমানী মনে-প্রাণে ছিলেন 'স্বদেশী'। বাংলা ভাষার শিল্পকলা বিষয়ক প্রথম পুস্তকটির রচয়িতা ছিলেন তিনি, ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত এই বইটির শিরোনাম, *সুক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্পচাতুরী*। ব্রিটিশদের বহুল কথিত ফাইন আর্ট শব্দযুগলেরই বাংলা করেছিলেন তিনি 'সুক্ষ্মশিল্প', এভাবে আরো অনেক পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন করেছিলেন তাঁর বইয়ে। এই বইয়েরই উপসংহারে তিনি স্বদেশবাসীদের ডাক দিয়েছিলেন দেশীয় শিল্পকলার ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করে 'দেশমাতৃকার সেবায় এগিয়ে আসার' জন্য।[১৯৪]

শ্রীমানীর এই আহ্বান একেবারে বৃথা যায়নি। অল্প কিছুকাল পরেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে 'বেঙ্গল স্কুলে'র শিল্পীরা মেতেছিলেন 'স্বদেশী' শিল্পচর্চায়। তাদের সেই পথটা দেখিয়েছিলেন একজন ব্রিটিশ, লক-পরবর্তী যুগে আর্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল হওয়া আর্নস্ট বিলেফিল্ড হ্যাভেল। ১৮৯৬ সালে দায়িত্ব পাওয়ার পর তিনিই প্রথম এই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ভারতীয় শিল্প-পরম্পরার ঐতিহ্য যোগ করেন, অবনীন্দ্রনাথকে উপাধ্যক্ষের পদেও বসিয়েছিলেন তিনিই।

---

[১৯৩] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পৃ. ১১৭।

[১৯৪] শ্যামাচরণ শ্রীমানী, *সুক্ষ্মশিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্পচাতুরী*, প্রথম প্রকাশ ১৮৭৪; পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৮৬, পৃ. ৭৬।

তাঁর এই উদ্যোগের সবচেয়ে জোরালো প্রতিবাদ কিন্তু করেছিলেন এদেশের নব্য শিল্পবোদ্ধারাই। 'প্রগতিশীল শিল্প শিক্ষার পথ রুদ্ধ করা'র প্রতিবাদে 'জুবিলি আর্ট স্কুল' নামে আলাদা একটি স্কুলই খুলে বসেছিলেন তাঁরা, যেখানে লক-প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে পাশ্চাত্য শিল্পরীতিই শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই উদ্যোগের নেপথ্যের কারণ শুধু ঔপনিবেশিক প্রভুদের অন্ধ আনুগত্যের মানসিকতা ছিল না, প্রকৃতপক্ষে সদ্য পাওয়া সামাজিক মর্যাদা হারানোর ভয়েই বাংলার 'শিক্ষিত শিল্পীসমাজ' এই পথে হেঁটেছিলেন। কারণ তাঁদের ভয় ছিল, প্রাচীন ভারতীয় পরম্পরায় শিল্পশিক্ষা হয়তো তাদের রুটিরুজির পথ রুদ্ধ করে দেবে।

চিত্র ৪.১ : একটি গ্রাম্য কুঁড়ের অভ্যন্তর দৃশ্য
শিল্পী: মিসেস এস সি বেলনোস, ১৮৩২

চিত্র ৪.২ : কালী, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ
(ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়া মিউজিয়াম সংগ্রহ নম্বর: ২৯-২২৫-৩)

চিত্র ৪.৩: হনুমান, উনিশ শতকের প্রথমার্ধ
(ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়া মিউজিয়াম সংগ্রহ নম্বর: ২৯-২২৫-১০)

চিত্র ৪.৪ : বিবির আঁচলে বাঁধা বাবু
(ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নম্বর: আইএস ২৩৯-১৯৫৩)

চিত্র ৪.৫ : বিবির পায়ের নিচে বাবু
শিল্পী : কালিচরন ঘোষ, ১৯০০
(ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নম্বর: আইএম ৩৯-১৯৫২)

চিত্র ৪.৬ : যশোদার কোলে শিশু কৃষ্ণ (বাঁয়ে), এবং সেতার বাদনরতা রমণী (শিল্পী: নিবারণচন্দ্র ঘোষ)
ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ৪০-১৯৫২ ও আইএস ৩০-১৯৫২ (বিস্তারিত তুলনা)

চিত্র ৪.৭ : মাছ কিনছেন বাবু (বাঁয়ে), এবং ভীমের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে দুর্যোধন (ডানে)
ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ২১৫-১৯৫০ ও আইএস ৫৮৫-১৯৫০
(বিস্তারিত তুলনা: চুলের ছাঁটে মিল)

চিত্র ৪.৮ : এলোকেশী আখ্যান: এলোকেশীকে মোহান্তের প্রলোভন, এলোকেশীর হত্যা, বিচার সভা এবং কারাগারে মোহান্তের ঘানি টানা (ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএম ১৩৭-১৯১৪, ১৪০-১৯১৪, আইএস ৩৮-১৯৭৬ ও আইএম ১৩৮-১৯১৪)

চিত্র ৪.৯ : বাবু-বিবির রোমান্স (বাঁয়ে) ও বিবির সৌন্দর্যচর্চা (ডানে)
(ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ৫০-১৯৬১ ও আইএস ৪৮-১৯৬১)

চিত্র ৪.১০ : কার্তিকের মাথায় সাহেবী টুপি (বাঁয়ে, ভিক্টোরিয়া অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ৪১-১৯৫২)
এবং বাসুদেবের পরনে সাহেবী পোশাক (চেস্টার হারউইটজ সংগ্রহ, যুক্তরাষ্ট্র)

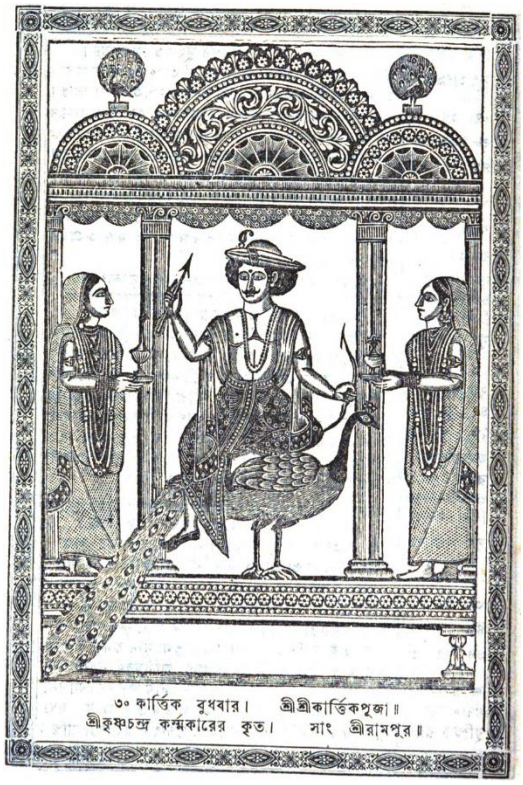

চিত্র ৪.১১ : কার্তিক, বটতলায় মুদ্রিত ১২৪৯ সনের পঞ্জিকা থেকে (খোদাইকার কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার)

চিত্র ৪.১২ : বটতলার প্রিন্টে কালীঘাটের ছবি : বাঁয়ে কালীঘাটের পট (ভিক্টোরিয়া এন্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়াম সংগ্রহ নং আইএস ৫-১৯৪৯), ডানে বটতলার প্রিন্ট (মার্ক ব্যারন ও এলিজে বোসাঁ সংগ্রহশালা, যুক্তরাষ্ট্র)

পঞ্চম অধ্যায়

চিত্ররীতি ও কৌশলের বিবর্তন

প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে বাংলার চিত্রকলা আধুনিক যুগে প্রবেশের পথ খুঁজে নিচ্ছিল। গ্রামবাংলার পটুয়াদের নিজস্ব রীতি, মুর্শিদাবাদের নবাবদের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠা মুঘল রাজকীয় রীতি আর সদ্য ক্ষমতায় আসা ইউরোপীয় শাসকবর্গের হাত ধরে স্রোতের মতো ঢুকে পড়া ইউরোপীয় রীতি মিলে-মিশে এই পালা বদলের কালেই গড়ে উঠেছে বাংলার আধুনিক চিত্রকলার ভিত। চিত্রকরদের নিজস্ব ভাবনা ও রূপকল্পে এই সংশ্লেষণকে খুঁজে পাওয়া যায়। তবে পালা বদলের এই রূপটাকে সবচেয়ে বেশি করে খুঁজে পাওয়া যায় চিত্রকলার করণ-কৌশলে। কারণ, এই দুইশত বছরে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন ঘটেছে ছবি আঁকার কৌশলকে ঘিরেই। অংকনের মাধ্যম আর উপকরণের ক্ষেত্রে যেন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, বদলেছে শিল্পভাষা আর প্রশিক্ষণের চরিত্রও।

চিত্রকলায় বাংলার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের কথা বলা হয়েছে শুরুতেই। পশ্চিমবঙ্গের অজয় নদের তীরে অবস্থিত পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে হরপ্পা-যুগের সমসাময়িক সভ্যতার যে সব নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার মধ্যে কালো মৃৎপাত্রের গায়ে সাদা রঙে আঁকা রেখাচিত্র বাঙালি শিল্পীদের চিত্রকলাচর্চার প্রাচীনতম উদাহরণ। মৃৎপাত্রের গায়ের এই অলঙ্করণগুলোকে অবশ্য ঠিক পূর্ণ বিকশিত চিত্রকলার নিদর্শন বলা যাবে না। কিন্তু বাংলায় আঁকা পূর্ণাঙ্গ ছবির এ পর্যন্ত আবিস্কৃত প্রাচীনতম নিদর্শনও কম পুরনো নয়, পালরাজা প্রথম

মহীপালদেবের রাজত্বের অষ্টম বছরে (আনুমানিক ৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ) নালন্দা মহাবিহারে লেখা অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা নামের একটি পুঁথির অলঙ্করণ হিসেবে আঁকা ১২টি ছবি।[১৯৫] এ সময় থেকে পরবর্তী দুইশত বছরে তালপাতায় আঁকা এ রকম আরো অনেক পুঁথি-চিত্রনের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ সব পুঁথিতে আঁকা ছবিগুলোও মোটেই কাঁচা হাতের কাজ নয়, দেখে বোঝা যায় এগুলো দীর্ঘদিনের চিত্র ঐতিহ্যের ফসল।[১৯৬]

অপরদিকে মুসলিম শাসনামলে বিকশিত হয়েছিল পাণ্ডুলিপি চিত্রকলার নতুন এক ধারা, পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে যা বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সে আলোচনার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ:

বাংলার মুসলিম শাসকরা এসেছিল পশ্চিম এশিয়া থেকে। ঐহিত্যগতভাবে পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম চিত্রকলাও ছিল মূলত পাণ্ডুলিপি নির্ভর, বাংলার সুলতানরাও সে ধরনের ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। সুলতান নুসরাত শাহের আমলে চিত্রায়িত *ইস্কান্দারনামা (শরফনামা)* পাণ্ডুলিপির ছবিগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে, সুলতানি আমলে বাংলার শিল্পীদের ছবিতে পারসিক চিত্রকলার প্রভাব ছিল।[১৯৭] এ প্রভাব আরো বেশি করে পড়েছে মুঘল আমলের ছবিতে, বিশেষ করে মুঘল যুগের শেষ দিকে বিকশিত মুর্শিদাবাদ চিত্রকলায়।

পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে চিত্রকলার বিকাশে মুঘলদের পৃষ্ঠপোষকতার ভূমিকা অতুলনীয়, কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় থেকে একদিকে তাঁর নিজের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী আর অন্য দিকে মুঘলদের কেন্দ্রিয় শাসন ভেঙে পড়তে শুরু করায় পতনের পালা শুরু হয়েছিল মুঘল চিত্রকলায়। বাধ্য হয়ে মুঘল

---

[১৯৫] সরসীকুমার সরস্বতী, *পালযুগের চিত্রকলা*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৮, পৃ. ১৩।

[১৯৬] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পৃ. ১৩।

[১৯৭] M.R. Tarafdar, 'Some Illustrations of the Period of Nusrat Shah', in *Journal of Bengal Art*, Vol. 1, Dhaka, 1996, pp. 212-18.

শিল্পীরা নতুন পৃষ্ঠপোষকের সন্ধানে দিল্লী আগ্রা ছেড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে থাকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে, জন্ম নেয় মুঘল চিত্রকলার বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক তথা প্রাদেশিক শৈলী। উত্তর ভারতের পাহাড়ি রাজ্যসমূহ এবং অযোধ্যার পাশাপাশি বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদকে ঘিরেও গড়ে ওঠে একটি শক্তিশালী শিল্প-ঘরানা।

এই সময়ে ভঙ্গুর মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যে নতুন নতুন অভিজাততন্ত্র গড়ে উঠছিল, মুর্শিদাবাদের নবাবী ছিল তাঁর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী। নবাব মুর্শিদ কুলি খান (১৭১৭-১৭২৭) তাঁর নতুন রাজধানী মুর্শিদাবাদে দিল্লীর দরবারেরই একটি ছোটখাটো সংস্করণ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি অবশ্য আওরঙ্গজেবের মতোই একজন কট্টোর ধর্মপ্রাণ মুসলিম ছিলেন। চিত্রকলা কিংবা কোনো ধরনের বিলাস-ব্যসনের প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিল একটি জায়গায়, মহররম আর খোয়াজ-খিজিরের উরশ খুবই জাঁক-জমকের সঙ্গে পালন করতেন তিনি। এ উপলক্ষে ভাগিরথী নদীর দুই পাড় জুড়ে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হতো। অভ্রের লণ্ঠন আর ঝাড়বাতি সাজানোর কাজে প্রচুর টাকা খরচ করতেন নবাব, দিল্লী-আগ্রা থেকে আসা পেশাদার শিল্পীরা এই কাজে যোগ দিতেন। সমকালীন ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাবা-তাবাই তাঁর *সিয়ার-উল মুতাখখেরিন* গ্রন্থে লিখেছেন, এ কাজে নাকি লক্ষাধিক কর্মী নিয়োগ করা হতো।[১৯৮] মুর্শিদকুলি খান নিজে চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, এমন কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও মুর্শিদাবাদের একজন নাম না জানা শিল্পীর আঁকা একটি ছবিতে এই দৃশ্য ধরে রাখা হয়েছে। রবার্ট স্কেলটন অনুমান করেছেন এই ছবিটি ১৭২০ সালে

[১৯৮] Mir Gholam Hussein Khan, *Siyar-ul-Mutakkherin*, Translated into English by John Briggs, London: Oriental Translation Fund, 1880, Vol. 1, pp 387-88

আঁকা।[১৯৯] অর্থাৎ, আঠারো শতকের গোড়ার দিকেই মুর্শিদাবাদকে ঘিরে চিত্রচর্চার একটি গুরুত্বপুর্ণ ধারা গড়ে উঠেছিল বলা যায়। মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার স্বর্ণযুগ শুরু হয় ১৭৪০ সালে নবাব আলিবর্দী খান সিংহাসনে আসীন হওয়ার পর। পরিণত বয়সে সিংহাসনে বসা আলিবর্দী অবশ্য তাঁর শাসনকালের প্রথম ১০ বছর যুদ্ধ করেই কাটিয়েছেন, তবে তাঁর শাসন আমলের শেষ সাত বছর ছিল শান্তির সময়, আর এ সময়েই তিনি চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আবির্ভুত হন। মুঘল শিল্পীদের এই পরম্পরাগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ইউরোপিয় রীতির সংমিশ্রণের প্রক্রিয়াটি শুরু হয়ে যায় এই সময় থেকেই। মুর্শিদাবাদ থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে কাশিমবাজারে ইংরেজ ও ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য কুঠি ছিল। ইউরোপিয়দের সঙ্গে বাণিজ্য করে এই সময় সম্পদে ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করে স্থানীয় একটি বণিক শ্রেণী, আবির্ভাব হয় এক নয়া অভিজাততন্ত্রের। এদের বেশিরভাগই ছিলেন হিন্দু, সঙ্গে ছিলেন আর্মেনিয় ব্যবসায়ীরাও। নবাবের দরবারের আভিজাত্যকে অনুকরণ করতে এরাও চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা দিতে শুরু করেন। কিন্তু আবার ইউরোপিয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরে তাঁদের রুচিতেও সাহেবি প্রভাব পড়তে শুরু করে। সাহেববাড়ির ছবি দেখে ইউরোপিয় ছবির কায়দা-কৌশল শিখতে শুরু করেন স্থানীয় শিল্পীরাও।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা বণিক থেকে শাসকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে এই ধারা আরো বেগবান হয়। এ সময় গুরুত্ব হারাতে শুরু করেন নবাবরা। তাঁদের সঙ্গে তাঁদের সভাসদদেরও অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে, ফলে মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের খুঁজতে হয় নতুন পৃষ্ঠপোষক। আর এ ভূমিকায় আবির্ভুত হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা। মুর্শিদাবাদকে ঘিরেই শুরু হয়েছিল কোম্পানি চিত্রকলার যাত্রা, তবে বাংলার রাজধানী

[১৯৯] Robert Skelton, 'Murshidabad Painting', p. 19

হিসেবে কলকাতা নগরীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এ চিত্রকলার কেন্দ্রও সরে গেছে কলকাতায় । অশোক ভট্টাচার্য তাই বাংলা চিত্রকলার কোম্পানি-শৈলীকে দুটি পর্বে ভাগ করেছেন, মুর্শিদাবাদ পর্ব ও কলকাতা পর্ব ।[২০০] সমসাময়িককালে ঢাকার নায়েব নাজিমগণ, নওয়াব পরিবার এবং ব্রিটিশদের সঙ্গে সখ্যের সূত্রে গড়ে ওঠা নব্য অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায়ও চিত্রকলার চর্চা হয়েছে, এবং সে সব ছবিতেও উল্লেখিত দুটি ধারারই ছাপ দেখতে পাওয়া যায় । আর ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতায় স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টস প্রতিষ্ঠার পর তো ইউরোপীয় ঘরানার প্রভাব পড়তে শুরু করে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই ।

রাজণ্যবর্গ আর অভিজাতদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা এই চিত্ররীতির পাশাপাশি উনিশ শতকেই আলোড়ন তুলেছিল সাধারণ মানুষের পৃষ্ঠপোষকতাও । কালিঘাটের মন্দিরকে ঘিরে এই পৃষ্ঠপোষকতার একটি চিত্র পাওয়া যায়, গ্রামবাংলার পটুয়ারা যেখানে বসে সাধারণ তীর্থযাত্রীদের জন্য আঁকতেন দুই পয়সায় বিক্রি করার উপযুক্ত ছবি । বলার অপেক্ষা রাখে না, এই ছবির করণ-কৌশল ছিল একান্তই বাংলার গ্রামীণ শিল্পীদের বংশ পরম্পরায় শেখা । কিন্তু ইউরোপীয় প্রভাবের স্রোত এক সময় ভাসিয়ে নিয়ে যায় এমনকি এই পরম্পরাকেও, ছাপাই ছবির আবির্ভাবে প্রযুক্তির সঙ্গে লড়াই করতে না পেরে হারিয়ে যায় কালিঘাটের ছবিও ।

প্রাচীন বাংলার চিত্রকর ও চিত্রভাষা

পাণ্ডুরাজার ঢিবির মৃৎপাত্র অলঙ্করণ থেকেই প্রাচীন বাংলার শিল্পী মানসের পরিচয় পাওয়া যায় । তবে লিখিত তথ্য উৎসের অভাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের

[২০০] অশোক ভট্টাচার্য, *বাংলার চিত্রকলা*, পৃ. ৬২-৭৯

বাংলায় চিত্র অংকনের পদ্ধতি বা করণ-কৌশল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। এ নিয়ে বিস্তারিত গবেষণাও এখনো হয়নি। পালযুগের পুঁথিচিত্র নিয়ে অবশ্য বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। আর সেই গবেষণার সূত্র ধরে আমরা প্রাচীন বাংলার চিত্রভাষা ও করণ-কৌশল সম্পর্কে ধারণা পাই। সরসীকুমার সরস্বতীর *পালযুগের চিত্রকলা*[২০১] গ্রন্থে জানানো হয়েছে, শুধু বাংলা নয়, প্রাচীন ভারতবর্ষ ও নেপালে পুঁথি লেখা হতো তালজাতীয় গাছের পাতায়। এ কাজে দুই ধরনের তালপাতা ব্যবহার করা হতো। অপেক্ষাকৃত পুরু এবং কম দৈর্ঘের 'খর তাড়' বেশি দীর্ঘস্থায়ী হতো না বলে এর ব্যবহার হতো খুব কম, বেশির ভাগ পুঁথি লেখা হয়েছে অপেক্ষাকৃত পাতলা, নমনীয় এবং দীর্ঘ আকৃতির 'শ্রী তাড়'। লেখার জন্য তালপাতা প্রস্তুতির প্রক্রিয়াটি ছিল অতি সহজ ও সাধারণ–

> ... পাতাগুলো সংগ্রহ করে গোছা করে বাঁধার পর জলে ডুবিয়ে রাখা হত। মাসখানেক পর সেগুলি তুলে গোছা বাঁধা অবস্থাতেই লম্বাভাবে ঝুলিয়ে রাখা হতো জল ঝরানোর জন্য। জল ঝরে গেলে পাতাগুলো আলাদাভাবে ছায়ায় শুকানো হতো। আবহাওয়া অনুসারে পাতাগুলো চার থেকে সাত দিন। তারপর প্রত্যেকটা পাতা শাঁখ দিয়ে ঘষে দুদিক মসৃণ করা হতো। পরে পাতাগুলো সাজিয়ে সমানভাবে কাটা হত।[২০২]

দুই শ্রেণির তালপাতারই প্রস্থ সাধারণত সর্বোচ্চ ৭.৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতো। তবে দৈর্ঘে শ্রী তাড় এগিয়ে ছিল, এ ধরনের পাতার দৈর্ঘ অনেক সময় ৯০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতো। পুঁথির একেকটি পাতায় সাধারণত পাঁচ থেকে সাতটি পঙক্তি থাকত। যে সব পৃষ্ঠায় ছবি থাকতো না সেখানে এই পঙক্তিগুলো হতো অবিচ্ছিন্ন, তবে ছবির জন্য জায়গা করে দিতে চিত্রসংযুক্ত পুঁথিতে লেখাগুলো কয়েকটি কয়েকটি চতুস্কোণ ক্ষেত্রে বিভক্ত থাকতো।

---

[২০১] সরসীকুমার সরস্বতী, *পালযুগের চিত্রকলা*, পৃ. ৯০-১১৯

[২০২] *পালযুগের চিত্রকলা*, পৃ. ৯১

প্রতিটি চিত্রিত পত্রে সাধারণত তিনটি করে ছবি থাকতো, একটি মাঝে আর অন্য দুটি দুই পার্শ্বে। বাঁধাই করার জন্য পাতাগুলোর মাঝামাঝি স্থানে নির্দিষ্ট দূরত্বে দুটি করে ফুটো করা হতো, মলাটের জন্য সমান আকৃতির দুটি কাঠের পাটার একই স্থানে ছিদ্র করে সেই ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সূতো ঢুকিয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখা হতো।

মাধ্যম হিসেবে তালপাতার ব্যবহার অবশ্য মধ্যযুগেই শেষ হয়ে যায়, তার পরিবর্তে জায়গা করে নেয় মুসলিমদের আমদানি করা প্রযুক্তিতে তৈরি কাগজ। আঠারো ও উনিশ শতকের ছবির মাধ্যম হিসেবে তাই তালপাতার ব্যবহার হয়নি। কিন্তু প্রাচীন বাংলার চিত্ররীতির অন্য দিক, বিশেষ করে অংকন এবং রঙ তৈরির কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে এই সময়েও। সৌভাগ্যক্রমে এ প্রসঙ্গে বেশ কিছু লিখিত তথ্য পাওয়া যায় *শিল্পশাস্ত্র* বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থসমূহে।[২০৩] এ সব শাস্ত্রে ৬৪টি 'বাহ্যকলা'র অংশ হিসেবে বর্ণীত হয়েছে *চিত্রসূত্র*ও। ভারতীয় পুরাণে চিত্রকলার উদ্ভবকে ঋষি নারায়ণের গল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়ে থাকে। কিংবদন্তি অনুসারে এই ঋষি তাঁর উরুর ওপর কল্পনার মাধুরী মিশিয়ে এঁকেছিলেন উর্বশী'র ছবি, সেখান থেকেই জন্ম এই সুন্দরী অপ্সরার। তাঁর কাছ থেকে এই কলা শিখেছিলেন বিশ্বকর্মা, তারই প্রয়োগে তিনি সৃষ্টি করেন পুরো ব্রহ্মা-।[২০৪] শিল্পশাস্ত্রের প্রাচীনতম যে গ্রন্থে শিল্পকলার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা হলো *বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ*।[২০৫] এর তৃতীয় খ- মূলত নিখুঁত দেবমূর্তি চিত্রণ ও নির্মাণের লক্ষ্যে

---

[২০৩] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য, D.N. Shukla, *Shilpa Shastra*, Lucknow: Vastuvanmaya Prakashan, 1967; Isabella Nardi, *The Theory of Citrasutras in Indian Painting*, London: Routledge, 2006

[২০৪] C. Shivaramamurti, *Indian Painting,* New Delhi: National Book Trust of India, 1970, p. 5

[২০৫] Moti Chandra, *The Technique of Mughal Painting*, Lucknow: U. P. Historical Society, 1949, p. 1

মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশের দৈর্ঘ-প্রস্থের সমানুপাতিক রূপ, শরীরের বিভিন্ন ভঙ্গিমা, চুল ও চোখের বিভিন্ন রূপ, দেব-দেবীদের মূর্তিনকশা এবং ক্ষয়বৃদ্ধি (foreshortening)-এর কৌশল ইত্যাদি বর্ণীত হয়েছে ।

একাদশ শতকে পরমার-রাজ ভোজদেব এর লেখা *সমরাঙ্গন সূত্রধার* গ্রন্থে চিত্রাঙ্কন ও রঙ-রীতি সম্পর্কে বেশ কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়, যার সঙ্গে বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণের বর্ণনার মিল রয়েছে । *সমরাঙ্গন সূত্রধার* মূলত বাস্তুশাস্ত্র বা স্থাপত্যবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ, কিন্তু এর ৭১তম অধ্যায়ে কাঠের প্যানেল, ক্যানভাস ও দেয়ালের ওপর ছবি আঁকার কৌশল সম্পর্কেও বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে ।[২০৬] বিষ্ণু ধর্মোত্তর পুরাণে চিত্রের আটটি গুণের (গুণাষ্টক) উল্লেখ আছে, ভোজদেবের লেখাতেও এই আটটি অঙ্গের কথা বলা হয়েছে:[২০৭]

১. বর্তিকা

২. ভূমি বন্ধন

৩. লেখ্য

৪. রেখাকর্ম

৫. বর্ণকর্ম

৬. বর্তনাক্রম

৭. লেখন বা লেখকরণ

৮. দ্বিককর্ম

---

[২০৬] Ashok K Bhattacharyya, *Techniques of Indian Painting,* Calcutta: Saraswati Library, 1976, p. 13

[২০৭] Sudarshan Kumar Sharma (Ed.), *Samarangana Sutradhara of Bhojadeva : An Ancient Treatise on Architecture,* vol. 1, Delhi: Parimal Publication Pvt Ltd, 2007, pp 91-92

এই আটটি অঙ্গের সবগুলো ব্যাখ্যাযোগ্য নয়, কেননা পন্ডিতগণ মনে করেন এর মধ্যে এক ধরনের ভ্রান্তি আছে।[২০৮] তবে কাছাকাছি সময়ে লেখা অন্য দুটি গ্রন্থ চালুক্যরাজ সোমেশ্বর ভুলোকমল্লের *অভিলষিতার্থ চিন্তামণি* বা *মানসোল্লাস* (দ্বাদশ শতক) এবং শ্রীকুমারের *শিল্পরত্ন* (ষোড়শ শতক) থেকে মিলিয়ে এই আটটি অঙ্গের অনেকগুলোরই ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে।[২০৯]

এই ব্যাখ্যা অনুসারে 'বর্তিকা' এক ধরনের কলম বা আরো নির্দিষ্ট করে বলা যায় পেনসিল সদৃশ জিনিস, যার সাহায্যে চিত্রের অঙ্কন শুরু করা হয়। সমরাঙ্গন সূত্রধরে 'বিশেষ ধরনের মৃত্তিকা ও তুল চুর্ণ' মিশিয়ে বর্তিকা তৈরির কথা বলা হয়েছে, মানসোল্লাসে বলা হয়েছে 'কজ্জল ও অন্নম-' মিশিয়ে বর্তিকা তৈরি করা হতো।[২১০] এ ধরনের বর্তিকা সাধারণত দেয়ালচিত্রের বহিঃরেখা অঙ্কনের (outline) কাজেই ব্যবহার করা হতো। পুঁথিচিত্রে এ ধরনের বর্তিকার ব্যবহার হতো না।

'ভূমিবন্ধন' বলতে মূলত চিত্রের ক্ষেত্র (যেমন তালপাতা বা পুঁথির মলাট হিসেবে কাঠের পাটা) প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়াকে বোঝায়। 'লেখ্য' বলতে প্রারম্ভিক বা খসড়া দ্রুত রেখাঙ্কন আর 'রেখাকর্ম' বলতে পুর্ণাঙ্গ রেখাঙ্কনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ আকৃতি ফুটিয়ে তোলাকে বোঝানো হয়েছে। এর পরবর্তী প্রক্রিয়াটি ছিল 'বর্ণকর্ম'। এ প্রসঙ্গে কি কি ধরনের রঙ ব্যবহৃত হতো এবং সেগুলো কীভাবে তৈরি করা হতো সে সম্পর্কে ধারণা দেয়া হয়েছে। প্রাচীন পুঁথিচিত্রে সাধারণত সাদা (ধবল বা শ্বেত), হলুদ (পীত), নীল (শ্যাম), লাল

---

[২০৮] সরসীকুমার সরস্বতী, *পালযুগের চিত্রকলা*, পৃ. ৯৯

[২০৯] বিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, S.S. Misra, *Fine Arts and Technical Sciences in Ancient India with Special Reference to Manasollasa*, Varanasi: Krisnadas Academy, 1982

[২১০] সরসীকুমার সরস্বতী, *পালযুগের চিত্রকলা*, পৃ. ১০০

(রক্ত), কাল (কৃষ্ণ বা কজ্জল) ও সবুজ (হরিৎ) রঙ ব্যবহার করা হতো। সাদা রঙের আকর হিসেবে শঙ্খ ও শুক্তিভস্মের কথা বর্ণীত হয়েছে। হলুদ বর্ণের উৎস হরিতাল (ইয়োলো আর্সেনিক বা আর্সেনিক সালফাইড) চুর্ণ। নীল রঙের উৎস নীল গাছ, এছাড়া রাজাবর্ত বা রেউটি নামের খনিজ পদার্থ থেকেও এক ধরনের নীল রঙ তৈরি করা হতো। লাল রঙের আকর হিসেবে অনেক ধরনের উপকরণের কথা বর্ণীত হয়েছে। তার মধ্যে আছে লাক্ষারস বা আলতা, দরদ বা লাল সীসা এবং গৈরিক বা গিরিমাটি। আর কাল রঙের উৎস বলতে কাজল–সলতে পুড়িয়ে আগুণের শিখা থেকে সংগ্রহ করা কালির সঙ্গে তেল-জল মিশিয়ে তৈরি করা হতো কাজল। এই পাঁচটি মৌলিক রঙের বাইরে পুঁথিচিত্রে সবুজ রঙের ব্যাপক ব্যবহার হতো। *শিল্পশাস্ত্রে* সবুজকে মিশ্র রঙ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, নীল ও হলুদের মিশ্রণে যে রঙ তৈরি হতো। *মানসোল্লাস* ও *শিল্পরত্ন* গ্রন্থে মিশ্র রঙ তৈরির বিশদ বিবরণও আছে, সেগুলি থেকে বিভিন্ন রঙের আরো অন্তত ১৮টি শেড-এর প্রস্তুতপ্রণালী সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।[২১১]

পালযুগের ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছিল জল রঙ। পানির সাহায্যে উল্লেখিত রঞ্জকগুলিকে গুলিয়ে ব্যবহার করতে হলে, বিশেষ করে তালের পাতায় সেটাকে আটকে রাখতে হলে এক ধরনের আঠালো পদার্থ ব্যবহার করা জরুরি। *শিল্পরত্নে* এ প্রক্রিয়ারও বর্ণনা আছে। একমাত্র দরদ বা সীসাযুক্ত লাল রঙ ছাড়া অন্য সব রঙের ক্ষেত্রে কপিত্থ বা কৎবেল এবং নিম ফলের নির্যাসকে বন্ধক হিসেবে ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। কেবল দরদ রঙের ক্ষেত্রে শুধু নিমের নির্যাস ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।[২১২]

---

[২১১] *পালযুগের চিত্রকলা*, পৃ. ১০৫-১১১

[২১২] *পালযুগের চিত্রকলা*, পৃ. ১১৪-১১৫

শিল্পশাস্ত্রে বর্ণ প্রয়োগের উপকরণ হিসেবে তুলি বা তুলিকা তৈরির কৌশলও উল্লেখ করা হয়েছে। *সমরাঙ্গন সূত্রধারে* তুলিকে 'কুর্চ' নামে বর্ণনা করা হয়েছে, *মানসোল্লাস* ও *শিল্পরত্নে* বলা হয়েছে 'লেখনী'। তুলির প্রকারভেদ করা হয়েছে স্থুলতা অনুসারে। এর মধ্যে স্থুল, মধ্য ও সুক্ষ্ম–এই তিনটি ছিল প্রধান। স্থুল পর্যায়ের তুলি তৈরি করা হতো বাছুরের কানের লোম দিয়ে, মধ্য পর্যায়ের তুলি তৈরিতে ব্যবহৃত হতো ছাগলের পেটের লোম আর সুক্ষ্ম পর্যায়ের তুলিতে ব্যবহৃত হতো 'চিক্রোর-পুচ্ছের লোম'। চিক্রোর বলতে 'কস্তুরী-গন্ধী মুষিক জাতীয় প্রাণী' বা গন্ধগোকুলকে বোঝানো হয়েছে। প্রতিটি পর্বের তুলির জন্য নির্দিষ্ট ধরনের লোম সংগ্রহ করে কাঠ বা বাঁশের তৈরি দণ্ড-র অগ্রে শঙ্কুর সঙ্গে সুতো বা লাক্ষা দিয়ে কীভাবে বাঁধতে হবে, তারও বিশদ বিবরণ আছে *শিল্পরত্নে*।[২১৩]

'বর্তনাক্রম' বলতে শেডিংকে বোঝাতো বলে মনে করা হয়। আনন্দ কুমারস্বামী অবশ্য এ ব্যাপারে একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন,

> ... shading. But not off course shading intend to produce effects of light and shade but that kind of shading of receding areas which produces an effect of roundness or relief.[২১৪]

সমরাঙ্গন সূত্রধারে বর্ণীত শিল্পের সপ্তম অঙ্গটি লেখন বা লেখকরণ, রঙ চড়ানোর পর ছবিতে প্রয়োজনীয় আউটলাইন করার কৌশল। আর দ্বিককর্ম বলতে সম্ভবত বোঝানো হয়েছে ফিনিশিং টাচ।

---

[২১৩] *পালযুগের চিত্রকলা*, পৃ. ১১২

[২১৪] AK Coomaraswami, *The Arts and Crafts of India and Ceylone*, London: TN Foulis, 1913, pp. 82-83

সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের বাইরে সমকালীন সাহিত্যকর্ম থেকেও চিত্রকলার কৌশল সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়। বিখ্যাত পৌরাণিক গ্রন্থ *মহাভারত* ও *রামায়ণ* এবং বাৎসায়ন, কালিদাস, বানভট্ট, রাজ্যশেখর প্রমুখের লেখায় *চিত্রসূত্রের* উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে বাৎসায়নের লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ *কামসূত্রের* কয়েকটি অধ্যায়ে চৌষট্টি কলার অন্যতম হিসেবে চিত্রকলার উল্লেখ রয়েছে। বাৎসায়ন চিত্রকলার ছয়টি অঙ্গের কথা উল্লেখ করেছেন, যাকে একত্রে ষড়ঙ্গ বলা হয়।[২১৫] এই ছয়টি অঙ্গ হলো: রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজনা, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ।

ষোড়শ শতকের তিব্বতি ঐতিহাসিক লামা তারনাথের বিবরণী থেকেও পাল চিত্রকলার রীতি চরিত্র সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর বর্ণনা অনুসারে পাল শাসক ধর্মপাল (খ্রিষ্টীয় ৭৮১-৮২১) ও দেবপাল-এর (খ্রিষ্টীয় ৮২১-৮৬১) রাজত্বকালে বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গের দুজন শিল্পী ধীমান ও তাঁর পুত্র বিটপাল বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।[২১৬] পাথর ও ধাতুর ভাস্কর্য গড়ায় এবং চিত্রাঙ্কনে তাঁরা ছিলেন খুবই খ্যাতিমান শিল্পী। কিন্তু শিল্পরীতির ক্ষেত্রে পিতা ও পুত্রের মধ্যে পার্থক্য ছিল। চিত্রকলার ক্ষেত্রে পিতা 'পূর্ব দেশীয় রীতি' এবং পুত্র 'মধ্যদেশীয় রীতি' অনুসরণ করেন। তারনাথের এ উক্তি থেকে বোঝা যায় যে, পাল যুগে পূর্ব-ভারতীয় চিত্রকলায় ছিল বরেন্দ্র ও মগধ অঞ্চলের দুটি পৃথক রীতি।

পাল যুগে তৈরি মিনিয়েচারের ফিগারগুলিতে ছন্দময় রেখা ও পরিপূর্ণ শারীরিক গঠনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই

---

[২১৫] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ*, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা: বর্ণায়ন, ২০১৪. পৃ. ১-৯

[২১৬] Lama Taranatha, *Taranatha's History of Buddhism in India*, translated into English by Alaka Chattopaddhaya, edited by Debiprasad Chattopaddhaya, New Delhi: Motilal Banarsidass Publ., 1990, pp 47

মিনিয়েচারগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও এগুলিতে ধ্রুপদী শিল্পরীতির সকল বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে। ইউরোপীয় মিনিয়েচারের সাথে এর প্রধান পার্থক্য হলো, সমসাময়িক পাথর ও ধাতুর তৈরি মূর্তির শিল্পরীতির অনুকরণে এগুলি আঁকা হয়েছিল, অর্থাৎ এগুলি প্রচলিত অর্থে মিনিয়েচার ছিল না, ছিল দেয়ালচিত্রেরই ক্ষুদ্রতর সংস্করণ।

পাল পুঁথিচিত্রগুলি কিন্তু ছিল এক অর্থে দরবারী ছবি। রাজা কিংবা রাজ দরবারের অভিজাতবর্গই এই ছবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন; পুণ্য অর্জনের উদ্দেশে তাঁরা যে এ সব পাণ্ডুলিপি তৈরি করিয়েছেন, পাণ্ডুলিপিগুলোতেই তার উল্লেখ আছে। তবে প্রাচীন কাল থেকেই বাংলায় একেবারে সাধারণ মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায় এক ধরনের চিত্রকলার চর্চা হয়ে এসেছে। বৈদিক যুগে রচিত সংস্কৃত সাহিত্য *অভিজ্ঞান-শকুন্তলম*, *মালবিকাগ্নিমিত্রম*, *মুদ্রারাক্ষস* প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার চিত্রকলা সম্পর্কে যে ধারনা পাওয়া যায় তাতে চিত্রকরদের পটিকার, পটিদার, পটুয়া বা পেটো ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।[২১৭] *শকুন্তলা*র কাহিনীতে এই পটুয়াদের কথা উল্লেখ রয়েছে।[২১৮] অন্য দিকে বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ *দিব্যাবদান*-এর 'বীতাশোকাবদান' অংশে এক কাহিনী থেকে জানা যায়, খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতকে বাংলায় চিত্রকলার প্রচলন ছিল।[২১৯] এছাড়া খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ীতে গ্রামশিল্পী এবং

---

[২১৭] ফয়েজুল আজিম, 'চিত্রকলা', লালারুখ সেলিম (সম্পাদক), *চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা সিরিজ ৮*, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০০৭, পৃ. ৩।

[২১৮] Romila Thapar, *Sakuntala: Texts, Readings, Histories,* New Delhi: Kali for Women, 1999, pp. 43

[২১৯] Robert A. Neil and Edward B. Cowell, *The Divyâvadâna: a collection of early Buddhist legends, now first edited from the Nepalese Sanskrit mss. in Cambridge and Paris*; Cambridge: University Press 1886, pp 419-429

রাজশিল্পী, এ দুই বর্গের কথা উল্লেখ করেছেন।[২২০] পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উল্লেখ রয়েছে যে গ্রামশিল্পীরা পথের ধারে লোকজনকে হাতে আঁকা পটের সাহায্যে কংসবধ পালা দেখাচ্ছেন।[২২১] পট এঁকে তার সাহায্যে গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষকে নানা রকম ধর্মকথা শোনাতেন বলে এই লোকশিল্পীদের পরিচয় ছিল পটুয়া নামে। ধর্মীয় আবেগ যুক্ত থাকলেও পটচিত্র ছিল মূলত শিল্পীদের জীবিকার মাধ্যম।

সংস্কৃত 'পট্ট' (কাপড়) শব্দ থেকে 'পট' শব্দের উৎপত্তি, আর এই পটে অঙ্কিত চিত্রই হচ্ছে পটচিত্র। আবহমান কাল ধরেই বাংলায় পটুয়াদের অস্তিত্ব আছে বলে জানা যায়, কিন্তু পটচিত্রের প্রাচীনতম যে নিদর্শন সংরক্ষিত হয়েছে সেটি ১৪২১ শকাব্দ বা ১৪৯৯ সালের একটি *বিষ্ণুপুরাণ* পাণ্ডুলিপি, বর্তমানে কলকাতার আশুতোষ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত।[২২২] পঞ্চদশ শতকেই মূলত বৈষ্ণব ধর্মাশ্রিত বিষয়বস্তুকে ঘিরে পটচিত্রের ধারা অত্যন্ত বেগবান হয়েছিল। পাল আমলের পর বাংলা চিত্রকলায় যে সাময়িক অবক্ষয়ের সূচনা ঘটেছিল, বলা যায় এর মধ্য দিয়ে সেটির অবসান ঘটেছিল।

পট প্রধানত দু প্রকার–দীর্ঘ জড়ানো পট ও ক্ষুদ্রাকার চৌকা পট। জড়ানো পট ১৫-৩০ ফুট লম্বা ও ২-৩ ফুট চওড়া হয়। আর চৌকা পট হয় ছোট আকারের। পট তৈরিতে সাধারণত তসর সিল্কের তৈরি কাপড় ব্যবহার করা হতো। সিল্কের দুটি প্রস্থকে সেলাই করে নিয়ে তৈরি করা হতো পটের

---

[২২০] পাণিনী, *অষ্টাধ্যায়ী*; দ্রষ্টব্য, George Cardona, *Pāṇini: A Survey of Research*, Delhi: Motilal Banarsidass, 1998, pp. 261-271

[২২১] পতঞ্জলি, *মহাভাষ্য*; দ্রষ্টব্য, K. Kunjunni Raja, 'Philosophical elements in Patañjali's Mahābhāṣya', In Harold G. Coward, K. Kunjunni Raja (eds), *Encyclopedia of Indian philosophies*, vol. V (The Philosophy of the Grammarians), Delhi: Motilal Banarsidass Publ, 1991, pp. 115-125

[২২২] অশোক ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯

জমিন। দুটি প্রস্থকে জোড়া দেয়ার কাজে ব্যবহার করা হতো তেঁতুল বিচি থেকে তৈরি এক ধরনের আঠা। ছবি আঁকার আগে কাপড়ের উপর কাদা, গোবর ও আঠার প্রলেপ দিয়ে এই জমিন প্রস্তুত করা হতো। তারপর সেই জমিনে পটুয়ারা তুলি দিয়ে বিভিন্ন চিত্র অঙ্কন করতেন। পটটিকে সাধারণত কয়েকটি অংশে ভাগ করে তার উপর লাল, নীল, হলুদ, গোলাপি, বাদামি, সাদা ও কালো রং লাগিয়ে ছবি আঁকা হতো। তুলি হিসেবে ব্যবহৃত হতো কঞ্চির ডগায় পশুর লোম বা পাখির পালক।

প্রাচীন বাংলায় পটুয়াদের গুরুত্বের তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু উনিশ শতকে গ্রামবাংলার এই পটুয়া সম্প্রদায়ের আঁকা ছবি রীতিমতো আলোড়ন তুলেছিল। ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী শহর কলকাতার কালীঘাটের কালীমন্দিরের সন্নিহিত বাজার এলাকায় বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল এই ছবির বাজার। তীর্থযাত্রীরা তাদের নিজেদের এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদের জন্য তীর্থযাত্রার স্মারক হিসেবে স্মৃতিচিহ্নসমূহ নিয়ে যেতেন। প্রাথমিক পর্যায়ে এ চিত্রকলার বিষয় ছিল পৌরাণিক-ধর্মীয় কাহিনী, আর মাধ্যম হিসেবে কাপড়ের তৈরি পটের পরিবর্তে হাতে তৈরি সস্তা কাগজ। কিন্তু ক্রমে ক্রমে পটশিল্পীরা ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়কেও অন্তর্ভুক্ত করতে থাকেন এবং এতে সমসাময়িক সামাজিক বিষয়ের প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়। এ চিত্রকলায় নবজাত নাগরিক সমাজের মূল্যবোধ প্রতিফলিত ও উপস্থাপিত হয়েছিল। এই ছবির বাজার এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে সাধারণ মুসলিমরাও নিজেদের ঘরে কালিঘাটের শিল্পীদের ছবি রাখতে চাইতেন। এই চাহিদার কথা মাথায় রেখে শিল্পীরা মুসলিম ক্রেতাদের জন্য দুলদুল ও অন্যান্য বিষয়ও অঙ্কন করতেন। মিসেস বেল্‌নস একজন ইউরোপীয় চিত্রকর তাঁর ম্যানার্স ইন বেঙ্গল (১৮৩২)-এ উল্লেখ করেন যে, তিনি দেশীয় দেবতাদের ছবিসহ 'কয়েকটি

অপটু চিত্রকর্ম' দেখেছেন ।[২২৩] তাঁর আঁকা একটি স্কেচে বাঙালি গৃহে কালীঘাট চিত্রকলা দেখা যায় ।

গ্রাম বাংলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত এ চিত্রকরবৃন্দ নাগরিক সংস্কৃতি ও আচার-আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং আবেগ দিয়ে তারা তাদের সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করতেন । এভাবে এক ধরনের ধর্মনিরপেক্ষ চিত্রকলার সূচনা ঘটে যা বাবু সংস্কৃতি, নারীবাদ, সামাজিক লাম্পট্য, ধর্মীয় ভ-ামি ও সবরকমের মিথ্যাচারকে অবজ্ঞা করেছিল । তাই শিল্পী হয়ে ওঠেন একজন সমাজ সমালোচক । এক টাকায় ১৬ থেকে ৬৪টি চিত্রকর্ম পাওয়া যেত এবং এ ধরনের কাজ মধ্যবিত্ত ও নিম্নধ্যবিত্তদের মধ্যে একটা তৈরী বাজার পেয়ে গিয়েছিল ।

কালীঘাট চিত্রকলায় *চৌকোশ পট* বা উল্লম্ব আয়তক্ষেত্রিক আকার দেখা যায় । সাধারণভাবে এর আকার ছিল ১১´´ × ১৭´´ বা ২৭ × ৪৩ সেমি । চিত্রকলায় সস্তামানের কাগজ এবং সস্তায় তৈরী রং ব্যবহৃত হতো । কাঠবিড়ালি ও বাছুরের পশম দিয়ে তৈরি হতো ব্রাশ । প্রথাগত ভারতীয় রঙিন প্রলেপ বা অস্বচ্ছ রঙের বিপরীতে স্বচ্ছ আভা সৃষ্টির জন্য রং ব্যবহার করা হতো । চার ধরনের ব্রাশের কাজ হতো । প্রথমত, পানিসহ মোটা ব্রাশের অগ্রভাগ কালো কালি বা রঙের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হতো যাতে কেবল একটি টানে ছায়াময় দেহরেখা, এর নমনীয়তা এবং নলাকার পি- সৃষ্টি করা যায় । দ্বিতীয়ত, কালো বা গাঢ় রঙের চটুল, সরু ও ছোট টান ব্যবহার করা হতো যাতে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন, চোখ, নাক, আঙুল বা পোশাকের ভাঁজ বা অংশ আলাদা করে নির্দেশ করা যায় । তৃতীয়ত, কাপড়ের পাড় চিহ্নিত করার জন্য মোটা কালো রেখা ব্যবহার করা হতো । কালো ঘেরের সাহায্যে চুলও আঁকা হতো ।

---

[২২৩] S. C. Belnos, *Manners in Bengal*, p 9-10; দ্রষ্টব্য, বর্তমান অভিসন্দর্ভ, ... অধ্যায়, পৃ. .., চিত্র :

চতুর্থত, কাপড়ের বর্ণ এবং শরীর থেকে তা পার্থক্য করার জন্য রঙের ছোপ ব্যবহার করা হতো। কখনও কখনও শরীরের অঙ্গেও বাড়তি রং ব্যবহার করা হতো। ছায়াময় দেহরেখা ও সুস্পষ্ট অঙ্গভঙ্গি এবং গতির সাহায্যে দেহাবয়ব অরঞ্জিত জমিনের ওপর এক পটোপম বৈশিষ্ট্য পেত। আঙ্গিকগত ও রৈখিক পরিমিতি, অভিব্যক্তিময় ভঙ্গিমা, তুলির নৈপুণ্য এবং নির্ভুল ছন্দময় টানের মাধ্যমে এ রীতি প্রতীকায়িত হয়ে ওঠেছিল। পরবর্তী পর্যায়ে অলংঙ্কারাদির জন্য রূপা ব্যবহার করা হতো।[২২৪]

লোকায়ত শিল্পের এই ধারাটি খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারেনি। কালিঘাটের পটের মূল শক্তি ছিল তার সস্তা মূল্য, কিন্তু জার্মানির প্রেস থেকে এই ছবির ছাপাই কপি আসতে শুরু করায় বিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে শিল্পীরা প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারাতে শুরু করেন। কারণ আরো সস্তায় স্থায়ি, ছাপানো কপি পাওয়ায় আসল ছবির প্রতি আর আকর্ষণ বোধ করতেন না কালিঘাটের ছবির মূল ভোক্তা, নিম্ন আয়ের মানুষজন। তবে পরের শতকের শুরুতে বাংলায় যে জাতীয়তাবাদী ধারণার বিকাশ ঘটেছিল, কালিঘাটের ছবির খানিকটা হলেও অনুপ্রেরণা ছিল তাতে।

মুঘল রীতি

বাংলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে। সেই সূত্র ধরে মুসলিম শিল্পকলার ঢেউ এসে লাগতে শুরু করে বাংলার সংস্কৃতিতে। চিত্রকলার প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি খানিকটা রক্ষণশীল হওয়ায় মুসলিমদের শিল্পকলা বরাবরই ব্যবহারিক দিকের প্রতি জোর দিয়ে এসেছে।

---

[২২৪] শোভন সোম, 'কালিঘাট চিত্রকলা', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, ৫ম খ-, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০০১।

তাই মুসলিম শিল্পকলার সবচেয়ে জোরালো মাধ্যম স্থাপত্য । তবে চিত্রকলার চর্চাও মুসলিমরা করেছে, নবম শতক থেকেই পাণ্ডুলিপি ভিত্তিক চিত্রকলা চর্চার প্রমাণ পাওয়া যায় । তবে ত্রয়োদশ শতকের শেষ আর চতুর্দশ শতকের প্রারম্ভে তাব্রিজ কেন্দ্রিক মোঙ্গল-ইলখানি যুগ শুরুর আগে রাজকীয় চিত্রশালা স্থাপনের কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না ।[২২৫] তবে এরপর থেকে মুসলিম শাসকরা যেখানেই গেছেন, তাদের রাজ দরবারে স্থাপন করেছেন একটি চিত্রশালা । এই চিত্রশালাগুলি সাধারণত মুসলিম শাসকদের রাজকীয় 'কারখানা' অথবা গ্রন্থাগার (কুতুবখানা)-এর অংশ হিসেবে কাজ করতো ।[২২৬]

সুলতানি আমলে বাংলায় এ রকম কোনো কুতুবখানা বা চিত্রশালার অস্তিত্ব সম্পর্কে লিখিত কোনো উৎস থেকে তথ্য পাওয়া যায় না । তবে সুলতান নসরত শাহের আমলে চিত্রিত *শরফনামা* পাণ্ডুলিপিটি আবিস্কৃত হওয়ায় এ কথা বলাই যায় যে সীমিত পরিসরে হলেও বাংলার সুলতানদেরও চিত্রশালা ছিল । তবে মুসলিম বাংলায় চিত্রকলা চর্চার ধারাটি সবচেয়ে বেগবান হয় আমাদের আলোচ্য সময়েই । অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে মুর্শিদাবাদের নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে চিত্রকলার একটি আলাদা ঘরানাই গড়ে উঠেছিল । এই ঘরানার শিল্পীরা সবাই ছিলেন দিল্লীকেন্দ্রিক মুঘল চিত্রশালার রীতিতে প্রশিক্ষিত, তাই মুর্শিদাবাদের ছবির করণ-কৌশল সম্পর্কে জানতে হলে আগে মুঘল চিত্রকলার করণ-কৌশল জানা প্রয়োজন ।

চিত্রকলার প্রতি মুঘলদের প্রবল ভালোবাসা সর্বজন বিদিত । মুসলিম শাসকদের মধ্যে সম্ভবত মুঘলরাই চিত্রকলার সবচেয়ে দরদী পৃষ্ঠপোষক ছিল । নিজেদের রাজপ্রাসাদের সঙ্গে তো বটেই, এমনকি যুদ্ধযাত্রা বা মৃগয়ার

[২২৫] T.W. Arnold, *Painting in Islam,* first edition. Oxford 1918 new edition, New York: Dover Publications, Inc., 1965, pp. 59.

[২২৬] M.S. Dimand, *A Handbook of Muhammadan Art,* New York: New Hartsdale House, 1947, pp. 29-30.

সময়েও তারা নিজেদের সঙ্গে শিল্পীদের পুরো একটি দলকেই সঙ্গে রাখতেন বা অন্য কথায় বলা যায় তাদের সঙ্গেই থাকতো রাজকীয় চিত্রশালা। একে সাধারণত 'কারখানা' হিসেবেই চিহ্নিত করা হতো, তবে বাদশাহ আকবরের আমলে এই চিত্রশালার নাম দেয়া হয়েছিল 'সুরতখানা'। আনিস ফারুকির মতে সম্রাট হুমায়ুন এমনকি কাবুলে পালিয়ে থাকার সময়েও একদল চিত্রকরকে সঙ্গে রেখেছিলেন আর রাজ্য পুনরুদ্ধারের পর দিল্লীর পুরানা কিলায় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চিত্রশালা গড়ে তোলেন।[২২৭]

তবে মুঘল চিত্রকলার সত্যিকারের বিকাশ-পর্বটি শুরু হয়েছে আকবরের সময়ে। আইন-ই আকবরীর বর্ণনা থেকে জানা যায়, সুরতখানা মুঘল কারখানার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আর সেখানে চিত্রকরদের সঙ্গে কাজ করতেন বাঁধাইকার, হস্তলিপিবিশারদসহ বিভিন্ন শিল্পে দক্ষ কারিগররাও।[২২৮] তাদের সবার মিলিত প্রচেষ্টাতেই সম্পন্ন হতো একটি মুঘল পাণ্ডুলিপি বা মুরাক্কা (অ্যালবাম)-এর চিত্রায়ন। সপ্তদশ শতকে ভারত ভ্রমণকারী ফরাসি পর্যটক ফ্রাঁসোয়াঁ বার্নিয়ার সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলের মুঘল কারখানার যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা থেকেও পরিস্কার বোঝা যায় যে মুঘল কারখানারই অংশ ছিল তাদের চিত্রশালা–

> 'Large halls are seen in many places, called Kar-Kaneys or workshops for the artisans. In one hall embroiderers are busily employed supervised by a master. In another you

[২২৭] Anis Farooqi, *Art of India and Persia.* New Delhi: B.R. Publishing Co., 1979, pp. 5-8.

[২২৮] Abul Fazl Allami, *A'in-i-Akbari*, Vol. I, English Translation by H. Blochmann, revised and edited by D.C. Phillot; Reprinted, Delhi: Crown Publishers, 1988. pp 113-115.

see the goldsmiths; in a third painters; in a fourth, varnishers in lacquer work . . .'[২২৯]

মুঘলদের এই চিত্রশালার সূচনাপর্বে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ছিলেন পারস্য থেকে আগত দুজন চিত্রকর, মীর সৈয়দ আলি ও খাজা আবদুস সামাদ। তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই অনুমাণ করা যায়, এই চিত্রশালা গড়ে তোলা হয়েছিল পারস্যের সাফাভি চিত্রশালার আদলে। কিন্তু এখানে যে সব শিল্পীরা কাজ করতেন, তাদের বেশিরভাগই আবার ছিলেন ভারতীয়। পারসিক রীতি অনুযায়ী মুঘল দরবারি শিল্পীদেরও নিজেদের চিত্রকর্মের মাধ্যম, রঙ-তুলিসহ সকল উপকরণ নিজেদেরই তৈরি করে নিতে হতো। এই কাজে কারখানার কারিগররা তাদের সাহায্য করতেন। সুরতখানার শিল্পীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা হতো সারা ভারতবর্ষ থেকে এমনকি ভারতবর্ষের বাইরে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকেও।[২৩০] এই সব উপকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কাগজ। হাতে তৈরি কাগজের ওপর চিত্রকলার চর্চা করা মুঘলরাই ভারতবর্ষে জনপ্রিয় করে। প্রথম দিকে এই কাগজ আমদানি করা হতো চীন, তুরস্ক ও পারস্য থেকে। চীনা কাগজ পরিচিত ছিল 'খাতাই' নামে, পারস্যের কাগজের নাম ছিল 'ইসফাহানি' আর তুর্কি কাগজ পরিচিত ছিল 'সুলতানি' হিসেবে। তবে পরবর্তীতে ভারতেও কাগজ তৈরি হতে শুরু করে। ভারতীয় কাগজের নামও আমদানিকৃত কাগজের মতোই স্থান নামে পরিচিত ছিল, যেমনঃ কাশ্মিরি, নিজামশাহী, আদিলশাহী, দৌলতাবাদী প্রভৃতি

---

[২২৯] Francois Bernier, *Travels in the Mogul Empire: A.D. 1656-1668.* translated by Irving Brock, edited by Archibald Constable, London: A Constable, 1891; Third edition, New Delhi: S. Chand & Co. (Pvt.) Limited, 1972, p. 228.

[২৩০] Anis Farooqi, "Pigments and Materials used in Indian and Persian Miniatures", in *Islamic Culture*, Vol. LI, No. 1, January 1977, p. 11

নামে ।[২৩১] এছাড়া কখনো কখনো উপকরণের নামেও কাগজকে চিহ্নিত করা হতো, যেমন রেশম থেকে তৈরি কাগজের নাম ছিল 'হারিরি', বাঁশ থেকে তৈরি কাগজের নাম ছিল 'লাভাশা' ইত্যাদি ।[২৩২] হাতে তৈরি এ সব কাগজ মসৃণ হতো না, তাই ছবি আকাঁর আগে এই কাগজকে ঘষে মসৃণ করে নিতে হতো ।

মুঘল শিল্পীরা নিজেদের কাজের জন্য নিজেরাই 'ওয়াসিল' বা পেস্ট বোর্ড তৈরি করে নিতেন । কয়েক প্রস্থ কাগজ আঠা দিয়ে এঁটে দিয়ে এই ওয়াসিল তৈরি করা হতো ।[২৩৩] তবে মুঘল শিল্পীরা সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন রঙ আর তুলি নিয়ে । রঙের চরিত্র নিয়ে আইন-ই আকবরিতে বেশ দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়,

> White and black are believed to be the origin of all colours. They are looked upon as extremes, and as the component part of the other colours. Thus, white when mixed in large proportions with an impure black, will yield yellow; and white and black, in equal proportions will give red. White mixed with a large quantity of black will give bluish green. Other colours may be formed by compounding these. Besides, it must be borne in mind that cold makes a white body juicy, and a black body dry; and heat renders that which is fresh black, and that which is dry white.[২৩৪]

---

[২৩১] Anis Farooqi, "Pigments and Materials", পৃ. ১১ ।

[২৩২] Anis Farooqi, "Pigments and Materials", পৃ. ১১ ।

[২৩৩] Moti Chandra, *The Technique of Mughal painting*, পৃ. ১৬-১৭

[২৩৪] Abul Fazl, *A'in-i-Akbari*, vol. I, *op. cit.*, p. 102.

মুঘল শিল্পীরা রঙের ক্ষেত্রে পাল যুগের শিল্পীদের তুলনায় অনেক বেশি বৈচিত্র এনেছিলেন। মুঘল ছবিতে অন্তত ১৩ ধরনের স্থায়ি রঙ ব্যবহার করা হতো। নানা ধরনের খনিজ পদার্থ থেকে তৈরি এ সব রঙের সঙ্গে লবন, গাছের রস, পোকা-মাকড় এমনকি গো-মুত্র পর্যন্ত ব্যবহার করে তৈরি করা হতো রঙ। তবে মুঘল শিল্পীরা খুবই সতর্কতার সঙ্গে রঙ তৈরি করতেন। প্রথমে খনিজ উপকরণ গুঁড়ো করে নিয়ে তার সঙ্গে পানি, সফেদা (জিঙ্ক হোয়াইট) আর 'বাবল কি গোদ' বা গাম অ্যারাবিক (অ্যাকাসিয়া বা বাবলা গাছের কষ থেকে তৈরি আঠা) মিশিয়ে তৈরি করা হতো রঙ। রঙ তৈরির জন্য জিঙ্ক হোয়াইট আমদানি করা হতো চীন থেকে, সেগুলো গুঁড়ো করা হতো মসৃণ সিল্কের কাপড়ে মুড়িয়ে। তারপর সেই গুঁড়োকে চীনামাটির পাত্রে নিয়ে প্রয়োজন মতো আঠা ও পানি মিশিয়ে তৈরি করা হতো রঙ।

আনসারুল খাত নামের একটি পাণ্ডুলিপির উদ্ধৃতি দিয়ে ওয়াই কে বুখারি রঙ তৈরির নানা কৌশল বর্ণনা করেছেন।[২৩৫] *আনসারুল খাত* মূলত একটি হস্তলিপিবিদ্যাসংক্রান্ত গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপির লেখা তৈরির জন্য রঙ তৈরির কৌশলই এখানে বর্ণীত হয়েছে। বিশেষ করে প্রদীপের কালি থেকে কালো রঙ তৈরির এই প্রক্রিয়াটি আবহমান কাল ধরে বাংলায় চর্চিত কৌশলেরই একটি পরিবর্ধিত রূপ ছিল। মুঘলরা অন্য যে সব রঙ ব্যবহার করতো, তার মধ্যে এক লাল রঙেরই ছিল অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন শেড। যেমন[২৩৬],

১. গেরু (ভারতীয় লাল রঙ): হালকা ও উষ্ণ লাল রঙ।

২. হুরমুজ বা হিরাউঞ্জি (পারসিক লাল রঙ): গাঢ়, অনুজ্জ্বল লাল রঙ।

---

[২৩৫] Bukhari, Y.K. 'Pigments', *Marg*, Supplement to vol. XVI, no. 2, Bombay, 1963, pp 1-2

[২৩৬] Anis Farooqi, 'Pigments and Materials', পৃ. ১৬-১৭

৩. সিন্দুরা (কমলা-ঘেঁষা লাল রঙ)

৪. সাংরাফ বা ইগুর (সিঁদুরে লাল) । পারস্য থেকে আমদানি করা সাংরাফ পাথর থেকে কীভাবে এই রঙ তৈরি করা হতো আনসারুল খাত-এ তার বর্ণনা আছে ।

৫. কিরমিজি বা গুলাবি (গোলাপি লাল), যা তৈরি করা হতো শুকনো কীটপতঙ্গের নির্যাস থেকে ।[২৩৭]

নীল রঙের অন্তত দুটি ভিন্ন শেড মুঘল শিল্পীরা ব্যবহার করতেন । এক ধরনের নীল রঙ তৈরি করা হতো নীল গাছের নির্যাস থেকে, অন্য ধরনের রঙ ছিল খনিজ । সেটা তৈরি হতো নীলকান্তমণি বা লাপিস-লাজুলি পাথরের গুঁড়ো ব্যবহার করে । *আনসারুল খাত*-এ এই রঙকে বলা হয়েছে 'লাজাওয়ার্দ' আর এর দুটি ধরনের কথা জানানো হয়েছে, আসলি বা প্রাকৃতিক আর আমলি বা রূপান্তরিত । আমলি নীল রঙ তৈরি হতো সফেদা বা জিংক হোয়াইটের সঙ্গে কোনো ধরনের নীল নির্যাস ব্যবহার করে ।

মুঘল চিত্রকরদের আরেকটি প্রিয় রঙ ছিল হলুদ, তৈরি করা হতো একান্তই প্রাচীন ভারতীয় কৌশলে । গো-মুত্র সংগ্রহ করে চুলায় জাল দিয়ে তারপর রোদে শুকিয়ে নিয়ে তৈরি হতো এই রঙ ।[২৩৮] পিওরি নামে পরিচিত এই রঙ তৈরির জন্য মুঘল রাজকীয় শিল্পীরা শুধুমাত্র বিহারের মুঙ্গের জেলার বিশেষ ধরনের গরুর মুত্র ব্যবহার করতেন, যে গরুগুলোকে শুধুমাত্র আমগাছের পাতা খাওয়ানো হতো রঙ তৈরির স্বার্থে ।[২৩৯]

---

[২৩৭] Moti Chandra, *The Technique of Mughal painting*, পৃ. ২২

[২৩৮] *The Technique of Mughal painting*, পৃ. ২২

[২৩৯] P. Pal, *Court Paintings of India 16th-17th Centuries.* New York: Navin Kumar, 1983, p. 17

মুঘলরা এ সব রঙ ব্যবহার করতো গুয়াশ (Gouache) বা ঘন জলরঙ পদ্ধতিতে। আর এ রঙগুলোতে বন্ধন হিসেবে পূর্বোক্ত পদ্ধতিতে গাম অ্যারাবিক ব্যবহার করা হতো। এছাড়াও ব্যবহৃত হতো *ধাউ কি গোদ* নামে পরিচিত আরেক ধরনের গাছের নির্যাস এবং রিঠা। ময়দার সঙ্গে জিংক সালফাইড মিশিয়ে তৈরি করা হতো আরেক ধরনের আঠা, যা মূলত ব্যবহার করা হতো বাঁধাইয়ের কাজে।

ছবির আউটলাইন করার জন্য মুঘল শিল্পীরা নিজেদের মতো করে তুলি ও কলম বা পেনসিল তৈরি করে নিতেন। প্রাথমিক রেখাঙ্কনে ব্যবহার করা হতো 'ইমলি কি কয়লা' বা তেতুল বিঁচি পুড়িয়ে তৈরি করা বিশেষ ধরনের কয়লা।[২৪০] আর তুলি তৈরিতে সেই প্রাচীন বাংলার মতোই ব্যবহার করা হতো বিভিন্ন জীবজন্তুর লোম। এদের মধ্যে ছিল বেড়াল, কাঠবেড়ালি, ছাগল ও মহিষের লোম।

মুঘল চিত্রশালার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক ছিল এই, যে এখানে একজন উস্তাদ বা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কাজ করতেন অনেক শিল্পী। মুঘল দরবারের শিল্পী হতে চাইলে এই নিবিড় প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হতো সবাইকে। মুঘল বাদশাহরাও অনেক সময় প্রতিভাবান শিল্পীদের অল্প বয়স থেকেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। 'কারখানা' বা 'সুরতখানা'য় কাজ হতো অনেকটা কুটির শিল্পের মতো, শ্রম বিভাজনের নীতি মেনে। উস্তাদ বা পরিচালক প্রথমে একটি আউটলাইন দেখিয়ে দিতেন, সেটা অনুসারে তাঁর শিষ্য শিল্পীরা প্রথমে করতো আউটলাইনের কাজ, যাকে বলা হতো 'তারাহি'। এরপর উস্তাদ দেখিয়ে দিতেন কোথায় কোন রঙ লাগাতে হবে, 'রঙ আমেজি'র কাজটা হতো সেই অনুসারে। 'রঙ আমেজি'র কাজটা করতে গিয়ে আবার প্রথমে

[২৪০] Moti Chandra, *The Technique of Mughal painting*, পৃ. ৩৫

'জমিন-আসমান' অর্থাৎ ছবির সামনে পেছনের অংশ প্রথমে রঙ করা হতো। তারপর একে একে মানুষের মুখ ও শরীর আর সবশেষে পোশাকের রঙ চিত্রায়ন করা হতো। সবশেষে ফিনিশিং টাচ হিসেবে হতো চরিত্র-চিত্রণ বা মুখাবয়ব ফুটিয়ে তোলার কাজ, 'চেহরা কুশাই'।[২৪১] অনেক সময়ই এই তিনটি কাজ ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীরা করতেন, এভাবে একাধিক শিল্পীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে করা শ্রমে সম্পন্ন হতো একটি ছবির কাজ।[২৪২]

মুঘল চিত্রশালার এই উস্তাদ ও সাগরেদের যৌথ কারুকর্ম থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে আঠারো ও উনিশ শতকের বাংলায় প্রচলিত হয়েছিল আধুনিক ধারার শিল্প শিক্ষা (Academic Art)। এ ক্ষেত্রে পথ দেখানোর কাজটি অবশ্যই করেছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হয়ে বাংলায় প্রথমে বাণিজ্য বার পরে শাসন করতে আসা ইংরেজরা। কোম্পানির কর্মকর্তারা চিত্রকলার পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করেন মুর্শিদাবাদেই, তবে কোম্পানি আমলের চিত্রকলার বিকাশ আসলে সাধিত হয়েছে কলকাতাকে ঘিরে।

কোম্পানি রীতিঃ মুর্শিদাবাদ পর্ব

ইংরেজ পৃষ্ঠপোষকদের জন্য মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা যে সব ছবি আঁকতেন, সেগুলো আঁকা হয়েছিল তাঁদের নিজস্ব শৈলী, মুঘল-রীতিতেই। ঘন জলরঙ বা Gouache রীতিতে, হাতে তৈরি বিশেষ ধরনের কাগজের ওপর আঁকা এ সব ছবির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রাধান্য পেয়েছে মূলত মুঘল চরিত্র চিত্রায়ণ। তবে বাদশাহ বা নবাব এবং তাঁদের দরবারের অভিজাতবর্গের প্রতিকৃতির ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে পড়েছেন ইংরেজ সাহেবরাও। এ সময়কার বিভিন্ন শিল্পীর আঁকা ৪৬টি ছবির একটি বিশাল সংগ্রহ বর্তমানে রয়েছে লন্ডনের ভিক্টোরিয়া

[২৪১] *The Technique of Mughal painting*, পৃ. ৩৭

[২৪২] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, *দরবারি শিল্পের স্বরূপ মুঘল চিত্রকলা*, পৃ. ৮৭।

অ্যান্ড অ্যালবার্ট মিউজিয়ামে ।[২৪৩] ইংরেজ শল্যচিকিৎসক উইলিয়াম ফুলারটন ছবিগুলো সংগ্রহ করেছিলেন । এই সংগ্রহশালার একটি ছবিতে একজন মুঘল অভিজাতের সামনে তাঁর পুত্রদের বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে । ছবিটির অংকনরীতি, এমনকি মোটিফেও মুঘল শৈলীর ছাপ সুস্পষ্ট: চাঁদোয়ার নিচে, কার্পেটের ওপর বসে থাকা অভিজাত ব্যক্তিটির পোশাক-আশাক এবং বসার ভঙ্গিও মুঘল শৈলীর ছবিতে বহুল প্রচলিত । এ ছবিটির শিল্পীর নাম জানা যায় না । তবে দীপ চাঁদ নামে একজন শিল্পীর আঁকা প্রায় এ রকমই একটি ছবিতে মুঘল অভিজাতদের ভঙ্গীতে দেখা যাচ্ছে একজন ইংরেজ সাহেবকে । কার্পেটের ওপরে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে তিনি হুঁকো খাচ্ছেন । পোশাকে-আশাকে তাঁকে ইংরেজ হিসেবে চিনে নেওয়া যায়, তবে তাঁর সামনে পেছনের পরিচারকদের পোশাক মুঘল ধরনের । শুধু মোটিফ বা বিষয়বস্তুতেই নয়, পৃষ্ঠপোষকদের রুচিবোধের সঙ্গে তাল মেলাতে এই সময়ের ছবিতে অংকন কৌশলেও ধীরে ধীরে ইউরোপীয় প্রভাব ফুটে উঠতে শুরু করে । ঘন জলরংয়ের পরিবর্তে স্বচ্ছ জলরং বার ওয়াটার কালারের ব্যবহার শুরু হয়, মুঘল ছবির দ্বিমাত্রিকতা ছাড়িয়ে আলো-ছায়া আর পরিপ্রেক্ষিতের ব্যবহারে ত্রিমাত্রিকতার আবহও ছড়াতে শুরু করে । ফুলারটন সিরিজেরই একটি ছবিতে এর প্রমাণ পাওয়া যায় ।[২৪৪] জলরংয়ে আঁকা এ ছবিতে চন্দ্রালোকিত নিসর্গকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে শিল্পী চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন পরিপ্রেক্ষিত ।

কোম্পানি রীতি: কলকাতা পর্ব

[২৪৩] Fulerton Collection, Victoria & Albert Museum, London, Museum No: IM-33 : 1912.

[২৪৪] 'Moonlit Landscape'; দ্রষ্টব্য, Robert Skelton, 'Murshidabad Painting', in *Marg,* Vol. X, No. I, Bombay, December 1956, p. 19.

যে সব ইংরেজ সাহেবরা চিত্রকরদের দিয়ে নিজেদের প্রতিকৃতি আঁকিয়েছেন, তাঁদের ও তাঁদের আত্মীয় স্বজনের মাধ্যমে বাংলায় চিত্রকলা চর্চার খবর পৌঁছে গিয়েছিল ইংল্যান্ডেও। সেখানে তখন চিত্রকরদের বড় দুর্দিন চলছিল। তাই জীবিকার সন্ধানে অনেক পেশাদার ইংরেজ চিত্রকর এ সময় ভারতবর্ষে আসতে শুরু করেন। ভারতবর্ষে এ সময় কলকাতাই ছিল ব্রিটিশদের শাসনকেন্দ্র, তাই এ সব চিত্রকরদেরও বেশিরভাগ তাঁদের চিত্রকলা চর্চা করেছেন কলকাতাকে ঘিরে। আবার এ সময় ব্রিটিশ অভিজাতবর্গ এবং তাঁদের অনুকরণে এদেশীয় বাবুরা নিজেদের আবাসস্থলকে সাজাতে শুরু করলেন ব্রিটিশ স্টাইলে। বাড়ির নকশা যোগ হতে শুরু করল ফায়ারপ্লেস, ম্যান্টলপিস সমৃদ্ধ ড্রয়িংরুম, আর সেই ড্রয়িং রুম সাজাতে প্রয়োজন হলো সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো পেইন্টিং। ঘন, স্বচ্ছ জলরংয়ের ছবির পাশাপাশি তাই প্রচলন হতে শুরু করল তেলরংয়ের ছবিও। নগর কলকাতার বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে তাই অনেকখানি জড়িত কোম্পানি আমলে বাংলার চিত্রকলার বিকাশের ইতিহাসও।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে ভারতবর্ষে আসা পেশাদার ইংরেজ শিল্পীদের মধ্যে সবার আগে এসেছিলেন টিলি কেটল।[২৪৫] ১৭৬৯ সালে মাদ্রাজে (এখনকার চেন্নাই) এসে পৌঁছেছিলেন তিনি, কলকাতায় পৌঁছেছিলেন আরো দু বছর পর। তখন থেকে শুরু করে পরবর্তী অর্ধশত বছরে প্রায় ষাটজন ইউরোপীয় শিল্পীর নাম জানা যায়, যাঁরা কলকাতায় এসে চিত্রচর্চা করেছিলেন।[২৪৬] এদের বেশির ভাগই ছিলেন আসলে সস্তাদরের শিল্পী, ইংল্যান্ডে সুবিধা করতে না পেরে জীবিকার সন্ধানে এসেছিলেন বাংলায়। কিন্তু কয়েকজন ছিলেন খুবই

[২৪৫] Martin Postle, "Tilly Kettle", in H.C.G. Matthew, and Brian Harrison, eds. *The Oxford Dictionary of National Biography*. vol. 31, London: OUP, 2004, পৃ. ৪৬০-৪৬২।

[২৪৬] অশোক ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮।

উঁচু মানের শিল্পী। কেটল নিজের তাঁদের মধ্যে একজন। বাংলায় এসে তিনি কিন্তু বাংলার পূর্বতন রীতি আত্মস্থ করে ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন। তাঁর আঁকা সিরাজউদ্দৌলার প্রতিকৃতি দেখলে কোনো মুঘল চিত্রকরের কাজ বলে ভুল হতে পারে। ঘন জলরংয়ে আঁকা এ ছবিতে মুঘল শৈলীর মতো করেই 'হাশিয়া'র ব্যবহারও লক্ষ্যণীয়, যদিও সিরাজের মুখাবয়বে খানিকটা ইউরোপীয় ভাব ফুটে উঠেছে আর তাঁর প্রতিকৃতির পেছনের মেঘে ঢাকা আকাশ আঁকতে গিয়ে ব্রিটিশ স্টাইলের ত্রিমাত্রিক পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার করা হয়েছে।

১৭৭১ থেকে ১৭৭৬ সাল পর্যন্ত কেটল কলকাতায় অবস্থান করে চিত্রকলার চর্চা করেছেন। তাঁর পথ ধরে পরবর্তীতে কলকাতায় আসা পেশাদার ইংরেজ শিল্পীদের মধ্যে জন জোফানি (১৭৮৩-৮৯), আর্থার ডেভিস (১৭৮৫-৯৫), জর্জ ফ্যারিংটন (১৭৮৩-৮৮), টমাস হিকি (১৭৮২-৯১), ফ্রান্সেসকো রেনাল্ডি (১৭৮৬-৯৬), টমাস ও উইলিয়ম ড্যানিয়েল (১৭৮৬-৯৪), উইলিয়ম হজেস (১৭৮০-৮৩), জর্জ চিনারি (১৮০২-২৫), জেমস মোফাট (১৭৮৯-১৮১৫) ও রবার্ট হোম (১৭৯১-১৮৩৪) এবং বেলজিয়ান শিল্পী ফ্রাঁসোয়াঁ বালথাজার সলভিনস (১৭৯১-১৮০৪) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের পাশাপাশি কোম্পানির কর্মকর্তা হিসেবে এদেশে আসা কয়েকজন সৌখিন চিত্রকরের নামও স্মরণযোগ্য, যাঁদের মধ্যে ছিলেন চার্লস ড'য়লি, রবার্ট ক্রেইটন, জোসেফ স্কট ফিলিপস, আলেকজান্ডার ডি ফ্যাবেক প্রমুখ।

পেশাদার ইউরোপীয় শিল্পীদের অনেকেই তেলরঙে ছবি এঁকেছেন। এসব ছবির মধ্যে রেনাল্ডির আঁকা 'মুসলিম লেডি রিক্লাইনিং' (১৭৮৯) ছবিটি নানা কারণে বিখ্যাত। তেলরঙে চিত্রায়িত ছবিটি শিল্পী সম্ভবত ঢাকায় বসে

এঁকেছিলেন।[২৪৭] ছবিতে একজন ইউরোপীয় অভিজাতের ভারতীয় স্ত্রীকে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখা যাচ্ছে। তাঁর পরনে স্বচ্ছ মসলিনের পোশাক, পায়ের কাছে রাখা পানের বাটা। ছবির চরিত্র এ দেশীয় হলেও অংকন রীতি পুরোপুরি ইউরোপীয়।

কলকাতায় চিত্রকলা চর্চার ধারাটিকে যারা বেগবান করেছিলেন, তাদের মধ্যে ইমপে পরিবারের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কলকাতায় সদ্য প্রতিষ্ঠিত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইমপের পত্নী মিসেস ইমপে ছিলেন চিত্রকলার দারুণ সমঝদার। কলকাতায় এসে তিনি ভারতবর্ষ ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আনা পশুপাখির একটি বিশাল সংগ্রহশালা গড়ে তুলেছিলেন। এই সংগ্রহশালায় কেবল জীবন্ত পশুপাখি সংরক্ষণেরই ব্যবস্থা ছিল না, মিসেস ইমপে সেগুলোর প্রামাণ্য পরিচয় লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। আর এ জন্য তিনি তিন জন দেশীয় শিল্পী শেখ জৈনুদ্দিন, ভবানী দাস ও রাম দাসকে দিয়ে এ সব পশুপাখির ছবি আঁকিয়েছিলেন। এঁরা তিনজনই মুর্শিদাবাদের মুঘল শৈলীতে অভ্যস্ত শিল্পী ছিলেন, তাঁরা ছবিগুলো এঁকেছিলেন নিজেদের পরিচিত রীতিতেই। অক্সফোর্ডের অ্যাশমোলিয়ান মিউজিয়ামে রক্ষিত এই তিন শিল্পীর আঁকা বিভিন্ন পাখির ছবি জাহাঙ্গীরের দরবারের প্রতিকৃতি বিশারদ ওস্তাদ মনসুরকে মনে করিয়ে দেয়।[২৪৮]

ঠিক এই সময়ে বিশ্ব জুড়ে দরবারি ছবির পরিবর্তে ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল নিসর্গ চিত্রের ধারা। কোম্পানি আমলের শিল্পীরাও এ স্রোতের বাইরে ছিলেন না। হজেস, টমাস ও উইলিয়ম ড্যানিয়েল, মোফাট ও বালথাজারের মতো শিল্পীদের আকর্ষণের বিষয় ছিল ভারতবর্ষের মানুষজন, প্রকৃতি ও

[২৪৭] শামীম আমিনুর রহমান, 'ঢাকার অদেখা ছবি', *প্রথম আলো ঈদসংখ্যা ২০১০*, ঢাকা, আগস্ট ২০১০, পৃ. ৪১৯।

[২৪৮] অশোক ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।

পুরাকীর্তিসমূহ। এ ধারার ছবি অংকনের ক্ষেত্রে পুরোধা ছিলেন হজেস। ১৭৮০ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে ছিলেন তিনি, এ সময়ে কলকাতা ছাড়াও বারানসী, কানপুর, লক্ষ্মৌ, আগ্রা প্রভৃতি শহর ভ্রমণ করে তিনি যে সব ছবি এঁকেছিলেন, সেগুলো নিয়ে দেশে ফিরে ১৭৮৩ সালে তিনি প্রকাশ করেন *'সিলেক্ট ভিউস অফ ইন্ডিয়া'* শিরোনামের একটি অ্যালবাম। মূল ছবিগুলো জলরংয়ে আঁকা হলেও এ বইগুলো ছাপা হয়েছিল এনগ্রেভিং পদ্ধতিতে। চাচা-ভাইপো দুই ড্যানিয়েলের আঁকা এ রকম দৃশ্যাবলীর এনগ্রেভিং নিয়ে বেরিয়েছিল *টুয়েলভ ভিউস অফ ক্যালকাটা* (১৭৮৬-৮৮), *ওরিয়েন্টাল সিনারি* (১৭৯৫-১৮০৮) ও *পিকচারেস্ক ভয়েজ অফ ইন্ডিয়া* (১৮১০) নামে তিনটি সিরিজ। মোফাটের *ভিউস অফ ক্যালকাটা, বেহরামপুর, মঙ্গির অ্যান্ড বেনারস* (১৮০৫) এবং সলভিন্সের *ম্যানার্স, কাস্টমস অ্যান্ড ড্রেসেজ অফ ইন্ডিয়া*'র (১৭৯৯) দুইশত পঞ্চাশটি এনগ্রেভিংয়ে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যই নয়, এর সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ভারতের হাট-বাজার, মানুষজন, তাঁদের পোশাক-আশাক ও দৈনন্দিন জীবনাচরণের ছবি।[২৪৯]

ব্রিটিশরা এখানে যে স্বচ্ছ জলরঙের কৌশল ব্যবহার করতেন, মুগল শিল্পীদের কৌশলের সাথে তার মূল পার্থক্য হলো রঙের ঘনত্বে। মুঘল শিল্পীরা যে কৌশলে জল রঙ তৈরি করতেন, তার একটা বড় অংশ জুড়ে ছিল সফেদা আর বাবল কি গোদ এর ব্যবহারে রঙকে ঘন আর স্থায়ি করার প্রযুক্তি। ইউরোপে নিসর্গচিত্র অঙ্কনের স্বার্থে এই গাঢ় রঙের পরিবর্তে ব্যবহৃত হতো ভিন্ন ধরনের রঞ্জক, আর সেগুলোর বন্ধনে সফেদা বা জিংক হোয়াইটের ব্যবহার হতো না। হজেস ও ড্যানিয়েলরা অবশ্য মুঘল শিল্পীদের মতো

[২৪৯] Robert L. Hardgrave, Jr, 'A Portrait of Black Town: Baltazard Solvyns in Calcutta, 1791-1804.' In *Changing Visions, Lasting Images: Calcutta Through 300 Years*, edited by Pratapaditya Pal, 31-46. Bombay: Marg, 1990.

নিজেদের রঙ নিজেরা তৈরিও করতেন না, কারণ ততদিনে ব্রিটেনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে উইলিয়ম রিভসের 'ইনস্ট্যান্ট ওয়াটারকালারস' কোম্পানি। এই কোম্পানির রঙের ব্লক আমদানি করা হতো লন্ডন থেকে, সাবানের টুকরার মতো দেখতে রঙের ব্লকগুলোর ওপর পানিতে ভেজানো তুলি ঘষে রঙ তুলে ছবি আঁকতেন ভারত-প্রবাসী ব্রিটিশ শিল্পীরা। তাদের জন্য বিশেষ ধরনের মসৃণ কাগজও আমদানি করা হতো লন্ডন থেকেই।[২৫০]

ড্যানিয়েলদের হাত ধরেই বাংলায় জনপ্রিয়তা পেতে শুরু করে ছাপচিত্রের কৌশল। ইউরোপীয় শিল্পীরাই এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, সন্দেহ নেই। টমাস ড্যানিয়েল তো দাবি করেছেন যে তিনি তাঁর *টুয়েলভ ভিউস অফ ক্যালকাটার* লিথোগ্রাফিক এনগ্রেভিংগুলো 'কারো সাহায্য ছাড়াই' প্রস্তুত করেছেন।[২৫১] রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায় অবশ্য মনে করেন, কারো সাহায্য ছাড়াই বলতে তিনি মূলত কোনো ইউরোপীয় সহযোগী ছাড়াই লিথোগ্রাফ তৈরির কথা বুঝিয়েছেন।[২৫২] এ থেকে অনুমান করা যায়, আঠারো শতকের শেষ দিকেই বাংলার শিল্পীরা লিথোগ্রাফের কৌশল শিখে ফেলেছিলেন। লিথোগ্রাফ তৈরি করা হতো পাথরের ওপর ছবির উল্টো ছাপ ফেলে, রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে সেগুলোকে দৃঢ় ও স্থায়ী করার ব্যবস্থা করে। কাগজে এর ছাপ দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হতো 'ইন্টাগ্লিও' কালি।[২৫৩] এছাড়া প্লাস্টার অফ প্যারিসের ওপর নির্দিষ্ট ছবির উল্টো ছাপ ফেলে, সুক্ষ্ম ছুরি ও

---

[২৫০] অশোক ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯-৩০।

[২৫১] Pranab Ranjan Roy, 'Printmaking by Woodblock upto 1901' in Ashit Paul (ed), *Woodcut Prints of Calcutta,* Calcutta, 1983, p. 86

[২৫২] Ratnabali Chatterjee, *From the Karkhana to the Studio,* Delhi: Books n Books, 1990, p. 57

[২৫৩] 'ইন্টাগ্লিও' মূলত ছাপচিত্রের কৌশল, তবে ছাপচিত্রের জন্য উপযুক্ত কালি প্রস্তুতকারী একটি ব্রিটিশ কোম্পানি তাদের ব্র্যান্ড হিসেবে বেছে নিয়েছিল এই নাম, ব্রিটেন থেকে এই কালি আমদানি করা হতো। দ্রষ্টব্য, প্রণব রঞ্জন রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

সুইয়ের সাহায্যে গর্ত তৈরি করে তার ওপর গলিত দস্তা ঢেলে দিয়ে জিংকের ব্লকও তৈরি করা হতো।

বাংলার শিল্পী-কারিগররা এই লিথোগ্রাফ বা ছাপচিত্র নির্মাণের কৌশল শিখেছিলেন ইউরোপীয়দের কাছেই। তবে বাংলায় জনপ্রিয় হয়েছিল ছাপচিত্রের ভিন্ন একটি কৌশল, কাঠখোদাই। হ্যালহেডের ব্যকরণ ছাপার জন্য হুগলিতে বাংলা প্রিন্টিং প্রেস স্থাপন করা হয়েছিল আঠারো শতকের শেষভাগে। তবে কাঠ খোদাই করে ছবি ছাপার প্রক্রিয়াটি জনপ্রিয় হয়েছিল উনিশ শতকে, বটতলার ছবির সূত্র ধরে। ১৮১৬ সালে কলকাতা থেকে ছাপা *অন্নদামঙ্গল* নামের একটি বইয়ে ছয়টি কাঠখোদাই ছাপা ছবি ছিল।[২৫৪] এরপর থেকেই বটতলার প্রেসগুলোতে এ ধরনের ছবির প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। সস্তা কাগজে ছাপা এ সব ছবিযুক্ত বইও কালিঘাটের ছবির বাজারে ভাগ বসিয়েছিল অনেকখানি।

কোম্পানি আমলে যে সব পেশাদার শিল্পী বাংলায় এসেছিলেন, তাদের মধ্যে চিনারি প্রতিকৃতি আর প্রাকৃতিক দৃশ্য, উভয় ক্ষেত্রে দারুণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি কলকাতায় আর্ট স্কুল খুলে বসেছিলেন যেখানে স্থানীয় শিল্পীদের পাশাপাশি চিত্রকলা চর্চায় তালিম নিয়েছেন কোম্পানির সিভিলিয়ান কর্মকর্তারাও। তাঁর এ শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন চার্লস ড'য়লি। ঢাকার কালেক্টর ড'য়লির আমন্ত্রণে চিনারি ঢাকায় এসেছিলেন, দুজনে মিলে উনিশ শতকের ঢাকার অনেক ছবি এঁকেছেন। ড'য়লির ছবিগুলো নিয়ে পরে বেরিয়েছে তাঁর বহুল আলোচিত 'অ্যান্টিকুইটিজ অফ ঢাকা', সেই বইয়ের এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া ২০টি লিথোগ্রাফের মধ্যে অন্তত তিনটি চিনারির

[২৫৪] সুকুমার সেন, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮, পৃ. ২৯।

আঁকা ছবি অবলম্বনে খোদাই করেছিলেন লন্ডনের বিখ্যাত লিথোগ্রাফার জন ল্যান্ডসিয়ার ।

ড'য়লির মতোই আরেকজন সৌখিন ক্রেইটন গভীর দরদ দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন বাংলার বিভিন্ন প্রত্নসম্পদকে । ড'য়লির *ভিউজ অফ ক্যালকাটা* আর *অ্যান্টিকুইটিজ অফ ঢাকা* সিরিজের ছবিগুলো যেমন দুটি শহরের সমকালীন ইতিহাসের অমূল্য দলিল, ক্রেইটনের আঁকা গৌড়ের ছবিগুলোও তা-ই । ক্রেইটন, ড'য়লির মতো শিল্প সমঝদার সিভিলিয়ানরা কেবল নিজেরাই ছবি আঁকেননি, এমন ছবি আঁকার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন স্থানীয় শিল্পীদেরও । তাছাড়া কোম্পানির বিভিন্ন কাজেও, বিশেষ করে ড্রাফটসম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল অনেক স্থানীয় শিল্পীকে । যে কোনো ছবির অনুকৃতি তৈরিতে স্থানীয় শিল্পীদের দক্ষতার প্রশংসা করেছেন অনেক ইউরোপীয় চিত্রকলাবিদরাই, কিন্তু আধুনিক কৌশল, বিশেষত পরিপ্রেক্ষিত ও আলো-ছায়ার ব্যবহারে তাদের দক্ষতা নিয়ে সংশয় ছিল তাদের ইউরোপীয় পৃষ্ঠপোষকদের । সে দুর্বলতা দূর করতে ইউরোপীয় শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল স্থানীয় শিল্পীদের । বিশেষ করে ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে কলকাতার নিকটবর্তী বারাকপুরে *ইনস্টিটিউট ফর প্রোমোটিং ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া* এবং শিবপুরের *বোটানিক গার্ডেন* নামের প্রতিষ্ঠান দুটি গড়ে তোলার পর সেখানকার পশুপাখি ও গাছপালার ছবি আঁকার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বলে অনুমান করা হয় । ন্যাচারাল হিস্ট্রি ইনস্টিটিউটের জন্য রবার্ট হোম যে সব ছবি এঁকেছিলেন, তার মধ্য থেকে ২১৫টি নিয়ে দুখে-র একটি অ্যালবাম ছাপা হয়েছিল । ভারতীয় যে সব শিল্পী এ প্রতিষ্ঠানের জন্য ছবি এঁকেছিলেন, তাঁদের ছবিতেও হোমের প্রভাব সুস্পষ্ট । সীতা রাম, ইসি দাস ও শেখ মোহাম্মদ আমিরের মতো শিল্পীরা কেবল এই পশুপাখি আর গাছপালার ছবিই আঁকেননি,

একই সঙ্গে তাঁরা ইউরোপীয় শিল্পীদের মতোই এঁকেছেন বিভিন্ন নৈসর্গিক দৃশ্যও। স্বচ্ছ জলরংয়ে আঁকা সে সব ছবি যেন একেবারে ফটোগ্রাফিক বাস্তবতায় ফুটিয়ে তুলেছে প্রকৃতি, জীবজন্তু আর প্রত্নবস্তুকে।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে বাংলায় চিত্রকলা চর্চার ইতিহাসের বিশ্লেষণ থেকে একটা বিষয় পরিস্কার বোঝা যায়, বাংলায় চিত্রকলা চর্চার হাজার বছরের ঐতিহ্যে এ সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়েছিল। বাংলার চিত্রকলা মধ্যযুগ ছাড়িয়ে প্রবেশ করছিল আধুনিক যুগে। তাতে ওই সময় ইউরোপ থেকে আসা পেশাদার-অপেশাদার শিল্পীদের প্রভাব অবশ্যই ছিল। তাদেরই প্রভাবে মুঘল শৈলীর রং ও অংকন রীতি বদলে স্থান করে নিচ্ছিল ইউরোপীয় ধারার রীতিকৌশল, বিশুদ্ধ জলরঙ, তেলরঙয়ের ব্যবহার এমনকি ছাপচিত্র। তবে এ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নিয়ামক ছিল খুব সম্ভব পৃষ্ঠপোষকদের রুচিবোধ ও চাহিদা। এরই প্রভাবে মুর্শিদাবাদ চিত্রকলার মজলিশি বা দরবারি চরিত্র বদলে ধীরে ধীরে স্থান করে নিচ্ছিল আধুনিকতা। দরবারের ঘটনাবলী বা অভিজাতদের প্রতিকৃতির স্থান দখল করে নিচ্ছিল নিসর্গচিত্র কিংবা ফটোগ্রাফিক আদলে আঁকা জীবজন্তুর প্রতিকৃতি। আর এ নতুন ভাবনার বিকাশে স্থানীয় শিল্পীদের অবদানও কোনো অংশে কম ছিল না। কখনো ইউরোপীয় ধারায় প্রশিক্ষণ নিয়ে, কখনো বা অনুকৃতি তৈরিতে সহজাত দক্ষতার গুণেই তাঁরা আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন এ নতুন কৌশল, আর সঙ্গে তাদের নিজেদের ঐতিহ্যবাহী চিত্ররীতির সংমিশ্রণেই গড়ে উঠেছিল বাংলা চিত্রকলার কোম্পানি শৈলী। এই ধারা একেবারে একমুখীও ছিল না, বাঙলার শিল্পীরা যেমন উদারভাবে গ্রহণ করেছেন ইউরোপের একাডেমিক চিত্রের ধারা, তেমনি ইউরোপও নিয়েছে বাংলা থেকে–মিনিয়েচর রীতি আর গুয়াশ কৌশল। বাংলা আধুনিক ছবির যাত্রা শুরু হয়েছিল এই গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়ার হাত ধরেই।

উপসংহার

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকলা চর্চার রীতি-পদ্ধতিতে পরিবর্তন ও উন্নয়ন একটি স্বাভাবিক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বাংলা অঞ্চলও ব্যতিক্রম নয়। সেই প্রাচীন কাল থেকেই এ অঞ্চলে চিত্রকলা চর্চার এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিল। নানা সময়ে এ ঐতিহ্যে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে, প্রাচীন আমল পেরিয়ে এক সময় মধ্য যুগে উপনীত হয়েছে বাংলার চিত্রকলা, তারপর ধীরে ধীরে এগিয়েছে আধুনিকতার পথে। এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় আঠারো ও উনিশ শতক ছিল এক উজ্জ্বল সময়। মধ্যযুগ পেরিয়ে এই সময়ের মধ্যেই বাংলার চিত্রকলা পা রেখেছে আধুনিক যুগে। আর এই যুগান্তরের প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে স্থানীয় ঐতিহ্যের প্রভাব যেমন ছিল, তেমনি নানা বহির্দেশীয় উপাদানও দারুণভাবে সক্রিয় ছিল। পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহের আলোচনা থেকে আমরা এই দুই ধারার সংশ্লেষণের প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি।

বাংলার ইতিহাসে আঠারো শতক এমনিতেই এক পরিবর্তনের কাল হিসেবে পরিচিত। বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক দেখেছে এই শতক। একশত বছরেরও বেশি সময় ধরে মুঘল সাম্রাজ্যের একটি অবহেলিত প্রদেশ হিসেবে শাসিত বাংলা আঠারো শতকের গোড়ার দিকে দেখেছে মুর্শিদাবাদের নবাবদের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী শাসন কেন্দ্রের এক ক্ষুদ্রতর সংস্করণ হিসেবে গড়ে ওঠা। দিল্লীকেন্দ্রিক মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি কমে আসার সুযোগ নিয়ে বাংলায় মুঘলদেরই নামে কার্যত স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলা নবাবরা মুর্শিদাবাদে গড়ে তুলেছিলেন মুঘল দরবারের এক আঞ্চলিক

সংস্করণ। সেই সূত্রে আকবর-জাহাঙ্গীরের দরবারের কারখানার আদলে গড়ে উঠেছিল মুর্শিদাবাদের নবাবদের কারখানাও, যার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল 'কুতুবখানা' বা গ্রন্থাগার। এই সব কারখানায় বিভাজিত শ্রমের ভিত্তিতে উৎপাদিত হতো নবাবদের ব্যবহার্য নানা উপকরণ। সুক্ষ্ম রেশমি বস্ত্র থেকে শুরু করে কারুকার্যখচিত অস্ত্র-শস্ত্র– কারুশিল্পীদের নিখুঁত হাতের ছোঁয়ায় সজ্জিত উপকরণই কেবল ব্যবহার করতেন তাঁরা। গ্রন্থাগারের জন্য বইয়ের অনুলিপিও তৈরি করা হতো হাতে লিখে, আর সেগুলোকে অলঙ্কৃত করার স্বার্থে এই কুতুবখানার অপরিহার্য অংশ হিসেবে থাকতো রাজকীয় চিত্রশালা। মুর্শিদাবাদের নবাবদের আনুকূল্যে এ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল এক নতুন ভূ-অভিজাত শ্রেণিও, নবাবরা পুন্যাহর দিনে নবাবী মানের উপহার-উপঢৌকন দিয়ে উন্নতি ঘটিয়েছিলেন তাঁদের রুচিরও। রুচি এবং ক্রয়ক্ষমতার যুগপৎ উন্নয়ন এই সময়ে বিকাশ ঘটিয়েছিল শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক শ্রেণির। তাঁদের আনুকূল্যে যে চিত্রকলার চর্চা হয়েছে আঠারো শতকের প্রথমার্ধ এবং তারও কিছুকাল পর পর্যন্ত, সেটিকে চিহ্নিত করা যায় রাজকীয় বা দরবারি চিত্রকলা হিসেবে। বাংলায় আবহমান কাল ধরেই এ রকম দরবারি, ফরমায়েশি চিত্রকলার প্রচলন ছিল বটে, তবে সেই সব ছবি ছিল মূলত পাণ্ডুলিপি নির্ভর। রাজা-বাদশাহরা কখনো পূণ্য অর্জন কিংবা জনকল্যাণের স্বার্থে কখনো না নিজের জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটাতে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন চিত্রকরদের, তাঁদের আনুকূল্যে তালের পাতায় বা কাগজের পৃষ্ঠায় লেখা হতো পুঁথি, তাতে থাকতো অলঙ্করণও। মুর্শিদাবাদেও এর চর্চা হয়েছে বটে, তবে এর সঙ্গে সঙ্গে মুঘলদেরই অনুকরণে মুর্শিদাবাদে বিকাশ ঘটেছে চিত্রকলার নতুন একটি ধারার- সেটি হলো দরবারি প্রতিকৃতি। কখনো বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনার রূপ, কখনো বা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু নিয়ে ফরমায়েশি অ্যালবাম তৈরি করতে গিয়ে তুলিতে পৃষ্ঠপোষকদের তুলে ধরেছেন মুর্শিদাবাদের শিল্পীরা। এরা

বেশির ভাগই ছিলেন উত্তর ভারতে ইতোমধ্যে বিকাশের পর্ব পার করে আসা মুঘল শৈলীতে অভ্যস্ত। কাগজের ওপর ঘন জলরঙ বা গুয়াশ পদ্ধতিতে ছবি আঁকা বাংলায় হাজার বছর ধরে প্রচলিত তালপাতার পুঁথির শিল্পীদের কাছে অপরিচিত ছিল না, তবে ছবির বিন্যাসে পাখির চোখে দেখা বা এরিয়েল পারস্পেকটিভের ব্যবহার এক নতুন আবহ নিয়ে আসে মুঘল শৈলী। দুটো মিলিয়ে যে রীতি গড়ে উঠছিল, সেটাকে আঞ্চলিক মুঘল শৈলী হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়, তবে বাংলার স্থানীয় রীতি বললেও মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না। শুধু মুর্শিদাবাদেই নয়, এই ধারার চর্চা হয়েছে বাংলার অন্যান্য শহরেও। আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঢাকার নবাবদের তত্ত্বাবধানে দরবারি ছবির এ রকম দারুণ গুরুত্বপুর্ণ একটি ধারা সে কথাই প্রমাণ করছে।

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আরেক দফা রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূত্র ধরে বাংলার চিত্রকলায় যোগ হয় নতুন এক ধারা। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার শাসন ক্ষমতায় বসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কোম্পানির কর্মকর্তারা সকলে মুর্শিদাবাদের নবাবদের মতো অভিজাত ছিলেন না, এই দেশে আসার আগে অনেকেই ছিলেন ভাগ্যান্বেষী বণিক অথবা সৈনিক। কিন্তু বাংলায় এসে তারা বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হতে শুরু করেছিলেন নবাবী আমল থেকেই। শুরুর দিকে মুঘলদের দেয়া দস্তক দেখিয়ে কোম্পানির বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার অধিকারকে অবৈধভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় খাটিয়ে এ অর্থ উপার্জন করতেন তাঁরা। কোম্পানি ক্ষমতায় আসার পর তো রীতিমতো রাজা হয়ে বসে তারা। নবাবদের রাজকীয়তাকেও অনুকরণ করতে শুরু করে তারা। সেই সূত্রে পরিবর্তনের ঢেউ লাগে চিত্রকলায়ও। মুর্শিদাবাদী রীতিতে ফরমায়েশি চিত্রকলার যে বৈশিষ্ট্যটি বড় পরিবর্তনের কারণ হয়েছিল, কোম্পানি আমলে সেটি আরো বেগবান হয়– পৃষ্ঠপোষকের রুচি বদল। মুর্শিদাবাদের নবাব ও তাঁদের অভিজাতবর্গের দরবারের ছবিতে যে রাজকীয়

রূপ ছিল, কোম্পানি আমলের শুরুতে সেটারই পৃষ্ঠপোষকতা দিতে এক রকম বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশরা। কোম্পানির গভর্নরদের মধ্যেও ওয়ারেন হেস্টিংসের মতো চিত্রকলা প্রেমী ছিলেন, যাঁরা সেই মুঘলদের মতোই দরবারি ছবির পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব আর তাঁর অনুগত জমিদারদের মধ্যে পার্থক্যের যে সীমারেখা মুর্শিদ কুলি খান নিজে টেনে দিয়েছিলেন[২৫৫], কোম্পানির শাসনামলে সেই সীমারেখাটি অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়ে, রাজা-প্রজার সম্পর্কটি পরিবর্তিত হয়ে গড়ে ওঠে সাহেব-নেটিভ সম্পর্ক। নেটিভদের সম্পর্কে উন্নাসিক মনোভাব সত্ত্বেও সাহেবরা কিন্তু নেটিভ রাজাদের অনুকরণ করতেন শুরুর দিকে। সেটা করতে গিয়েই আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার চিত্রকরদের কাজের সুযোগটা আরেকটু সম্প্রসারিত করেছিলেন তাঁরা, দরবারি চিত্রকলা থেকে বাংলার চিত্রকলা হয়ে উঠতে শুরু করেছিল অভিজাততান্ত্রিক চিত্রকলা।

তবে দিগন্তটা সম্প্রসারিত হলেও বাংলার চিত্রকরদের আবার এই সময়েই পড়তে হয়েছিল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখেও। বাংলায় চিত্রকরদের জন্য উন্মুক্ত জগৎটির খবর পৌঁছে গিয়েছিল ইউরোপেও, ভাগ্যের সন্ধানে ইউরোপ থেকেও তাই অনেক চিত্রকর আসতে শুরু করেছিলেন এদেশে। তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন ইউরোপীয় রীতি, কৌশল আর ধারণা। টিলি কেটল, জোহান জোফানি, আর্থার ডেভিসদের মতো প্রথম দিকের অভিবাসী চিত্রকররা প্রথম দিকে এঁকেছেন তাঁদের নিজস্ব স্টাইলেই। তাদের হাত ধরে বাংলার চিত্রকলায় প্রবেশ করেছে তেল রঙে আঁকা প্রতিকৃতি চিত্রনের ধারা।

তবে বাংলার চিত্রকররা এই ধারাটিকে সেভাবে আত্মস্থ করেননি কখনোই। তাঁরা নিয়েছেন অন্য কিছু। ইউরোপে তখন রোমান্টিকতার যুগ, একাডেমিক রিয়েলিজমের রাজত্ব চলছে। ব্যক্তি, বা চরিত্র ছাপিয়ে ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে

[২৫৫] দ্রষ্টব্য, দ্বিতীয় অধ্যায়, পৃ. ...

প্রাকৃতিক দৃশ্যের ব্যাপক কদর। হেস্টিংস নিজে যে তাঁর দরবারে অন্তত একজন নেটিভ চিত্রকরকে স্থান দিয়েছিলেন, সেটার প্রমাণ মেলে তাঁর সঙ্গে সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করা সীতারামের দুই শতাধিক ছবি আবিস্কৃত হওয়ায়। এই ছবিগুলির বেশিরভাগই প্রাকৃতিক দৃশ্যের, আর সেই দৃশ্য রূপায়ণে ব্যবহৃত হয়েছে ইউরোপ থেকে আমদানি করা নতুন কৌশল- স্বচ্ছ জলরঙ। ভারতীয় শিল্পীরা যেখানে ছবি আঁকার আগে কাগজের ওপর জমিন তৈরি করে নিতেন, তার ওপর নিজেদের তৈরি ঘন রঙের পরশ বুলিয়ে ফুটিয়ে তুলতেন ছবি, জল রঙের ক্ষেত্রে সেটা করা হতো না- ইউরোপ থেকে আমদানি করা রাসায়নিক রঙের প্রলেপ দেয়া হতো কালার-ওয়াশ পদ্ধতিতে। এই রঙ তুলনামূলক বেশি উজ্জ্বল, সঙ্গে ইউরোপীয় ধারার রৈখিক পরিপ্রেক্ষিত বা লিনিয়ার পারস্পেকটিভের ব্যবহারে প্রকৃতিকে ফটোগ্রাফিক বাস্তবতায় ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়।

সীতা রামের মতো ভারতীয় শিল্পীরা এই ধারা আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ পেয়েই। শুরুতে প্রশিক্ষণের ধারাটি ছিল অপ্রাতিষ্ঠানিক- ইউরোপ থেকে আসা শিল্পীদের তত্ত্বাবধানে নিজেদের প্রয়োজন মতো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিল শিবপুরের বোটানিক গার্ডেন। স্যার এলিজা ইমপের মতো পৃষ্ঠপোষকদের নিজস্ব চিত্রশালায়ও অনেকটা মুঘল স্টাইলে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এ প্রশিক্ষণ চলেছে। তবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই প্রশিক্ষণে যোগ হয় প্রাতিষ্ঠানিক ধারা। ১৮৩৯ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মেকানিকাল স্কুলকে বলা যায় এই ধারার পথিকৃৎ, তবে এ ক্ষেত্রে সত্যিকারের গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপটি শুরু হয়েছিল ১৮৫৪ সালে ক্যালকাটা স্কুল অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ব্রিটেনের রয়্যাল একাডেমি'র সিলেবাস-কারিকুলাম অনুসরণ করে এই প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছিল ভারতবর্ষের 'কারুশিল্পী'দের সত্যিকারের ফাইন আর্ট বা চারুশিল্প

শেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে। এই স্কুলই পরবর্তীকালে ক্যালকাটা আর্ট স্কুলে রূপান্তরিত হয়, এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে নিজস্ব স্টুডিও খুলে স্বাধীন শিল্পচর্চা করতে শুরু করেন অনেকেই। ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও বা চোরবাগান আর্ট স্টুডিওর মতো এই নতুন ধারার শিল্পীদের জন্য পৃষ্ঠপোষক হিসেবে আবির্ভাব ঘটে নগর কলকাতার বিকাশমান মধ্যবিত্ত সমাজ। কিন্তু এই স্টুডিও-আর্টিস্টদেরও নজর দিতে হয়েছিল অন্য একদল পৃষ্ঠপোষকের দিকে- বাংলার সাধারণ মানুষ।

দরবারি চিত্রকলার বাইরে বাংলার গণমানুষের জন্য পৃথকধারার চিত্রকলার অস্তিত্ব ছিল প্রাচীন কাল থেকেই। পটুয়া সম্প্রদায়ের শিল্পীরা বংশ পরম্পরায় ছবি আঁকতেন, যদিও সেই ছবি বিক্রি করতেন না তাঁরা, ছবি দেখিয়ে গল্প বলে নির্বাহ করতেন জীবিকা। উনিশ শতকে নগর কলকাতার বিকাশ একেবারেই ঘটনাচক্রে এই পটুয়াদের সামনে খুলে দিয়েছিল এক নতুন দিগন্ত, ফলে বাংলার চিত্রকলায়ও নতুন এক দিগন্তের উন্মেষ ঘটেছিল। উইলিয়ম আর্চারের মতো পণ্ডিতরা এর নাম দিয়েছেন 'বাজার আর্ট'। দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত কালীমন্দিরকে ঘিরে শুরু হয়েছিল এই ধারার। মন্দিরের দর্শনার্থীদের জন্য শুভেচ্ছা স্মারক হিসেবে দেব-দেবীর প্রতিকৃতি আঁকতে আঁকতে গণমানুষের শিল্পীদের যে স্বাধীন সত্ত্বার বিকাশ ঘটেছিল, তার প্রয়োগ ঘটিয়ে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন সমাজের দর্পণ। কলকাতার বাবু-কালচারকে তীব্রভাবে ব্যঙ্গ করে আঁকা তাদের ছবিগুলো তার প্রমাণ। সেই সঙ্গে কালীঘাটের ছবির ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে গিয়ে এক রকম নিজেদের অজান্তেই কালীঘাটের শিল্পীরা তাঁদের বংশ পরম্পরায় শেখা হাজার বছরের ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন সময়ের প্রবল প্রতাপশালী ইউরোপীয় চিত্রধারার অনেক কিছু। নিজেদের বানানো রঙের সঙ্গে অবলীলায় মিশিয়েছেন আমদানি করা জলরঙ, চোখের সামনে দেখা সাহেবদের পোশাক পরিয়ে দিয়েছেন এমনকি কার্তিকের

মতো দেবতাকেও। শুধু তা-ই নয়, এক সময় যখন এই শিল্পীদের আঁকা ছবি ক্রমবর্ধমান তীর্থযাত্রীদের চাহিদা মেটাতে পারছিল না, তখন তাঁদের আঁকা ছবিকে ছাপিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কলকাতার বটতলাকে ঘিরে বিকশিত ছাপাই ছবির এই কৌশলটিও বাংলায় এসেছে আঠারো শতকে, ইউরোপীয় চিত্রকরদের হাত ধরে। তবে সেটিকে একান্তই নিজের মতো করে ব্যবহার করেছেন বটতলার শিল্পীরা। তাঁরা কৌশলটা শিখেছিলেন অভিজ্ঞতা দিয়ে, ব্যবহারও করেছেন অভিজ্ঞতারই আলোকে। তবে বটতলায় কাঠখোদাই ছবি যেমন করে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে ফেলেছিল কালীঘাটের শিল্পীদের, তেমনি উনিশ শতকের শেষ দিকে একাডেমিক ধারায় শিক্ষিত কলকাতার স্টুডিও আর্টিস্টদের লিথোগ্রাফিক প্রেসের নিখুঁত ছাপা ছবি এক সময় বাজার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে বটতলার প্রিন্টকেও।

চিত্রকলার বাজারের এই বহুমুখী বিকাশ আঠারো এবং উনিশ শতকের বাংলার চিত্রকলাকে করে তুলেছে অনন্য। এই সূত্র ধরেই আঠারো শতকের গোড়ার দিকের দরবারি চিত্রকলা উনিশ শতকের শেষ দিকে হয়ে উঠেছে গণমানুষের ছবি, বাংলার চিত্রকলা প্রবেশ করেছে আধুনিকতার যুগে।

পরিশিষ্ট

পরিভাষা

আউটলাইন (ইংরেজি)	ড্রইংয়ে যে রেখা দিয়ে কোনো বস্তু বা দেহের সীমানা নির্দেশ করা হয় ।
অ্যাকাডেমিক আর্ট	আঠারো ও উনিশ শতকে ইউরোপে বিকশিত একাডেমিগুলোর নির্দেশিত কৌশলে সৃষ্ট শিল্পকলা ।
অ্যাকুয়াটিন্ট	ছাপচিত্রের কৌশল । দস্তা বা তামার পাতে রজনের প্রলেপ লাগিয়ে, এসিডে ডুবিয়ে ধাতুর পাতকে ক্ষয় করে নিয়ে এই প্রিন্টের ব্লক তৈরি করা হয় । চাহিদামতো রঙের আবহ সৃষ্টি করতে কয়েকবার এই প্রক্রিয়া পুনরাবৃত্তি করে নেয়া হয় । এতে জলরঙের মতো প্রিন্ট তৈরি করা সম্ভব হয় ।
আলপনা	পূজা-পার্বন, উৎসব-অনুষ্ঠান উপলক্ষে ঘরের মেঝে, দেওয়াল অথবা উঠানে আঁকা নকশা ।
ইংক	কালি । কোনো রঙিন পদার্থের তরল বা আধা তরল অবস্থা, যা আঁকা বা ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয় ।
ইজেল	শিল্পীর আঁকার সুবিধার্থে উপযুক্ত অবস্থানে চিত্রপটকে ধরে রাখার জন্য তৈরি করা কাঠামো ।
ইন্টাগ্লিও	ছাপার একটি পদ্ধতি । এ পদ্ধতিতে কোনো ধাতব পাতের ওপর খোদাই করে বা এসিড দিয়ে ক্ষয় করে ইমেজ তৈরির পর সেই খোদিত অংশে কালি লাগিয়ে ঈষৎ ভিজে কাগজে ছাপ নেয়া হয় ।
ইমপ্রেশনিজম	উনিশ শতকের ফ্রান্সে বিকশিত শিল্প আন্দোলন । কোনো বস্তুর চলমান বা ধাবমান ছায়া বা ইমেজ আলোকবাহিত হয়ে যেভাবে শিল্পীর চোখে ধরা পড়ে, সেই ছায়াকে বৈজ্ঞানিক দক্ষতায় প্রকাশ করা এই ধারার ছবির বৈশিষ্ট্য । এ ধারার ছবিতে ল্যান্ডস্কেপ বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রায়ন সবচেয়ে সুন্দরভাবে পরিস্ফুটিত হয় ।

এচিং	ছাপচিত্রের একটি পদ্ধতি । এই পদ্ধতিতে ধাতুর পাতের ওপর এসিড প্রতিরোধক প্রলেপ লাগিয়ে তার ওপর আঁচড় কেটে নকশা আঁকা হয় এবং তারপর প্লেটটিকে এসিডে ডুবিয়ে ক্ষয় করে ব্লক তৈরি করা হয় ।
এনগ্রেভিং	ছাপচিত্রের একটি পদ্ধতি । এ পদ্ধতিতে কোনো কাঠ বা ধাতুর ফলকে কোনো নকশা খোদাই করে উৎকীর্ণ করা এবং সেই নকশা থেকে ছাপ নেয়া হয় ।
এরিয়াল পারস্পেকটিভ	দূরের কোনো বস্তুর ছবি আঁকার ক্ষেত্রে আকাশ বা উপরিতল হতে দৃশ্যমানতা বোঝানোর কৌশল ।
ওলিওগ্রাফ	ফটোগ্রাফির সাহায্যে লিথোগ্রাফির মাধ্যমে কাপড় বা কোনো বুননতলে ছবি ছাপার পদ্ধতি, যাতে তেল রঙের আবহ সৃষ্টি করা যায় ।
কলমকারি	কাঠের ব্লক দিয়ে হাতে কাপড়ের ওপর ছাপ দেয়ার পদ্ধতি ।
কাঠখোদাই	ছাপচিত্রের কৌশল । এনগ্রেভিং এর অনুরূপ । এ পদ্ধতিতে কাঠের ফলকের ওপর কোনো সুক্ষ্ম অস্ত্র ব্যবহার করে খোদাই করার পর খোদিত অংশে কালি লাগিয়ে ছাপ নেয়া হয় । অনেক ক্ষেত্রে এর উল্টো পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়, অর্থাৎ যে অংশে কালি লাগাতে হবে সেটি উঁচু রেখে সুক্ষ্ম অস্ত্রের সাহায্যে বাকি অংশ চেঁছে ফেলা হয় । একে উড কাট প্রিন্ট বলা হয় । কলকাতার বটতলায় এই পদ্ধতিই বেশি ব্যবহৃত হতো ।
কারখানা	মুঘল রাজকীয় গৃহস্থালির একটি অংশ, যেখানে কারুশিল্পীরা রাজ-পরিবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতেন । এই সকল সামগ্রীর মধ্যে রাজকীয় গ্রন্থাগারের পুস্তকাদিও অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে চিত্রশালাও এই কারখানার অংশ ছিল ।
কুতুবখানা	গ্রন্থাগার । ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে এই কুতুবখানাতে বই সংরক্ষণের পাশাপাশি হাতে লিখে বইয়ের কপি তৈরি করার কাজও করা হতো ।

গুয়াশ	ঘন জল রঙ। প্রাচ্যের বিশেষ করে পারস্য ও ভারতের শিল্পীরা পুঁথিচিত্র অঙ্কনে এই কৌশল ব্যবহার করতেন। এতে ছবি আঁকার আগে রঙকে ঘন করতে সফেদা বা বোরিয়াম সালফেটের মতো উপাদান যোগ করে নেয়া হয়। এ পদ্ধতিতে আঁকা ছবির ভেতর থেকে চিত্রতল অর্থাৎ কাগজ দেখা যায় না।
চিয়ারস্কিউরো	শিল্পকলা, বিশেষত চিত্রকলায় আলো ও ছায়ার বৈপরীত্য প্রকাশের পদ্ধতি।
জল রঙ	রঞ্জক, বাইন্ডার এবং পানির সাহায্যে রঙ তৈরি করে ছবি আঁকার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে রঙের প্রলেপ খুব হাল্কা হয় বলে এর ভেতর থেকে চিত্রতল অর্থাৎ কাগজকে দেখা যায়।
টেমপেরা	ছবি আঁকার পদ্ধতি, রঙের ধরন। এ পদ্ধতিতে রঙ গুলানোর জন্য প্রাকৃতিক ইমালশন ব্যবহার করা হয়। ইমালশনের বিশেষত্ব হলো এটা এমন দুটো তরলের স্থায়ী মিশ্রণ যারা সাধারণভাবে পরস্পর মেশে না, যেমন তেল ও জল। ডিমের কুসুম এক ধরনের প্রাকৃতিক ইমালশন, তাই টেমপেরার সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত কৌশল হলো এগ টেমপেরা, যেখানে কুসুমের সাহায্যে রঙকে দ্রবীভূত করা হয়।
দরবার	শাসকের কার্যালয়, যেখানে বসে তিনি সহযোগীদের সঙ্গে নিয়ে দৈনন্দিন কাজকর্ম সারেন এবং বিশেষত দর্শনপ্রার্থীদের সাক্ষাৎ দেন।
নবাব	ফারসি নায়েব অর্থাৎ সহকারি শব্দটি থেকে উদ্ভুত শাসকের উপাধি। আঠারো শতকের গোড়ার দিক থেকে বাংলার শাসকরা নিজেদের জন্য এ উপাধি গ্রহণ করতেন। তাঁরা কার্যত স্বাধীন হলেও এ উপাধির মাধ্যমে নিজেদের মুঘল বাদশাহদের সহকারী বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে পরিচয় দিতেন।

মিনিয়েচার	খুব ছোট আকারের নিখুঁতভাবে ফিনিশ করা ছবি, মূলত পাণ্ডুলিপি চিত্রায়ন এবং কাগজের ওপর ছবি আঁকার ক্ষেত্রে এ রীতি ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের ছবি দেয়ালে টাঙানোর জন্য নয়, বরং চোখের কাছে ধরে দেখার জন্য।
মুরাক্কা	ছবির অ্যালবাম। পারসিক এবং মুঘলদের দরবারের শিল্পীদের আঁকা বিভিন্ন ছবি একত্রে বাঁধিয়ে এ ধরনের অ্যালবাম তৈরি করা হতো।
রাগ-রাগিনী	সুরের ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় রূপ।
রাগমালা	বিভিন্ন রাগ বা সুরের সংকলন।
সুরতখানা	রাজকীয় চিত্রশালা। মুঘল কারখানার অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল এই সুরতখানা, যেখানে প্রতিকৃতি অঙ্কনসহ পুস্তক অলঙ্করণের কাজ হতো। সুরতখানা নামটি প্রবর্তন করেছিলেন বাদশাহ আকবর।
হাশিয়া	শাব্দিক অর্থ মার্জিনে লেখা মন্তব্য। তবে পারসিক ও মুঘল চিত্রকলায় পাণ্ডুলিপি কিংবা অ্যালবামের পৃষ্ঠার মার্জিনে আঁকা ছবিকেই হাশিয়া বলা হতো।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

ক. আঁকরগ্রন্থসমূহ (অনুবাদ গ্রন্থসহ)

Abu'l Fazl Allami. *Akbar-Nama,* English translation by H. Beveridge in the 'Bibliotheca Indica; series, 3 vols., Calcutta: The Asiatic Society, 1897-1939. Reprint, 3 vols, Delhi: Rare Books, vol. I, 1972, vol. II & vol. III, 1973.

Abu'l Fazl Allami. *A'in-i-Akbari,* English translation in the `Bibliotheca Indica' series, 3 vols., Calcutta: The Asiatic Society, vol.1/1873 (by H. Blochmann, revised and edited by D.C. Phillot, 1927); vols. II & III (by H.S. Jarrett) 1891 and 1894. First reprints; Delhi: Crown Publishers, 1988.

Babur, Zahiruddin Muhammad. *Tuzuk-i-Baburi* (Memoirs of Babur). 2 vols. Translated by A.S. Beveridge (First published in 1922). Reprints, New Delhi: Oriental Books Reprint Corporation, 1970.

Badauni, Abdul Qadir. *Muntakhab-ut-Tawarikh.* 3 vols. Vol. I, translated by S.A. George Ranking (First published in 1898); vol. II translated by W.H. Low (First published in 1899); vol. III, translated and edited by Wolseley T. Haig (First published in 1899). Indian reprint, of vols. I, II & III. Delhi: Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi, 1973.

Firishta (surnamed), Muhammad Qasim Hindu Shah. *Tarikh-i-Firishta.* English translation by J. Briggs entitled 'History of the Rise of the Muhammadan Power in India Till the years 1612 A.D.' 4 vols. Indian reprint, Calcutta: Asiatic Society, 1966.

Gul Badan Begam. *Humayun Nama.* Translated by A.S. Beveridge (First published in London: The Royal Asiatic Society, 1902). Reprint, Delhi: Idarah-i-Adabiyat-i-Delhi, 1973

Husain, Ghulam. *Seir Mutaqherin,* vol. II, translated by Raymond (Haji Mustapha) Calcutta: n.p., 1926.

Jahangir, Nur-ud-din Muhammad. *Tuzuk-i-Jahangiri.* Translated by A. Rogers, edited by H. Beveridge. 2 vols. (First published in 1909-

1914). Second edition, Delhi: Munshiram Manoharlal Oriental Publishers, 1968.

Khan, Inayat. *Shah Jahan Nama.* W. E. Begley and Z.A. Desai, (translated). Delhi: OUP, 1990.

Khan, Shahnawaz and 'Abul Hayy. *M'aathiru'l Umara.* 2 vols. English translation in the 'Bibliotheca Indica' series by H. Beveridge; revised and completed by Beni Prasad. Calcutta: The Asiatic Society, 1911-1941.

Nizamuddin Ahmad, Khawaja. *The Tabaqat-i-Akbari* (A History of India from the Early Mussalman invasion to the thirty-sixth year of the reign of Akbar). 3 vols. Translated by B. De. Calcutta: Asiatic Society of Bengal, vol. 1/1927; vol. II/1936 and vol. III/1939.

খ. ভ্রমণকাহিনী

Bernier, Francois. *Travels in the Mogul Empire: A.D. 1656-1668.* Irving Brock translated; edited by Archibald Constable. London: A Constable, 1891. New Delhi: S. Chand & Co. (Pvt.) Limited, Third edition, 1972.

Della Valle, Pietro. *Travels in India.* Translated by E. Grey. 2 vols. London: Hakluyt Society, 1892.

Foster, W. *Early Travels in India, 1583-1619.* (OUP, n.d.). Reprint, New Delhi: S. Chand & Co., 1968.

Hawkins, William. *The Voyages.* Edited by Sir Clement Markham. London: Hakluyt Society, 1878.

Manucci, Niccolao. *Storia do Mogor (or Mogul India), 1653-1708).* Translated by W. Irvine. 5 vols. London: John-Murry. Vol. I/1906; vols. II & III/1907; vol. IV/1908 and vol. V, 1913.

Monserrate, Antony. *Commentaries* (translated by J.S. Hoyland and annotated by S.N. Banerjee under the title of the 'Commentary of Father Monserrate On His Journey to the Court of Akbar'). Cuttack:n.p., 1922.

Pelsaert, Francisco. *Jahangir's India,* translated Acmonstrantie [in Dutch] by W.H. Moreland and P. Geyl. Cambridge: n.p., 1925.

Roe, T. *The Embassy of Sir Thomas Roe to India, 1615-1629.* 2 vols. Edited by W. Foster. London: Hakluyt Society, 1899.

গ. বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

আজিম, ফয়েজুল, *ঔপনিবেশিক আমলে বাংলার শিল্পকলা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১

আনসারী, মোহাম্মদ মুসা, *ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পুনর্মুদ্রণ, ২০০১

আহসান, সৈয়দ আলী, *শিল্পবোধ ও শিল্পচৈতন্য*, ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৮৩

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদক), *বাংলার ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯৯৫

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০১, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১০

গুপ্ত, মণিন্দ্র ভূষণ, *শিল্প: ভারত ও বহির্ভারত*, কলকাতা: বিশ্ব ভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৩৮২ বাংলা সন

চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী *দরবারি শিল্পের স্বরূপ মুঘল চিত্রকলা*, কলকাতা: থিমা, ১৯৯৭

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, *ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ*, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা: বর্ণায়ন, ২০১৪

ভট্টাচার্য, যতীন্দ্রনাথ, *বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের তালিকা, ১৭৪৩-১৮৫২*, কলকাতা: এ. মুখার্জি, ১৯৯০

ভট্টাচার্য, অশোক *বাংলার চিত্রকলা*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০২

মিত্র, অশোক, *ভারতের চিত্রকলা*, ১ম ও ২য় খ-, কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৩৬৭ বাংলা সন

মুখোপাধ্যায়, অলোক, *বিশ্বশিল্পের রূপরেখা*, কলকাতা: দাসগুপ্ত এন্ড কোম্পানি, ১৩৮৫ বাংলা সন

শ্রীপান্থ, *বটতলা*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩

সরস্বতী, সরসীকুমার, *পালযুগের চিত্রকলা*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৭৮

সেন, সুকুমার, *বটতলার ছাপা ও ছবি*, কলকাতা: আনন্দ প্রকাশন, ১৯৮৪; চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৫

ঘ. বাংলা ভাষায় লিখিত গবেষণামূলক নিবন্ধ

আজিম, ফয়েজুল, 'চিত্রকলা', লালারুখ সেলিম (সম্পাদক), *চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা সিরিজ ৮*, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০০৭

খান মজলিস, নাজমা,*আলম মুসাব্বির*, বাংলাপিডিয়া, প্রথম খ- ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০০১; পুনর্মুদ্রণ, ২০১০

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা', *সংগীত চিন্তা*, রবীন্দ্র রচনাবলী, শান্তিনিকেতন: বিশ্বভারতী, ১৯৯৭, সপ্তদশ খ-, পৃ. ১৮

রহমান, শামীম আমিনুর, 'ঢাকার অদেখা ছবি', *প্রথম আলো ঈদসংখ্যা ২০১০*, ঢাকা, আগস্ট ২০১০

সোম, শোভন, 'কালিঘাট চিত্রকলা', সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, ৫ম খ-, ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, ২০০১

ঙ. ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থ

Archer, M., *Company drawings in the India Office Library,* London: HM Stationary Office, 1972; See also: M. Archer, *Natural History Drawings in the India Office Library,* London: HM Stationary Office, 1962

Archer, M. and G. Parlett, *Company Paintings: Indian Paintings of the British Period* (Indian Art Series), London: Mapin Intl, 1993

Archer, M., and WG Archer, *Indian Paintings for the British 1770-1880*, Oxford: University Press, 1955

Archer, Mildred, and Tobby Falk, *Indian Miniatures in the India Office Library*, London: Her Majesty's Stationery Office, 1988

Archer, Mildred, *Indian Paintings from Court, Town and Village*, London: Arts Council of Great Britain, 1970

Archer, Mildred, *Indian Popular Painting in the India Office Library*, London: Her Majesty's Stationery Office, 1977

Archer, W. G., *Bazaar Paintings of Calcutta, the Style of Kalighat*, London: HM Stationary Office, 1953

Archer, W. G., Kalighat Paintings: A Catalogue and Introduction by W. G. Archer, London: HM Stationary Office, 1971

Archer, W. G., *Kalighat Drawings from the Basant Kumar Birla Collection, formerly Ajit Ghosh Collection*, Bombay: Marg Publications, 1962

Bagal, Jogesh Chandra, *Book Illustrations in Bengal in the early 19th century Calcutta,* Calcutta, 1954

Beglar, J. D., *Report of a Tour Through the Bengal Provinces in 1872-73*, Calcutta: Gov't Press, 1878

Belnos, S. C., *Twenty-four Plates Illustrative of Hindoo and European Manners in Bengal*, London, 1832; reprinted Calcutta: Riddhi-India, 1979

Bhattacharjee, Binoy, *Cultural Oscillation: A Study on Patua Culture*, Calcutta: Naya Prokash, 1980

Bhattacharya, Bholanath, *Krishna in the Traditional Painting of Bengal*, Calcutta: Kamal Banerjee, 1972

Bussabarger, Robert F, and Betty D. Robins, *The Everyday Art of India*, New York: Dover Publications, 1968

Chakrabarty, Hiren, *European artists and India, 1700-1900*, Calcutta: Victoria Memorial, 1987

Chatterjee, Ratnabali, *From the Karkhana to the Studio: A Study in the Changing Social Roles of Patron and Artist in Bengal*, New Delhi: Books N Books, 1990, Preface, p. vi

Chatterjee, Ratnabali, *From the Karkhana to the Studio: A Study in the Changing Social Roles of Patron and Artist in Bengal*, Calcutta: Books & Books, 1990

Collin, E. W., *Report on the Existing Arts and Industries in Bengal*, Calcutta: Bengal Secretariat, 1892

Cotton, H. E. A., *Calcutta, Old and New: A Historical and Descriptive Handbook to the City*, Calcutta: W. Newman, 1907; revised edition: General Printers & Publishers, 1980

Datta, Kalikinkar K., *Survey of India's Social Life and Economic Condition in the 18th Century*, Calcutta: Munshiram Manoharlal, 2nd. rev. ed., 1978

Datta, Sarojit, *Folk Paintings of Bengal*, New Delhi: Khama Publishers, 1993

Dey, Bishau and John Irwin. "The folk art of Bengal," in *Marg*, vol I, no 4, 1946-47, pp 45-54

Dutt, Gurusaday, *Folk Arts and Crafts of Bengal: The Collected Papers*, Calcutta: Seagull Press, 1990

Eyre, G. and D. M. McDougall, *Kalighat Drawings*. London, 1969

Eyre, G., *Mid-Nineteenth Century Kalighat Drawings.* London, 1971

Falk, T. and M. Archer, *Indian Miniatures in the India Office Library*, London: Sotheby Canada, 1981

Ghose, Benoy, *Traditional Arts and Crafts of West Bengal*. Calcutta: Papyrus, 1981

Ghosh, Durba, *Sex and the Family in Colonial India: The Making of Empire*, New York : Cornell University, 2006

Ghosh, Pradyota, *Kalighat Pats: Annals and Appraisal*, Calcutta: Shilpayan Artists Society, 1967

Gugha-Thakurta, T., *Monuments, Objects, Histories: Institutions of Art in Colonial and Post-Colonial India,* New York: Columbia University Press, 2004

Gugha-Thakurta, T., *The Making of a New 'Indian' Art: Artists, Aesthetics and Nationalism in Bengal, c. 1850-1920,* Cambridge: University Press, 1992

Hogben, C., *Bazaar Paintings of Calcutta*, London: Victoria and Albert Museum, 1955

Jain, Jyotindra, *Kalighat Painting: Images from a Changing World*, Ahmedabad: Mapin Publishers, 1999

Kramrisch, Stella, *Unknown India: Ritual Art in Tribe and Village*, Philadelphia: Philadelphia Museum of Art, 1968

McCutchion, David, and Suhrid Bhomick, *Patuas and Patua Art in Bengal*, Calcutta: Firma KLM Private LTD, 1999

Metcalf, T.R. *Ideologies of the Raj,* The New Cambridge History of India, Cambridge: Cambridge University Press, 1997, pp 66-112

Mitter, P., *Art and Nationalism in Colonial India 1850-1922: Occidental Orientations*, Cambridge: University Press, 1994

Mitter, P., *Much Maligned Monsters: History of European Reactions to Indian Art*, Oxford: Clarendon Press, 1977; Chicago: University

Press Paperback, 1992; New Delhi: Oxford University Press, 2013;

Mitter, P., *The Triumph of Modernism: India's Artists and the Avant-Garde – 1922-1947*, London: Reaktion Books; New Delhi: Oxford University Press, 2007

Mitter, P., Art *and Nationalism in Colonial India, 1850-1922 Occidental Orientations,* Cambridge: University Press, 1994

Mookerjee, Ajit, *Modern Art in India,* Calcutta: Oxford Book & Stationery Co., 1956

Mookerjee, Ajit, *The Arts of India From Prehistoric to Modern Times,* Oxford: IBH Publishers, 1966

Pal, Pratapaditya and Vidya Dehejia, *From Merchants to Emperors: British Artists and India, 1757-1930*, Ithaca: Cornell University Press, 1986

Paul, Ashit (ed.), *Woodcut Prints of 19th Century Calcutta,* Calcutta : Seagull, 1983

Rawson, Philip, *Indian Painting*, Paris: P. Tisne; New York: Universe Books, 1961

Sen Gupta, S. (ed), *The Patas and Patuas of Bengal*, Calcutta: Indian Publications, 1973

Skelton, Robert and Mark Francis, *Arts of Bengal: The Heritage of Bangladesh and Eastern India : An Exhibition,* London: Whitechapel Art Gallery, 1979

Tomory, Edith, *A History of Fine Arts in India and the West,* New Delhi: Orient Black Swan, 2004

Welch, Stuart Cary, *Room for Wonder: Indian Painting during the British Period 1760-1880*, New York: American Federation of Arts, 1978

চ. ইংরেজি ভাষায় লিখিত গবেষণামূলক নিবন্ধ

Anand, Mulk Raj, 'The Hand and the Heart. Notes on the Creative Process in The Folk Imagination,' in *Marg*, vol XXII no 4, 1968-69, pp 4-10

Appasamy, Jaya, 'Early Calcutta Lithographs,' in *Lalit Kala Contemporary*, vol 31, 1981, pp 13–16

Appasamy, Jaya, 'Early Calcutta Wood Engravings,' in *The Visvabharati Quarterly*, vol 39, no 3–4, 1973-74, pp 260-67

Archer, Mildred, 'Bazaar Style,' in *Marg*, vol XX, no 1, 1966-67, pp 53-54

Archer, W. G., 'Kalighat Painting,' in *Marg*, vol V, no 4, 1951-52, pp 22-29

Bhattacharjee, Binoy, 'The Patuas – A Study in Islamization' in S. Sen Gupta (ed.), *The Patas and the Patuas of Bengal*, Calcutta: Indian Publications, 1973, pp. 95-100.

Bhattacharya, Bholanath, 'Evolution of Folk Arts and Crafts,' in *Folklore*, vol 23 no 3, Calcutta, 1982, pp 66-67

Bhattacharya, Bholanath, 'Occupational Mobility and Kalighat Patuas: a Sample survey,' in *Folklore*, vol XIII, no 10, Calcutta, 1972, pp 369-76

Bloch, Emily K., 'Singing Painters of Bengal' in *South Asia at Chicago* (Winter, 1999), see <http//:humanities.uchicago.edu/southasia/wint99d.htm> (retrieved 12 September 2012).

Blurton, T. Richard, 'Continuity and change in the tradition of Bengali pata-painting,' in A. L. Dallapiccola (ed), *Shastric Traditions in Indian Arts*, Stuttgart: Franz Steiner Verlag Weisbaden GmbH, 1989, pp 425-51

Cameron, Nigel, 'Gods, Girls and Some Pukka Sahibs: Brilliant Art of the Folk-painters of the Calcutta Bazaars," in *Orientations*, vol 3, no 1, 1972, pp 48-60

Chakraborty, Sunil, "The Origin and Perspective of the Word 'Pat'" in S. Sen Gupta (ed.), *The Patas and the Patuas of Bengal*, Calcutta: Indian Publications, 1973, pp 85-94.

Chakravarti, Sipra, 'Manuscript, pata and scroll painting in the 19th and 20th century,' in *Indian Museum Bulletin*, vol XXIII and XXIV, 1988-89, pp 40-48

Dey, Mukul, 'Drawings and paintings of Kalighat,' in *Advance*, Calcutta, 1932

Dutt, G. S., 'The indigenous painters of Bengal,' in *Journal of the Indian Society of Oriental Art*, vol I, 1933, pp 18-25

Dutt, G. S., 'The living tradition of the folk arts in Bengal,' in *Indian Art and Letters*, New Series vol X, no 1, 1936, pp 22-34

Forbes, Geraldine, 'Patas (Scroll Paintings) by Patuas (Folk Artists) of Medinipur, West Bengal, India' <http//:www.oswego.edu/Acad_Dept/a_and_s/history/india/> (retrieved 12 September 2012).

Ganguli, R. N., 'Patas and Patuas of Bengal,' in *Indian Folklore*, Calcutta, April-Aug, 1956

Ghose, Benoy, 'Some Traditional Folk Arts of Bengal and Social Change', in *Art in Industry*, Vol VIII, No. 3, 1967

Ghosh, Pika, 'The Story of a Storyteller's Scroll' in *Anthropology and Aesthetics*, No. 37 (Spring, 2000), pp. 166-185

Ghosh, Pika, 'Unrolling a Narrative Scroll: Artistic Practice and Identity in Late-Nineteenth Century Bengal' in *Journal of Asian Studies*, Vol. 62, No. 3 (August, 2003), pp. 835-871

Knizkova, Hana, 'Bengali pictures of Kalighat style,' in *New Orient*, June, vol 6 no 3, 1967, 79-80

Mookerjee, Ajit, 'Bengal Folk Drawings and Paintings,' in *Modern Review*, vol LXXII, 1943, pp 41-45

Mukherjee, B. N., 'Paintings and Drawings of the Kalighata Style: Indigenous Versus Non-indigenous Inspirations,' in *Indian Museum Bulletin,* vol XXII-XXIV, 1988-89, pp 31-39

Mukherjee, B. N., 'The Kalighata (Kalighat) Style—the theory of British Influence,' in *Indian Museum Bulletin,* vol XIX, 1984, pp 7-13

Pal, Pratapaditya, 'Kali, Calcutta and Kalighat Pictures in "City of Kali",' in *Marg,* vol XLI, no 4, 1990-91, pp 1–16

Ray, Sudhansu Kumar, "The Artisan Castes of West Bengal and Their Craft." In Asok Mitra (ed), *The Tribes and Castes of West Bengal,* pp 293-349. Calcutta: Census of India, West Bengal Government Press, 1951

Sharma, S. K., 'The art of scroll painting in Bengal,' in Prem Shankar Dwivedi (ed), *Essays on Indian Painting: Karl Khandalavala Felicitation Volume,* Varanasi: Kala Prakashan, 1990, 103-08

Siddiqui, M.K.A., 'The Patuas of Calcutta: A Study in Identity Crisis' in M.K.A. Siddiqui (ed.). *Aspects of Society and Culture in Calcutta,* pp. 49-66. Calcutta: Anthropological Survey of India, 1983

Singh, Kavita, 'Stylistic Differences and Narrative Choices in Bengal Pata Painting' in *Journal of Arts and Ideas,* vol 27-28, 1995, pp 91-104.

Thakurta, Tapati Guha. 'Artists, Artisans and Mass Picture Production in late Nineteenth and Early Twentieth-century Calcutta: the Changing Iconography of Popular Prints,' *South Asia Research,* vol 8 no 1, 1988, pp 3–46

ছ. বিভিন্ন জাদুঘর ও প্রদর্শনীর ক্যাটালগ

Anonymous, *London International Exhibition 1871: Catalogue of the collections forwarded from India,* London, 1871

Archer, Mildred, *Indian Miniatures and Folk Paintings from the Collection of Mildred and W. G. Archer,* London: Arts Council of Great Britain, 1967

Archer, W. G., *Kalighat Paintings: A Catalogue*, London: Her Majesty's Stationery Office for the Victoria and Albert Museum, 1971

Crafts Council of West Bengal, *Arts of Bengal and Eastern India*, Calcutta: Crafts Council of West Bengal, 1982

Crafts Council of West Bengal and Alliance Française de Calcutta, *Patua Art: Development of the Scroll Paintings of Bengal, Commemorating the Bicentenary of the French Revolution*, Calcutta: Alliance Française, 1989

Dutt, G. S., *Catalogue of Folk Arts*, Calcutta: Indian Society of Oriental Art, 1932

Government House, Calcutta, *Exhibition of Bengal Art, 1945*, Calcutta: Government House, 1945

Inter-National Cultural Centre, *New Delhi. Folk Paintings of India*, New Delhi: Inter-National Cultural Centre,1961

Mukherjee, B.N., *Kalighat Patas: Paintings and Drawings of the Kalighat Style*, Calcutta : Indian Museum, 1987

Sarkar, Aditi Nath 'Bengal Patas' in *Beneath the Banyan Tree, Catalogue of an Exhibition in the Joe and Emily Lowe Gallery*, New York : Syracuse University, 2003

Skelton, Robert and Mark Francis, *Arts of Bengal: The Heritage of Bangladesh and Eastern India*, London: Whitechapel Art Gallery, 1979

ছ. অপ্রকাশিত পিএইচপি অভিসন্দর্ভ

Begum, Najma, *Portrayal of Women in Mughal Painting : A Study Based on Illustrated Manuscripts and Album Drawings*, Institute of Bangladesh Studies, Rajshahi University, 1994

Bhattacharya, Dipak, *Company School Paintings of Calcutta, Murshidabad, Patna (1750-1850),* Visva Bharati, India, 2000

Eaton, Natasha Jane, *Imaging Empire : the trafficking of art and aesthetics in British India c.1772 to c.1795*, University of Warwick, 2000